অমানব সত্তার গুরুত্ব ও টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
(Importance of Non-Human Entities and Sustainable Development : Bangladesh Perspective)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

টুম্পা রানী দে
পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১০০/২০২০-২০২১
শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমাদানের তারিখ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

অনুমোদনপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, *অমানব সত্তার গুরুত্ব ও টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত (Importance of Non-Human Entities and Sustainable Development : Bangladesh Perspective)* শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি জনাব টুম্পা রানী দে-এর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইতোমধ্যে অন্য কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/গবেষণাকর্ম বা এ জাতীয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

(ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ)
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় অন্যান্য উৎস থেকে সংযোজিত তথ্যের তথ্যসূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কোনো অংশই ডিপ্লোমা বা ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়নি।

টুম্পা রানী দে
পিএইচ.ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ-এর প্রতি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে অব্যাহত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমার পক্ষে অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষক ও সহপাঠিবৃন্দ যারা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি তাদের সকলের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির শর্ত হিসেবে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্বে আমাকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সামনে দুটি সেমিনার প্রদান করতে হয়েছে। দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এ কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আমার বর্তমান কর্মস্থল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমার সহকর্মীবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক আনিছুর রহমান, অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক ড. সায়মা আহমদ, অধ্যাপক তানভীর আহসান, জনাব ড. চাঁদ সুলতানা কাওসার, জনাব ড. শহীদুর রহমান, জনাব ড. আব্দুস সাত্তার, জনাব কানিজ ফাতেমা, জনাব আশিক বিশ্বাস, জনাব একরামুল ইসলাম রাসেল প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষক রাশিদা আখতার খানম ও আমার স্বামী মো: আতিকুর রহমানের প্রতি। তাদের অবিরাম সহায়তা, উৎসাহ ও সহমর্মিতা এবং সর্বোপরি আমার প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস আমাকে যেমন এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তেমন গবেষণা পরিচালনার পথকেও মসৃণ করেছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখক ও দার্শনিকের প্রবন্ধ এবং বইপত্রের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। গবেষণা চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে অবস্থিত অমানব সত্তাসমূহের অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরে বিশ্লেষণ করার জন্য দেশের প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহের সাহায্য নিয়েছি। এছাড়াও উন্নয়ন এবং অমানব সত্তাসমূহের পরিসংখ্যানগত তথ্য-উপাত্তের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সাহায্য গ্রহণ করেছি। অভিসন্দর্ভের যথাস্থানে ‘পাদটিকা’ ও উদ্ধৃতিতে লেখক ও দার্শনিকবৃন্দের নাম, গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম, পত্রপত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, দর্শন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, দেবস্মৃতি পাঠাগার (দর্শন বিভাগ), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (শাহবাগ), জাতীয় গ্রন্থাগার (আগারগাঁও), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত সকল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিতা ও মাতার প্রতি। যাদের ধৈর্য, উৎসাহ, ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং আমার প্রতি অবিচল বিশ্বাসই শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত আমার চলার পথকে সহজ করে দিয়েছে।

পরিশেষে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সযত্নে কম্পোজ করার জন্য মোঃ আল-মাশরেকুজ্জামান এবং যত্নসহকারে প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করার জন্য মো: আতিকুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জনাচ্ছি।

টুম্পা রানী দে
পিএইচ.ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির শুরু থেকে প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু মানুষ এ সকল অমানব সত্তাকে নির্বিচারে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। অমানব সত্তাসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদ, নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্ররাশিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ। এ সকল অমানব সত্তাও যে নৈতিক মূল্যে মূল্যবান তা দর্শনে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়নি। অবশ্য সনাতনী নীতিবিদ্যা প্রাকৃতিক অমানব সত্তাকে একেবারে মূল্যহীন মনে করে না। অমানব সত্তার ক্ষেত্রে সনাতনী নীতিবিদ্যা নৈতিক মূল্যের পরিবর্তে সহায়ক মূল্য বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করে। অর্থাৎ অমানব প্রাণি হত্যা, নির্বিচারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করা, পাহাড় কাটা, কৃত্রিমভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা প্রভৃতি বিষয়গুলো যদি মানুষের উপযোগ সাধন করে বা সুখ বৃদ্ধি করে তাহলে তা অনৈতিক নয়। বরং মানব উন্নয়নে সহায়ক বলে তা-ই করা উচিত। সনাতনী নীতিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্যায়নমূলক বিজ্ঞান বলা হয়, কারণ তা মানুষের সাথে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের নৈতিক বা দার্শনিক মূল্যায়ন করে। কিন্তু সমাজ-বহির্ভূত কোনো মানুষের আচরণ অথবা প্রাকৃতিক অমানব সত্তার সাথে মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু অমানব সত্তার প্রকৃতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অমানব সত্তাও মানুষের মূল্যায়ন-নিরপেক্ষ স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা। সুতরাং নৈতিক বা স্বতঃমূল্যবান সত্তা হিসেবে অমানব সত্তাসমূহকে সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধির সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন।

বিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকার জীববিদ অ্যালডো লিওপোল্ড সর্বপ্রথম পরিবেশ বিষয়ক বা বাস্তুবিদ্যাগত সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ বিষয়ে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য তিনি সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধিকে ব্যাপক এবং বিস্তৃত করে তা পরিবেশ নীতিবিদ্যার অংশ হিসেবে সংযোজন করেন। পরিবেশ ও প্রকৃতির অমানব সত্তা সম্পর্কিত লিওপোল্ডের এ মতবাদ "ভূমি নীতিবিদ্যা" নামে পরিচিত এবং এ মতবাদ অমানবকেন্দ্রিক। এ প্রসঙ্গে তিনি "The Land Ethic" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অন্যদিকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণাটি বিকশিত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জীবনযাত্রার মান এবং পরিবেশগত মানের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করে আসছিলো।

সাধারণত উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যকার বিভেদ বা অনৈক্য দূর করে সমন্বয় সাধনের জন্য 'টেকসইযোগ্যতা' (Sustainability) শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ টেকসইযোগ্যতার ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত গুণমান এবং সামাজিক ন্যায্যতার মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করে। 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণাটির সংজ্ঞা বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেকসই

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন ধারণার সংজ্ঞার সংস্কার সাধন করে ন্যায়বিচার ও সমতার ধারণাকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে দার্শনিকবৃন্দ টেকসই উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞায় বলেন, "ন্যায্যতা ও সমতার নীতি অনুসরণ করে, জীবনপোষক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বসবাসের মাধ্যমে, যতটা সম্ভব ততটা পরিমাণে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য শ্রেয়তর জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধান করাই হলো টেকসই উন্নয়ন"। অর্থাৎ উন্নয়নকে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য দার্শনিকেরা ন্যায়বিচার ও সমতার নীতি অনুসরণ করার শর্ত আরোপ করেন এবং বর্তমান প্রজন্ম ছাড়াও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও শ্রেয়তর জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যখন কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতি অনুসরণ করা হয় তখন বাস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যও এর পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং তখন এ উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলা যায়।

অমানব সত্তাসমূহ বা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ প্রসঙ্গে টেকসই উন্নয়নের আলোচনায় দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, (১) সবল টেকসই উন্নয়ন (২) দুর্বল টেকসই উন্নয়ন। সবল টেকসই উন্নয়ন নবায়ন অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেয় যা লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতার নীতি'র' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশসমূহের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। ২০৩০ এজেন্ডায় ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১৫ নম্বর অভীষ্টটি বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এ অভীষ্টে যে বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে টেকসই উপায়ে বন ব্যবস্থাপনা, ভূমি ও প্রাকৃতিক বস্তুগত উপাদানসমূহের অবক্ষয় রোধ করা ও সংরক্ষণ করা, মরুকরণ সফলভাবে মোকাবিলা করা এবং জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতি কমিয়ে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুণরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব যে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন তাতে করে একটি বিষয় উপলব্ধি করার সময় এসেছে- তাহলো পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের সংরক্ষণ ব্যতীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এ কথা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ অর্থনৈতিক লোভ-লালসা, উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যথেচ্ছ বন উজাড়, ভূমির অবক্ষয়, শিকারি প্রজাতি এবং অবৈধ শিকার ও বন্য প্রাণি পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যসহ সরকারি সহযোগিতা ও জনগণের সচেতনতার অভাবের কারণে বাংলাদেশের অমানব সত্তাসমূহের অবস্থা ও সংখ্যা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এরূপ শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। কারণ নৈতিক চেতনা জাগ্রত হলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে প্রকৃতিরও প্রাণ আছে এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান, আর এ উপলব্ধি সৃষ্টির ক্ষেত্রে লিওপোল্ডের "ভূমি নীতিবিদ্যা" প্রবন্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার 'অখণ্ডতার নীতি'র' আলোকে টেকসই উন্নয়নে অমানব সত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে। এছাড়া এ নীতির আলোকে বিশ্ববাস্তবতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং এর সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্ট বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু টেকসই বন-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। যে-কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য বনভূমিসহ অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক মূল্য স্বীকার ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবেশ নীতিবিদ বা দার্শনিকদের মধ্যে লিওপোল্ড সর্বপ্রথম অমানব সত্তা বা সামগ্রিকভাবে ভূমির নৈতিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ভূমির সাথে নৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ভূমিকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা এবং এর মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। কারণ পরিবেশগত বিষয়ে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, বিশ্ব পরিমণ্ডলের সকল অমানব সত্তার ক্ষেত্রেও ন্যায়ত্ব ও অন্যায়ত্বের বিষয়টি জড়িত। অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক মূল্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট বন-বাস্তুতন্ত্র (forest-ecosystem) বা বনভূমির উপর নির্ভরশীল। বনভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি করে লিওপোল্ড যেমন বনভূমি সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন তেমন টেকসই পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। যদিও লিওপোল্ড তাঁর "ভূমি নীতিবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের কোথাও 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণার কথা উল্লেখ করেননি, বা এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং 'অখণ্ডতার নীতি' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের দিকনির্দেশনা রয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় ও পালনীয়। বাংলাদেশ আজ যে পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে তা থেকে লিওপোল্ড আমাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারে যদি আমরা তার সমগ্রবাদী মতবাদের আলোকে অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক মূল্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

অনুমোদনপত্র i
ঘোষণাপত্র ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii-iv
সারসংক্ষেপ v-vii
সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা **১-২০**
১.১ গবেষণার পটভূমি
১.২ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি
১.৪ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
১.৫ অমানব সত্তা সম্পর্কিত আলোচনার পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায়
অমানব সত্তা সম্পর্কিত দার্শনিক পর্যালোচনা **২১-৫৬**
২.১ প্রাচীন যুগ
২.২ মধ্যযুগ
২.৩ আধুনিক যুগ
২.৪ র‍্যাচেল কারসনের সাইলেন্ট স্প্রিং ও পরিবেশবাদী আন্দোলন
২.৫ পিটার সিঙ্গারের প্রাণিমুক্তিতত্ত্ব
২.৬ টম রিগানের প্রাণি অধিকারতত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়
লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যায় অমানব সত্তার গুরুত্ব : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ **৫৭-৭৯**
৩.১ সনাতনী বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা
৩.২ ভূমি নীতিবিদ্যা
৩.৩ ভূমি পিরামিড
৩.৪ ভূমি পিরামিডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
৩.৫ প্রকৃতি একটি সজীব সমগ্র
৩.৬ বাস্তুতন্ত্রের সমগ্রতা প্রসঙ্গে কালিকট
৩.৭ সমালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন **৮০-১১৬**
৪.১ উন্নয়ন
৪.২ টেকসই উন্নয়ন
৪.৩ সবল ও দুর্বল টেকসই উন্নয়ন
৪.৪ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ পরিবেশগত ন্যায়বিচার
৪.৬ টেকসই উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব
৪.৭ বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট
৪.৮ বাংলাদেশ ও টেকসই উন্নয়ন
৪.৯ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকরণ
৪.১০ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি অনুসরণ
৪.১১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৪.১২ বাংলাদেশের স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

পঞ্চম অধ্যায়
টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশে বনভূমির চালচিত্র **১১৭-১৫৩**
৫.১ বনভূমি
৫.২ বাংলাদেশের বনভূমি
৫.৩ বনভূমির শ্রেণীবিভাগ
৫.৪ ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন
৫.৫ ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন বিনাশের কারণ
৫.৫.১ পাহাড় ও টিলা অপসারণ
৫.৫.২ অবৈধ ইটভাটা স্থাপন
৫.৫.৩ জুমচাষ
৫.৫.৪ বন ডুবিয়ে হ্রদ তৈরি
৫.৬ ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন
৫.৭ ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বন
৫.৮ ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বন বিনাশের কারণ
৫.৮.১ সামাজিক বনায়ন
৫.৮.২ রাবার চাষ
৫.৯ জোয়ারধৌত বন
৫.১০ জোয়ারধৌত বন বিনাশের কারণ
৫.১০.১ শিল্পকারখানা স্থাপন
৫.১০.২ পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড
৫.১০.৩ অবৈধ রিসোর্ট স্থাপন
৫.১০.৪ অবৈধ বালু উত্তোলন
৫.১০.৫ প্যারাবন কেটে বা পুড়িয়ে চিংড়িঘের তৈরি
৫.১১ কৃত্রিম বন
৫.১২ বনভূমি রক্ষায় বন বিভাগের ভূমিকা
৫.১৩ লিওপোল্ডের সংরক্ষণবাদী মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় **১৫৪-১৬২**
এসডিজি ১৫ অর্জনে বনভূমির গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জসমূহ
৬.১ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ও অর্থনীতিতে বনভূমির অবদান
৬.২ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিবেশের অবক্ষয়ের সম্পর্ক
৬.৩ এসডিজি ১৫ অর্জনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ
৬.৪ এসডিজি ১৫ অর্জনের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহ
৬.৫ লিওপোল্ডের "অখণ্ডতার নীতি'র" প্রাসঙ্গিকতা

সপ্তম অধ্যায় **১৬৩-১৭৪**
উপসংহার
গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

পৃথিবীতে সকল সৃষ্টির মধ্যে মানব সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠত্বের স্থান অধিকার করেছে বিধায় মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য সত্তা বা সৃষ্টিকে নির্বিচারে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদ, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, জলাশয়, সমুদ্ররাশিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্নভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে অথচ কখনোই এসব অমানব সত্তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। এ সকল অমানব সত্তাও যে নৈতিক মূল্যে মূল্যবান তা কখনো প্রচলিত নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়নি। কারণ, প্রচলিত বা সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। এখানে কেবল মানুষকেই নৈতিক মূল্যের বিষয়বস্তু বলে বিবেচনা করা হয় এবং পরিবেশের অন্যান্য সত্তাগুলোকে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে সহায়ক মূল্যে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে সনাতনী নীতিবিদ্যার এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে নীতিবিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিবেশের বিভিন্ন অমানব সত্তা সম্পর্কে অধ্যয়ন, আলোচনা, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষও বুঝতে সক্ষম হচ্ছে যে অমানব সত্তার প্রতি ন্যায় ও ন্যায্যতা প্রতিপাদন ছাড়া পরিবেশের বিপর্যয় কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব হবে না। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষার্ধে আমেরিকান জীববিদ আলডো লিওপোল্ড প্রথম এ বিষয়ে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই প্রথম পরিবেশ বিষয়ক বা বাস্তুবিদ্যাগত সমস্যাকে একটি দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রচলিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য লিওপোল্ড সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধিকে ব্যাপক এবং বিস্তৃত করে তা পরিবেশ নীতিবিদ্যার অংশ হিসেবে সংযোজন করেন। পরিবেশ সম্পর্কিত লিওপোল্ডের উক্ত মতবাদ ভূমি নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত এবং এ মতবাদ অমানবকেন্দ্রিক। ভূমি বলতে লিওপোল্ড মৃত্তিকাকে না বুঝিয়ে প্রাণের ভিত্তিকে বুঝিয়েছেন, যা প্রকৃতিতে অবস্থিত অমানব সত্তাগুলোর মধ্যে শক্তি প্রবাহের (energy circuit) সৃষ্টি করে। মানব সমাজের মতো ভূমির উপর অবস্থিত সত্তাগুলোও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ সকল অমানব সত্তার সংরক্ষণ, নৈতিক মূল্য, গুরুত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই যে কোনো দেশের উন্নয়ন আরো ফলপ্রসু ও টেকসই হবে।

১.১ গবেষণার পটভূমি

মানব জাতির ভবিষ্যৎ বিকাশ, অস্তিত্ব ও টিকে থাকা নির্ভর করে বৈশ্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহকে সংরক্ষণ করতে না পারলে সৃষ্টি হবে বৈশ্বিক পরিবেশ সংকট, ধ্বংস হবে মানব সভ্যতাসহ পুরো বিশ্ব। পরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা মানুষের মাঝে কখন সৃষ্টি হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও প্রথম ১২৭২ সালে ইংল্যান্ডে কয়লা পোড়ানো নিষিদ্ধের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়।[১] অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ লিওপোল্ড যে সময়ে পরিবেশের সংরক্ষণ সম্পর্কে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন তখনো পর্যন্ত দর্শনে পরিবেশ সম্পর্কিত নৈতিকতার আলোচনা শুরু হয়নি। এতোদিন প্রকৃতি ও অমানব সত্তাসমূহকে মানুষের কল্যাণের জন্য উপযোগবাদী সহায়ক মূল্যে বিবেচনা করা হতো। লিওপোল্ড প্রথম অমানব

সত্তাগুলোকে উপযোগবাদী বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যায়নের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। লিওপোল্ডের এ নতুন মত অর্থাৎ পরিবেশের প্রতি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ না করেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পুরনো প্যারাডাইম থেকে নতুন প্যারাডাইমে স্থানান্তরকে প্যারাডাইম শিফট বলা যায়। তিনি সমগ্রবাদী দৃষ্টিতে অমানব সত্তাগুলোকে গণ্য করেন এবং নৈতিক দিক থেকে এই সজীব সমগ্রের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন। এজন্য পরিবেশ সম্পর্কিত লিওপোল্ডের মতবাদকে সমগ্রবাদী মতবাদ বলেও অভিহিত করা যায়। লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা বা সমগ্রবাদী মতবাদ একটি অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে আগ্রহ ও আলোচনার সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক মতবাদ হিসেবে এ মতবাদ অমানব সত্তার নৈতিক দাবি ও অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। পরিবেশগত বিষয়ে শুধু মানুষ নয়, বিশ্ব পরিমণ্ডলের সকল অমানব সত্তার ক্ষেত্রে ন্যায়ত্ব ও অন্যায়ত্বের বিষয়টি জড়িত। লিওপোল্ডের অখণ্ডতার নীতি ও সমগ্রবাদী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় অমানব সত্তার গুরুত্ব এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যেই এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

লিওপোল্ড তাঁর "The Land Ethic" প্রবন্ধে পরিবেশগত সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং মানুষের সাথে ভূমি ও ভূমির উপর অস্তিত্বশীল সকল অমানব সত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। ভূমি নীতিবিদ্যায় লিওপোল্ড কেবল মানব সম্প্রদায়কে নয় বরং সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়কে (মাটি, পানি, উদ্ভিদ ও অমানব প্রাণিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ) অর্থাৎ ভূমির উপর বেড়ে ওঠা সমগ্র অমানব সত্তাকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। তিনি একটি নীতির কথা বলেন; এ নীতিটি 'অখণ্ডতার নীতি' নামে পরিচিত এবং এটি একটি সমগ্রবাদী নীতি। এ নীতির মাধ্যমে লিওপোল্ড প্রকৃতির সকল অমানব সত্তার গুরুত্ব ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন যা প্রকারান্তরে টেকসই উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। কারণ যথার্থ অর্থে উন্নয়ন বলতে টেকসই উন্নয়নকেই বোঝানো হয় যা পরিবেশগত ন্যায্যাতা প্রতিপাদনের উপর অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল। লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার অখণ্ডতার নীতির আলোকে অমানব সত্তার গুরুত্ব ও টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববাস্তবতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্পর্ক এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাবের গুরুত্বকেও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এযাবৎকালের গবেষণায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুগঠিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ গবেষণাকর্মে সেই কাজটি তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণে ব্যর্থতার মূলে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা বর্তমান গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করার মাধ্যমে কীভাবে অমানব সত্তাসমূহকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে ও সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জন সম্ভব তার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এ গবেষণায়। সবশেষে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো সমৃদ্ধ গবেষণার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণার্থে এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে পরিবেশ দর্শন ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনাবলির পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমান অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক এবং সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া বিচারমূলক, সমালোচনামূলক ও সমন্বয়মূলক পদ্ধতিকেও এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এই ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিচার-বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় আলোচনার ক্ষেত্রে মূখ্য ও গৌণ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর নির্যাস বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনার পরিধি ক্ষেত্র বিশেষে বিস্তৃত হয়েছে, আবার কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় শেষে তথ্যনির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৪ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায় 'অমানব সত্তা সম্পর্কিত দার্শনিক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের দর্শনের ইতিহাসের আলোকে অমানব সত্তা সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণসহ র‍্যাচেল কারসন, পিটার সিঙ্গার এবং টম রিগান প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের মত ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। সাধারণত বাস্তুবিদ্যায় পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। বাস্তুবিদ্যা ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমনঃ উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল ও প্রাণিবিদ্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন অমানব সত্তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়েছে অনেক, কিন্তু এ সবই ছিল অমানব সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্যের পরিবর্তে পরতঃমূল্য বা উপযোগিতার মূল্য সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা। কিন্তু ১৯৩৩ সাল থেকে আমেরিকান জীববিদ আলডো লিওপোল্ড তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন। তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য এমনকি আধুনিক যুগের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তায় পরিবেশ বা বাস্তুকেন্দ্রিক আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মানব সত্তা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়ার কারণে এ সকল যুগের দার্শনিকবৃন্দ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে মানব সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করলেও অমানব সত্তাসমূহের (বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদ, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, জলাশয়, সমুদ্ররাশিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করেননি। দার্শনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক মতবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু উক্ত যুগের যে সকল দার্শনিক অমানব সত্তাসমূহের সহায়ক বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের গোড়াপত্তন করেছেন বলে অনুমান করা যায়। এজন্য এ অধ্যায়ে প্রাচীন যুগের সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকবৃন্দ, সক্রেটিস এবং সক্রেটিস-পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল; মধ্যযুগের দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস, আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে রেঁনে ডেকার্ট, ইমানুয়েল কান্ট এবং জেরেমি বেনথাম প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দের অমানব সত্তা সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখিত দার্শনিকদের মধ্যে বেনথাম ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকেরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃতি ও অমানব সত্তাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে অমানব সত্তাসমূহ সম্পর্কে অনেক দার্শনিকের মধ্যে অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে দেখা যায়। যার ফলে বিভিন্ন পরিবেশবাদী আন্দোলন ও প্রাণি অধিকার আন্দোলনের উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ের শেষভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যায় অমানব সত্তার গুরুত্ব: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে লিওপোল্ডের 'ভূমি নীতিবিদ্যা' মতবাদটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি একটি অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ কারণ এ মতবাদে মানুষের পাশাপাশি ভূমির উপর অস্তিত্বশীল সকল অমানব সত্তাকে নৈতিকতার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করার জন্য নীতিবিদ্যার পরিধির সম্প্রসারণের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও অমানব সত্তাসমূহও যে মানুষের মূল্যায়ন নিরপেক্ষ স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা তা বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার আলোকে অমানব সত্তার নৈতিক মূল্য ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য বাস্তুতন্ত্র, জীব পিরামিড ও সমগ্রতাবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতার নীতি'র গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্থলজ বাস্তুতন্ত্র থেকে যে সকল অমানব সত্তার বিলুপ্তি সাধিত হয়েছে এবং যে সকল সত্তা সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে লিওপোল্ডের অখণ্ডতার নীতি ও সমগ্রতাবাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দার্শনিকের সমালোচনাকে যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন'। সাম্প্রতিক সময়ে 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণাটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সমগ্র বিশ্ববাসী বর্তমানে একটা বিষয়ে অবগত যে, যথার্থ অর্থে উন্নয়ন বলতে টেকসই উন্নয়নকে বোঝানো হয় এবং প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণ ব্যতীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্প টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এ অধ্যায়ে 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণাটির ঐতিহাসিক পটভূমি, সংজ্ঞা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রক্ষায় টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া লিওপোল্ডের অখণ্ডতার নীতির আলোকে বিশ্ববাস্তবতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং এর সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক ও সুদুরপ্রসারী প্রভাবের গুরুত্বকেও এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশে বনভূমির চলচিত্র'। একটি দেশের উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য সে দেশের বনভূমিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা না গেলে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত স্থায়ী হবে না। এজন্য বনভূমিকে যে-কোনো দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বনভূমি পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। আলোচ্য অধ্যায়ে বনভূমির সংজ্ঞা, বাংলাদেশের বনভূমি, বনভূমির শ্রেণীবিভাগ ও অবস্থান, বর্তমান অবস্থা, বনভূমি বিনাশের কারণ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বনভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লিওপোল্ডের সংরক্ষণবাদী মতবাদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায় 'এসডিজি ১৫ অর্জনে বনভূমির গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জসমূহ'। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে বনভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ, বনভূমি শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নয়, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তবে শিল্পোন্নোয়ন, নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে দেশের বনভূমি ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা ও অর্থনীতিতে বনভূমির অবদান, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিবেশের অবক্ষয়ের সম্পর্ক, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনের প্রধান অন্তরায়সমূহ, এ অন্তরায়সমূহ থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপসমূহ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় করণীয়সমূহ এবং এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতা নীতি'র' প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম বা শেষ অধ্যায় গবেষণার উপসংহার। এ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী ছয়টি অধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

১.৫ অমানব সত্তা সম্পর্কিত আলোচনার পটভূমি

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ নজীরবিহীন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। মূলত মানুষের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণে ডাইনোসরের বিলুপ্তির পর থেকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রাণি গণবিলুপ্তির স্বীকার হয়েছে। অনুমান করা যায়, প্রতিদিন শতাধিক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এই হার আগামী কয়েক দশকের মধ্যে দ্বিগুণ বা তিনগুণ হতে পারে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সত্তা যেমন, বিভিন্ন প্রজাতির অমানব প্রাণি ও উদ্ভিদসমূহ, নদী-নালা, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, ভূমি প্রভৃতি পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু এ সকল সত্তা উদ্বেগজনক হারে পরিবর্তিত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে এবং হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রমবর্ধমান এ জনসংখ্যা সমস্যার সাথে দুর্ভাগ্যবশত রোগ, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং যুদ্ধের মতো সমস্যাও আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। এ সকল সমস্যার তীব্রতার সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের সম্ভাবনাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবলমাত্র অতিরিক্ত জনসংখ্যা অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করছে তা নয়, বরং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনধারাও জীবমণ্ডলের চাহিদা বাড়াচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জমা হতে থাকা বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মহামারি আকার ধারণ করবে, কারণ পারমানবিক বর্জ্যের কিছু অংশ হাজার হাজার বছর ধরে প্রাণঘাতী হিসেবে থেকে যাবে। বিশ্বের মরুভূমি অঞ্চল, বনভূমি, জলাভূমি, কর্ষণীয় জমি (topsoils), পর্বত এবং তৃণভূমিগুলো ক্রমে ক্রমে পাকা করে বাধানো হচ্ছে, নিষ্কাশন করা হচ্ছে, পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং সর্বোপরি এগুলোর অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন। ওজোন স্তরের বৃহৎ এলাকা ধ্বংস এবং গ্রিণহাউজ গ্যাসের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ একদিকে যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং জলবায়ুকে ব্যাহত করছে অন্যদিকে তেমন প্রাকৃতিক অমানব সত্তাকেও ধ্বংস করছে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আমরা বিপর্যয়কর পরিবেশগত ভবিষ্যতের সম্মুখীন এবং এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে- বর্তমানের মতো রাজনৈতিক পরিবেশে আমরা কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবো? আমাদের এ কথাও স্বীকার করা উচিত যে বর্তমান পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অনেকগুলো চিন্তাহীন বা বোধসম্পন্ন মানুষের দ্বারা নয়, বরং পূর্ববর্তী প্রজন্মের সরল বিশ্বাসের দ্বারা নেয়া সিদ্ধান্তের ফলাফল। প্রকৃতপক্ষে এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অনেকগুলো পর্যাপ্ত খাদ্য, সাশ্রয়ী শক্তি এবং আয়ুবৃদ্ধির আকারে পূর্ববর্তী এবং বর্তমান উভয় প্রজন্মের জন্য খুব উপকারী ফলাফল ছিল। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তেরও বিধ্বংসী পরিণতি ঘটেছে। আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে শক্তিনীতি, জনসংখ্যা এবং খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে নেয়া আমাদের সিদ্ধান্তগুলোও খারাপ কোনো পরিণতি ডেকে নিয়ে আসবে না? এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে একটি বিষয় যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়- তাহলো আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য দার্শনিক নীতিবিদ্যার সাহায্য নেয়া উচিত। কারণ আমাদের কেমন ধরনের জীবনযাপন করা উচিত, আমাদের কীভাবে আচরণ করা উচিত এবং আমাদের কি ধরনের মানুষ হওয়া উচিত?- এ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দার্শনিক নীতিবিদ্যা আমাদের জীবনের আত্মসচেতন পদক্ষেপের সাথে জড়িত।[৩]

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে জগত ও জীবনের প্রায়োগিক দিকের প্রতি দার্শনিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত দর্শনের ইতিহাসের তিনটি প্রধান (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) যুগে যে বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যদিও দর্শনের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, জগত ও জীবনের মৌলিক সমস্যা ও এর সমাধান থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে দর্শনের জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু শুধু বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার দার্শনিক আলোচনা ও সমাধান সম্ভব নয়, এজন্য বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে প্রায়োগিক দর্শনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। প্রায়োগিক দর্শন ব্যক্তির দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলোর সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করে। যেহেতু এ সকল সমস্যার আলোচনার মূলেও তত্ত্বিক দিক রয়েছে সেহেতু তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রায়ই দর্শনে বিমূর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দর্শনে কোনো বিষয়ের বিমূর্ত আলোচনা বোঝাতে তার প্রত্যয়গত ও ধারণাগত বিশ্লেষণকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে যে আলোচনায় কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তত্ত্ব প্রয়োগ ও প্রত্যয়ের অর্থ সুস্পষ্ট করা হয় তাকে প্রায়োগিক আলোচনা বলা হয়।[৪] এদিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা সনাতনী নীতিবিদ্যার প্রায়োগিক দিককে নির্দেশ করে। কারণ সনাতনী নীতিবিদ্যা অনুসারে, শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক মূল্য রয়েছে; এজন্য মানুষ শুধু মানুষের সাথে নৈতিক আচরণ করবে। অর্থাৎ সনাতনী নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক (Anthropocentric)। কিন্তু পরিবেশ নীতিবিদ্যা সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত করে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যাবলীর পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তার নৈতিক মূল্য এবং অধিকার প্রদান সংক্রান্ত আলোচনাকেও এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক এবং অমানবকেন্দ্রিক (Non-anthropocentric) উভয়ই।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে, পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো মানুষ এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের একটি পদ্ধতিগত আলোচনা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা ধরে নেয় যে, নৈতিক বিধি মানুষের আচরণকে প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং করে। অর্থাৎ পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি তত্ত্বকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে এই নৈতিক বিধিগুলো কী, মানুষ কাদের বা কিসের প্রতি দায়িত্বশীল এবং এই দায়িত্বগুলো কীভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] পরিবেশ নীতিবিদ্যা দুটি অবস্থান (মানবকেন্দ্রিক ও অমানবকেন্দ্রিক) থেকে এ সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলীকে বিবেচনা করে থাকে। পরিবেশ নীতিবিদ এবং পরিবেশবিদগণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তা রক্ষায় সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশের ধারণাগুলোকে প্রায়শই সমার্থক বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'প্রকৃতি' ও 'পরিবেশ' শব্দ দুটির উৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী পরিবেশের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Environment'। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'Environner' থেকে যার অর্থ 'বেষ্টিত করা'। সুতরাং এ ডিকশনারী অনুযায়ী 'পরিবেশ' বলতে "বস্তু বা কোনো কিছুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল"[৬] - বোঝায়। অন্যদিকে, 'প্রকৃতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Nature' যা ল্যাটিন শব্দ 'Natura' থেকে এসেছে।[৭] অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে পরিবেশ ও প্রকৃতি শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, আমার এলাকার মোড়ে অবস্থিত খাবারের দোকানটি প্রকৃতির নয় পরিবেশের অংশ। অন্যদিকে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কারণে বলা যায় যে, আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনগুলো প্রকৃতির অংশ, কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না যে তারা পরিবেশের অংশ। সুতরাং পরিবেশ বলতে আমরা প্রকৃতির সেই বিশেষ নির্ধারিত স্থানকে বুঝাই যাকে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই। যেমন, বাংলাদেশে অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, মিঠা পানির টাঙ্গুয়ার হাওড় প্রভৃতি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হওয়া স্থান। কিন্তু এসব বিশেষ স্থানের চেয়ে পরিবেশ আরও বেশি কিছু কারণ পরিবেশের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশই নয়, নান্দনিক অনুভূতি থেকে কৃত্রিমভাবে নির্মিত পরিবেশও এর অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিরোধের শুরু হয়েছে ২০ শতকের শুরুতে বা তারও কিছু পরে কিন্তু প্রকৃতির অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কিত আলোচনা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাচীন যুগেই প্রাধান্য পেয়েছে। ইউজিন সি. হারগ্রোভ (Eugene C. Hargrove) তাঁর *Foundations of Environmental Ethics* গ্রন্থে বলেন, পরিবেশবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি নতুন নীতির আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন যা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে।[৮] প্রকৃতির প্রতি কয়েক শতাব্দীর এই পরিবর্তনশীল মনোভাবের ফসল হিসেবে আধুনিক পরিবেশগত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং ১৯ শতকের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিকাশের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব এবং শিল্প। হারগ্রোভ দাবি করেন যে, পৃথিবী এবং এর প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ববর্তী উদ্ভিদবিদ, জীববিজ্ঞানী এবং ভূতাত্ত্বিকদের নান্দনিক উপলব্ধির তুলনায় আধুনিক বাস্তুবিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের মধ্যে উপলব্ধিগত পার্থক্য বিদ্যমান।[৯]

দার্শনিকগণ যখন পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য বিভিন্ন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে শুরু করেন, তখন দুটি মৌলিক প্রশ্ন তাদেরকে প্রভাবিত করে। **প্রথমত**, মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কোনো নৈতিক সম্পর্ক আছে কি? **দ্বিতীয়ত**, এই সম্পর্কের দার্শনিক ভিত্তি কী?[১০] এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে

গিয়ে অনেক দার্শনিক লক্ষ করেন যে আদর্শ নৈতিক তত্ত্বের প্রতি আবেদন অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশগত ধ্বংস এবং অবক্ষয়ের জন্য অবদান রেখেছে। কারণ অধিকাংশ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে, মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ নৈতিক সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির অধিকাংশ নৈতিক তত্ত্ব অনুসারে, শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক অবস্থান স্বীকার করা হয়। এ অর্থে, এ ধরনের নৈতিক তত্ত্বগুলো যেমন মানবকেন্দ্রিক তেমন পরিবেশ নীতিবিদ্যাও মানবকেন্দ্রিক এবং পরিণামবাদী; এছাড়াও পরিবেশগতভাবে কোনটি সঠিক বা ভুল সেটাও মানুষের পরিণতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুযায়ী দার্শনিকবৃন্দ মনে করেন, যদিও প্রাকৃতিক জগতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো দায়িত্ব নেই। পরিবেশগত দায়িত্ব পালন হলো বিচক্ষণতার বিষয়, কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য পরিবেশ রক্ষা করি।[১১]

পাশ্চাত্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের অমানব সত্তার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহানুভূতিহীন ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক বিশ্বের শোষণ এবং আধিপত্যের জন্য যে সকল যুক্তি প্রদান করে তা আমাদের বর্তমান পরিবেশগত দুর্দশার জন্য আংশিকভাবে হলেও দায়ী। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক জগৎ ও প্রাকৃতিক জগতের অমানব সত্তার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দার্শনিকদের দোষী সাব্যস্ত করলে হবে না বরং এক্ষেত্রে পশ্চিমা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিও সমানভাবে দোষী। এই দাবি করা প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন ইতিহাসবিদ লিন টাউনসেন্ড হোয়াইট জুনিয়র (১৯০৭-১৯৮৭)। তিনি বলেন, এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে জেনেসিসের অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেখানে জুডো-খ্রিস্টান ঈশ্বর সমস্ত জীবিত প্রাণিকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন, "আসুন আমরা মানুষকে সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, গবাদি পশু, পৃথিবীর সমস্ত বন্য প্রাণী এবং পৃথিবীতে হামাগুড়ি দেয়া সমস্ত সরীসৃপকে শাসন করার জন্য আমাদের প্রতিমূর্তি এবং উপমায় তৈরি করি।" তাই ঈশ্বর তাদের নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের আর্শীবাদ করলেন এবং তাদের বললেন "ফলবান হও এবং বহুগুণ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর এবং বশীভূত কর; এবং সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং সমস্ত জীবন্ত প্রাণির উপর কর্তৃত্ব কর যা পৃথিবীর উপর চলে।"[১২] অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, পৃথিবীতে যত ধরনের অমানব সত্তাসমূহ আছে তাদেরকে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সকল সত্তাকে শাসন করার জন্য বা তাদের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করার জন্য ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং পাশ্চাত্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলো খ্রিস্টান সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

পাশ্চাত্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগুলোও যে আমাদের বর্তমান পরিবেশগত সংকটের মূলে রয়েছে এমন সম্ভাবনা সম্পর্কে হোয়াইট তাঁর ক্লাসিক প্রবন্ধ "The Historical Roots of our Ecological Crisis"- এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হোয়াইট যুক্তি দেন যে, প্রকৃতির প্রতি আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো একটি নির্দিষ্ট জুডিও খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারমাত্র এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে মানবকেন্দ্রিক।[১৩] হোয়াইট অনুসারে বলা যায় যে, পরিবেশ এবং অমানব সত্তা সম্পর্কে প্রাচীন পাশ্চাত্য ধর্মীয় এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো মানবকেন্দ্রিক। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন অমানব প্রাণি, গাছপালা,

পাহাড়, নদী, প্রান্তর এলাকা এমনকি সমগ্র পৃথিবীকেই নৈতিক অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নৈতিকতার পরিধির সম্প্রসারণের দাবি করা হয়। এ সকল অমানব সত্তাকে নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আর তা হলো- তাদের অধিকার আছে কিনা? কিন্তু অধিকাংশ দার্শনিক আবার সব ক্ষেত্রেই অধিকারকে স্বীকার করতে রাজী নন যেখানে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। যেমন, অনেক দার্শনিকের মতে, যদিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তবে তাদের অধিকার আছে এ কথা বলা অর্থহীন। বিশেষ করে উপযোগবাদী দার্শনিকবৃন্দ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে এ বিষয়টি স্বীকার করলেও তাদের অধিকারের বিষয়টি অস্বীকার করেন।[১৪]

বিংশ শতাব্দীতে এসে অনেক দার্শনিক অমানব সত্তার ক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক মনে করলেও এ সকল সত্তার প্রতি যখন আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো পরীক্ষা করি তখন নৈতিক অবস্থান এবং নৈতিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জোয়েল ফিনবার্গ (Joel Feinberg, 1926-2004) অমানব প্রাণির ক্ষেত্রে নৈতিক অবস্থানের পরিবর্তে অধিকারের প্রশ্নকে বেশি গুরুত্ব দেন। ফিনবার্গ বলেন অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করে যে, আমাদের কর্তব্য হলো প্রাণির প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া বা দুর্ব্যবহার না করা। অনেকে যুক্তি দিতে পারে যে, এই দায়িত্বটি অন্য মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ যারা প্রাণির সাথে দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়। আবার অনেকে এ যুক্তিও দিতে পারে যে, এই দায়িত্বটি আমাদের নিজের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে উদ্ভূত- উদাহরণস্বরূপ, যে সকল পরিস্থিতি আমাদের মধ্যে নির্মমতা বা নিষ্ঠুরতার মতো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাতে পারে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। ফিনবার্গ যুক্তি দেন যে, প্রাণির প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক কারণ প্রাণিরা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে এই দায়িত্বের (তাদের প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া বা দুর্ব্যবহার না করা) সরাসরি সুবিধাভোগী। তাঁর মতে, প্রাণির প্রতি কর্তব্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে আমরা বাধ্য কারণ প্রাণির এমন স্বার্থ রয়েছে যা আমাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সংগঠিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তিনি বলেন, যখন আমরা কোনো জিনিসের অধিকার আছে বলে স্বীকার করে নিই, তখন অধিকার দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার জন্য সেই জিনিসটার অবশ্যই স্বার্থ বা নিজস্ব ভালো কিছু থাকতে হবে। যেমন, তাজমহল বা সুন্দর প্রাকৃতিক মরুভূমির মতো একটি মূল্যবান জিনিসের অধিকার আছে এ কথা বলা যায় না কারণ এদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ নেই।[১৫]

জোয়েল ফিনবার্গের "The Rights of Animal and Unborn Generations" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রাণি এবং অন্যান্য জীবের নৈতিক অবস্থান সংক্রান্ত তৎকালীন সময়ের আলোচনাগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৭৪ সালে এ প্রবন্ধটি বেশ প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁর যুক্তির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা অমানব প্রাণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন বিতর্কের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। অধিকারের একটি সাধারণ বোঝাপড়ার সাথে শুরু করার পর যা কিছু ভালোর দাবির সাথে জড়িত, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি যার কিছু কর্তব্য আছে বা যা কোনো-না-কোনোভাবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত (উদাহরণস্বরূপ, আইনি নিয়ম বা আলোকিত বিবেক) হয় এমন বিষয়কে তিনি সমর্থন করেন। যেমন, ধর্মীয় স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির পছন্দমতো উপাসনা করার অধিকার যা ব্যক্তির ধর্মীয় উপাসনায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের প্রতি একটি কর্তব্য তৈরি করে।[১৬] ফিনবার্গের এ প্রবন্ধটি নানাভাবে একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ। এটি অধিকার সম্পর্কে অর্থপূর্ণভাবে কী বলা যায় এবং কী করা যায় না তার একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ প্রদান করে। এ প্রবন্ধটি দার্শনিক

Dhaka University Institutional Repository

নীতিশাস্ত্রের জন্য মুক্তির প্রতীক হিসেবেও অভিহিত হয়।[১৭] তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত উদ্বেগ নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার ব্যাপারে দার্শনিকদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছিল। মূলত দার্শনিকেরা প্রথমবারের মতো এই সম্ভাবনাটি বিবেচনা করেছিলেন যে মানুষ ছাড়া অন্য অমানব প্রাণিরাও তাদের নিজস্ব স্বার্থে নৈতিক বিবেচনার যোগ্য, কেবলমাত্র মানুষ তাদের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে নয়।

ফিনবার্গের মতে, একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যখন অধিকারের দাবীদার হিসেবে বিবেচনা করা হয় তখন তাকে স্পষ্টতই এমন প্রাণি হিসেবে অভিহিত করা হয় যার অধিকার সম্পর্কে অর্থপূর্ণভাবে ভবিষ্যৎদ্বাণী করা যেতে পারে। কিন্তু এটা বলা অযৌক্তিক যে, শিলাখণ্ডের অধিকার আছে। কারণ শিলাখণ্ডগুলো নৈতিকভাবে নিকৃষ্ট জিনিস বা অধিকারের অযোগ্য এজন্য নয় বরং শিলাখণ্ডগুলো এমন একটি শ্রেণীর সত্তার অন্তর্গত যাদের অধিকার সম্পর্কে অর্থপূর্ণভাবে ভবিষ্যৎদ্বাণী করা যায় না। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের জন্য কি অর্থপূর্ণ বা ধারণাগতভাবে অধিকার প্রদান করা সম্ভব? স্বতন্ত্র প্রাণির জন্য? সমগ্র প্রজাতির প্রাণির জন্য? গ্রহের জন্য? বোকা এবং মানসিক ভারসাম্যহীনের জন্য? ভ্রুণের জন্য? অজাত প্রজন্মের জন্য?[১৮] এ সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফিনবার্গ বলেন, যাদের স্বার্থ আছে শুধু তারা অধিকার পাওয়ার যোগ্য। তাঁর মতে, যাদের "Conative life" আছে তাদের স্বার্থ আছে। "Conative life" বলতে তিনি সচেতন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আশা বা অভিলাষ বা প্ররোচনা; অথবা অচেতন কর্মশক্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য; বা সুপ্ত প্রবণতা, বিকাশের গতিপথ এবং প্রাকৃতিক পূর্ণতা প্রভৃতি গুণাবলির সমন্বয়কে বুঝিয়েছেন।[১৯] এ সকল গুণ যে যে সত্তার মধ্যে বিদ্যমান তাদের স্বার্থ আছে। এই মানদণ্ডটি ফিনবার্গ পরিবেশগত উদ্বেগের বিভিন্ন বস্তুতে প্রয়োগ করেন। এ মানদণ্ডের আলোকে স্বতন্ত্র প্রাণি হিসেবে উচ্চতর প্রাণিদের অধিকার আছে বলা গেলেও নিম্নস্তরের প্রাণিদের নিছক কীটপতঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উদ্ভিদের অধিকার আছে বলা যায় না কারণ তাদের স্বার্থের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় "প্রাথমিক জ্ঞানীয় সরঞ্জাম" (rudimentary cognitive equipment) নেই। আবার আমরা এ কথাও বলতে পারি না যে, প্রজাতির অধিকার আছে; যদিও আমরা সেই প্রজাতির স্বতন্ত্র সদস্যদের উপর অধিকারকে আরোপ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডলফিনের মাছ ধরার জালে ডুবে না যাওয়ার আগ্রহ রয়েছে- তাই বলা যায় যে ডলফিনটির মাছ ধরার জালে মারা না যাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রজাতি হিসেবে ডলফিনদের বেঁচে থাকার মতো কোনো অধিকার নেই। ফিনবার্গের মতে একটি পৃথক প্রাণিকে হত্যা না করা আমাদের কর্তব্য হতে পারে কিন্তু বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রজাতির প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আমরা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারি যারা উপযুক্ত "জ্ঞানীয় সরঞ্জাম" ধারণ করে। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব থাকবে সেহেতু আমরা এটাও বলতে পারি যে তাদের স্বার্থ আছে। সুতরাং ফিনবার্গ অনুসারে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সম্পর্কেও আমরা কথা বলতে পারি।[২০] ফিনবার্গের পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে পিটার সিঙ্গার *Animal Liberation* এবং ১৯৮৩ সালে টম রিগান *The Case for Animal Rights* শীর্ষক গ্রন্থে স্বার্থের ধারণাকে ব্যবহার করে অমানব প্রাণির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন (অমানব প্রাণির অধিকার সম্পর্কিত পিটার সিঙ্গার ও টম রিগানের মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। ফিনবার্গ, সিঙ্গার এবং রিগান প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ একটি বিষয়ে একমত যে, যেহেতু অমানব প্রাণির অধিকার আছে সেহেতু অমানব

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণি নৈতিক বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তাঁরা অমানব প্রাণির নৈতিক মূল্য স্বীকার করলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের আরও যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সত্তা আছে তাদের নৈতিক মূল্য স্বীকার করেননি।

সাধারণভাবে মানুষের সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য বা সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যই যে শুধু পরিবেশের প্রয়োজন তা নয়, বরং ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং সর্বোপরি মানব কল্যাণের জন্যও একটি ভালো বা কার্যকর পরিবেশের উপর যেমন গুরুত্বারোপ করা উচিত তেমন অমানব সত্তাসমূহকেও রক্ষা করা উচিত। কারণ অমানব সত্তার সংরক্ষণ ব্যতীত টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অর্জন সম্ভব না। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক হওয়ায় পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিষয়কে এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত করেনি। যদিও দার্শনিকেরা দীর্ঘদিন ধরে একটি নতুন নীতির অন্বেষণ করে আসছিলেন যা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অমানব সত্তাসমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে একটি টেকসই ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে। অমানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা প্রচলিত নীতিবিদ্যার এমন একটি শাখা যেখানে অমানব প্রাণির বিভিন্ন প্রজাতি ছাড়াও উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, ভূমি প্রভৃতি অমানব সত্তার নৈতিক অবস্থান স্বীকার করা হয়। এ মতবাদের সমর্থকবৃন্দ যুক্তি দেন যে, অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে তেমন অমানব সত্তাসমূহের প্রতিও আমাদের সরাসরি দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য যথার্থ নৈতিক নীতিগুলোর আরও বিস্তৃতি এবং সংশোধন প্রয়োজন।[২১] প্রাণির নৈতিক আচরণ ঘিরে বিতর্ক এবং অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির বিলুপ্তির হুমকি অমানবকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার সবচেয়ে পরিচিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। পরিবেশগত নৈতিকতার আরও বিকাশ ঘটে পৃথক জীবন্ত সত্তার উপর ফোকাস থেকে- যেমন, দাগযুক্ত পেঁচা বা রেডউড গাছ সংগ্রহ এবং প্রজাতি, জনসংখ্যা বা বাস্তুতন্ত্রের উপর ফোকাস করার মাধ্যমে। সমগ্রবাদী পরিবেশ নীতিবিদ্যা যদিও বেছে বেছে পৃথক কিছু সত্তার শিকারের অনুমতি দিয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রজাতির জনসংখ্যা বিপন্ন না হয়। তারপরও সমগ্রবাদী পরিবেশ নৈতিকতা স্বীকার করে যে, সকল ধরনের অমানব সত্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সমগ্রবাদী পরিবেশ নীতিবিদ্যা বাস্তুশাস্ত্রের বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, জীবীত হওয়া, ব্যাথা অনুভব করা, সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে কোনো সত্তার নৈতিক অবস্থান অর্জনের জন্য আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ মানদণ্ড ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে প্রসংশনীয়ভাবে প্রযোজ্য হলেও যে কোনো অমানব সত্তার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কম যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হয়।[২২] এজন্য সাম্প্রতিক সময়ের পরিবেশবাদী দার্শনিকবৃন্দ অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন সেগুলোকে সমগ্রবাদী পরিবেশ নৈতিকতা এবং একইসাথে অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন।

পরিবেশের পরিধির বিস্তৃতি যে কোনো সময়ের সমসাময়িক পরিবেশ আন্দোলনের সমগ্রবাদ (holism) ধারণার দ্বারা প্রতিফলিত হয়। ১৯৭১ সালে ব্যারি কমনার (Barry Commoner) তাঁর *The Closing Circle* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "সবকিছু অন্য সবকিছুর সাথে সংযুক্ত"[২৩]- এটা হলো বাস্তুবিদ্যার প্রথম আইন। সাধারণ পরিবেশবাদী স্লোগানেও ("মানুষ প্রকৃতির অংশ")[২৪] সামগ্রিক আদর্শ অনুরণিত হয়। এ স্লোগানটি প্রায়শই "আসল পাপ" বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা পরিবেশগত ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে তা হলো প্রকৃতি থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার প্রচেষ্টা। আমরা কেবল তখনই প্রকৃতির সাথে একটি সুস্থ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ফিরে যেতে পারবো যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করার এই প্রচেষ্টাটি ধ্বংসাত্মক এবং একই সাথে জড়বুদ্ধির (fatuous) পরিচায়ক।[২৫]

অমানব প্রাণির নৈতিক বিবেচনাকে প্রসারিত করার মাধ্যমে অন্যান্য প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহকেও নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক এবং প্রভাবশালী প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্তমান গবেষণায় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আইনের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার স্টোন বনভূমি, মহাসাগর, নদীসহ আরও অন্যান্য সত্তা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনাকে প্রসারিত করার পক্ষে যুক্তি দেন।[২৬] প্রাণি অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল দার্শনিক প্রাণির মধ্যে মানুষের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন তাদের বিপরীতে ক্রিস্টোফার স্টোন আইনি অধিকারের প্রকৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্রিস্টোফার কর্তৃক প্রাকৃতিক বস্তুর অধিকার রক্ষার উপলক্ষ ছিল মিনারেল কিং ভ্যালি[২৭] সংক্রান্ত আইনি বিরোধ। সিয়েরা ক্লাব[২৮] ওয়াল্ট ডিজনি এন্টারপ্রাইজকে সিয়েরাসে একটি বৃহৎ স্কি রিসোর্ট তৈরি করতে বাধা দেয়ার জন্য মামলা করেছিলো। এই মামলাটি ক্যালিফোর্নিয়ার আদালত খারিজ করে দেয় কারণ অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে সিয়েরা ক্লাবের কিছু আইনগত দুর্বলতা ছিল। অর্থাৎ সিয়েরা ক্লাবের সদস্যরা দেখাতে পারেনি যে তারা মিনারেল কিং ভ্যালির উন্নয়নের দ্বারা আইনত স্বীকৃত কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ মামলাটি নিস্পত্তির জন্য যখন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয় তখন ক্রিস্টোফার স্টোন "Should Trees Have Standing?" (১৯৭২) শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি সিয়েরা ক্লাবের মামলাকে সমর্থন করেন এই যুক্তি দিয়ে যে, গাছ এবং পাহাড়ের ধারে অবস্থিত বস্তুসমূহ যেগুলো উপত্যকার উন্নয়নের কারণে ধ্বংস হবে তাদেরকে আইনি সমর্থন দেয়া উচিত। তাঁর মতে, সিয়েরা ক্লাবকে এই অধিকারের আইনি অভিভাবক হিসেবে দেখা যেতে পারে।[২৯]

আইনি অধিকারের প্রকৃতির একটি পরীক্ষা দিয়ে ক্রিস্টোফার তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেন। অধিকারগুলো প্রকৃতিতে আবিষ্কৃত হয়- এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখান করে তিনি অধিকারের বিবর্তনীয় বিকাশের উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন, অধিকারগুলো যখন কিছু সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হয় তখন সেগুলো টিকে থাকে। "মানুষের নৈতিক বিকাশের ইতিহাস তার সামাজিক প্রবৃত্তি এবং সহানুভূতির বস্তুতে অবিরাম প্রসারিত হয়েছে"[৩০] - ডারউনের এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ক্রিস্টোফার দেখান কিভাবে আইনি অধিকারের স্বীকৃতি একটি সমান্তরাল বিকাশের সাক্ষী। অধিকার ধারকদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য অধিকারের কার্যকারিতা এবং অধিকারধারীদের তালিকা ক্রমাগত প্রসারিত করা হয়েছে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, এক সময় শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক সাদা জমিদার পুরুষেরা সম্পূর্ণ আইনি অধিকার ভোগ করতো। কিন্তু বর্তমানে এখন এমন লোকদের নৈতিক অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যারা জমির মালিক নন বরং নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, নেটিভ আমেরিকান এবং কর্পোরেশন, ট্রাস্ট, শহর এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। এদিক থেকে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের সুরক্ষা প্রসারিত করার সময় এসেছে। ক্রিস্টোফার যুক্তি দেন যে, শুধুমাত্র কিছু কর্তৃত্বকারী সংস্থার স্বীকৃতিই অধিকারের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।[৩১]

প্রাকৃতিক অমানব সত্তাকে নৈতিক অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ কীভাবে নিজেদের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

কর্পোরেশন এবং মানসিকভাবে অক্ষম মানুষের কোনো আইনগত অবস্থান না থাকা সত্ত্বেও যেমন তাদের একজন অভিভাবক থাকে তেমন একইভাবে, ক্রিস্টোফার যুক্তি দেন প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও একজন অভিভাবক বা সংরক্ষক বা ট্রাস্টি নিয়োগ করা যেতে পারে। একজন অচেতন (Comatose) ব্যক্তির যেমন একজন আইনি অভিভাবক থাকে তেমন কোনো কর্পোরেশন বা ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে বনভূমি, নদী এবং পর্বত প্রভৃতি অমানব সত্তার স্বার্থকে আইনগতভাবে সমর্থনের জন্য মানুষের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে।[৩২] ক্রিস্টোফারের এ যুক্তি অমানব সত্তাসমূহকে নৈতিক অবস্থান বা আইনি অধিকার প্রদানের জন্য যথাযথ বলা যেতে পারে। কারণ ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, সমাজের শিশু, বৃদ্ধ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এমনকি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাদের বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও আমরা তাদের নৈতিক মূল্য ও অধিকার স্বীকার করে থাকি। তাহলে যে সকল প্রাকৃতিক বস্তু বা সত্তা মানবসত্তার ভালোভাবে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তাদের নৈতিক মূল্য কেনো স্বীকার করা হয় না?- এ প্রশ্নটি অনেক ক্ষেত্রে আজও অমীমাংসিত।

সকল ধরনের অমানব সত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রিস্টোফার যে আইনি অবস্থানের সম্প্রসারণের উল্লেখ করেন তা পূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি। তবে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন ক্ষতিকর রাসায়নিক কীটনাশক ডিডিটি কীভাবে প্রকৃতির সকল স্তরের অমানব সত্তাসমূহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এ সকল সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায় সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ১৯৬২ সালে তিনি *Silent Spring* শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। এ গ্রন্থটি আধুনিক পরিবেশবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত এবং বহুল প্রচলিত। যদিও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক মূল্য স্বীকার করা বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কোনোটিই কারসনের উদ্দেশ্য ছিল না বরং সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর কীটনাশক ডিডিটির ক্ষতিকর প্রভাবই ছিল তাঁর উদ্বেগের প্রধান কারণ। অন্যদিকে, ক্রিস্টোফার স্টোন *Should Trees Have Standing*? শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন ১৯৭২ সালে।[৩৩] অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের উপর যে সঠিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে সে বিষয়টি কারসন তাঁর গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন যা ক্রিস্টোফার স্টোনকেও প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান করা যায়। স্টোন মনে করেন অমানব সত্তাসমূহের অধিকারের ক্ষেত্রে আইনি অবস্থানের সম্প্রসারণের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের ঐক্যমতে পৌঁছানো প্রয়োজন। আইনগত অবস্থান বলতে তিনি এমন কিছুকে বুঝিয়েছেন যা একটি সরকারি সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত হওয়া দরকার। কিন্তু প্রাকৃতিক বস্তুর মূল্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সরকারি সংস্থার স্বীকৃতির পাশাপাশি জনসাধারণের ঐক্যমতও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন।

র‍্যাচেল কারসন ও ক্রিস্টোফার স্টোনের অনেক আগেই আলডো লিওপোল্ড অমানব সত্তাসমূহকে নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নৈতিকতার সীমা সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন। সাধারণত জীববিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোতে বিভিন্ন অমানব সত্তাসমূহ নিয়ে পৃথক বা সম্মিলিতভাবে আলোচনা করা হলেও পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় লিওপোল্ড প্রথম নীতিবিদ্যাকে

গুরুত্ব দেন। তিনি একজন বন রক্ষাকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। নিউ মেক্সিকো এবং অ্যারিজেনার অ্যাপাচি এবং কারসন জাতীয় বনে তিনি কর্মরত ছিলেন।[৩৪] তিনি একজন চমৎকার প্রকৃতির লেখক ছিলেন, *A Sand County Almanac* তাঁর সবচেয়ে পরিচিত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ যা ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৫] একজন বন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উপলব্ধি করতে না পারলে বাস্তুতন্ত্রের শোচনীয় পরিণতি রোধ করা সম্ভব নয়। বাস্তুতন্ত্র হলো একই আবাসস্থলের অ-জীব উপাদানগুলোর (মাটি, পানি, বায়ু, সূর্যালোক ইত্যাদি) কিছু পরিমাণে আন্তঃনির্ভরতায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সমাবেশ।[৩৬] বাস্তুতন্ত্রগুলোকে কখনও কখনও সুপার অর্গানিজম হিসেবে বর্ণনা করা হয়। যার অংশগুলো সাধারণ জীবের অঙ্গগুলোর মতো একইভাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বন-বাস্তুতন্ত্রের (forest ecosystem) গাছগুলো হলো এর "ফুসফুস" যার প্রাথমিক কাজ হলো গ্যাস বিনিময়। এগুলো অবশ্যই ফুসফুসের মতো দেখায় না, যদি না ফুসফুসের শ্বাসনালীর সাথে তাদের শাখা গঠনের তুলনা করা হয়। ফুসফুস মানব শরীরে যে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। গাছ দ্বারা শোষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় এবং এটি থেকে নিষ্কাশিত কার্বন তাদের টিস্যুতে একত্রিত হয়। যখন গাছ মারা যায় এবং ক্ষয় হয় বা তাদের কিছু অংশ খাওয়া হয় তখন এই কার্বনটি সমগ্র বাস্তুতন্ত্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যবহৃত হয় ঠিক অক্সিজেনের মতো। একটি বন বাস্তুতন্ত্রের সংবহন ব্যবস্থা (Circulatory System) অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়, পুষ্টি পরিবহন করে এবং বর্জ্য বহন করে যেমনটি রক্ত একটা প্রাণির দেহে করে। জলাভূমি হলো এর কিডনি যা এই সংবহনতন্ত্রের দূষিত দ্রব্যাদিকে বিশুদ্ধ করে। এভাবে সব অংশের সহযোগে বাস্তুতন্ত্রের জৈব মডেল (Organismic model) গঠিত হয়।[৩৭] এই মডেলটি ইঙ্গিত দেয় যে, যেমন জীবদের নিজস্ব মঙ্গোল রয়েছে, তেমনই বাস্তুতন্ত্রেরও একটি নিজস্ব মঙ্গোল থাকতে পারে।

জৈব মডেলের মতো আর একটি মডেল হলো সম্প্রদায় মডেল (Community model)। সম্প্রদায় মডেল অনুসারে, একটি বাস্তুতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ের মতো যার সদস্যরা স্বতন্ত্র জীব। সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রত্যেকেই সম্প্রদায়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং একে অপরকে ব্যবহার করে যাতে জটিল আন্তঃনির্ভরতার বিকাশ হয়। এই আন্তঃনির্ভরতাগুলো ব্যাহত হলে সম্প্রদায় এবং এর সদস্যদের ক্ষতি হয়। কিন্তু সম্প্রদায় যদি শক্তিশালী হয় তাহলে এর সদস্যরাও শক্তিশালী এবং সংখ্যায় প্রচুর হয়।[৩৮] অর্থাৎ মানব সম্প্রদায়ের মতো বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি সত্তা স্বতন্ত্র হলেও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যেও আন্তঃনির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদি এ সম্পর্ক দৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়, তাহলে বাস্তুতন্ত্রও সুসংহত এবং স্বাস্থ্যকর থাকে। অন্য আরেকটি মডেল হলো থার্মোডাইনামিক মডেল (Thermodynamic model) যা বাস্তুতন্ত্রকে উপাদান এবং শক্তি প্রবাহের পরস্পর সম্পর্কিত অংশ নিয়ে গঠিত একটি জটিল গঠন হিসেবে দেখে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাণি ও উদ্ভিদের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র ইত্যাদি। শক্তির প্রাথমিক উৎস হলো সূর্যালোক যা সালোকসংশ্লেষী উদ্ভিদ (photosynthetic plants) দ্বারা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে সমগ্র বাস্তুতন্ত্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৯] এই তিনটি মডেলের কোনোটিই এককভাবে বাস্তুতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধারণা প্রদান করে না। তারপরেও জৈব ও সম্প্রদায় মডেলকে আংশিক রূপক

অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাস্তুতন্ত্রকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীব বা সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করা হলেও, এর অর্থ এই নয় যে জীব বা সম্প্রদায়ের যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার সবগুলোই বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সত্য হবে। বিশেষ করে জৈব ও সম্প্রদায় মডেল অনুসারে আমরা স্বীকার করতে পারি যে জীব বা মানব সম্প্রদায়ের নিজস্ব মঙ্গোল রয়েছে, কিন্তু এ থেকে আমরা সরাসরি এ ধারণা করতে পারি না যে বাস্তুতন্ত্রেরও নিজস্ব মঙ্গোল রয়েছে।

আমরা যাকে বাস্তুতন্ত্র বলি লিওপোল্ড তাকে ভূমি বলে অভিহিত করেছেন। বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, লিওপোল্ড থার্মোডাইনামিক মডেল ব্যবহার করে ভূমিকে জীব পিরামিড (Biotic Pyramid) হিসেবে চিত্রিত করেন। আবার নৈতিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তিনি বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের মডেলকেও প্রয়োগ করেন যা তাঁর নৈতিকতাকে একটি সাম্প্রদায়িক স্বাদ (communitarian flavour) দেয়। কিন্তু একজন প্রকৃতিবাদী হিসেবে, তিনি বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও চিন্তা করেন। তিনি দাবি করেন যে, সম্প্রদায়গুলো বিকশিত হয়, "পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহযোগিতার পদ্ধতির বিকাশের প্রবণতার কারণে"।[৪০] অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যখন একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন সেটির বিবর্তনের মাধ্যমেই একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যে কোনো নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র। সুতরাং "ভূমি নীতিবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্প্রদায় মডেল এবং থার্মোডাইনামিক মডেলের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের আলোচনায় লিওপোল্ডকে বিবর্তন পদ্ধতিও অনুসরণ করতে দেখা যায়।

ভূমি, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণি ছাড়াও ভূমির উপর বেড়ে ওঠা যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহকে নৈতিকতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে নীতিশাস্ত্রের সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার জন্য লিওপোল্ড উক্ত প্রবন্ধে সুপারিশ করেন। ভূমি থেকে আমরা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করে থাকলেও এর প্রতি আমরা কোনো দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করি না।[৪১] ভূমি সম্পর্কিত পরিবেশগত ধারণাটি সম্পত্তি হিসেবে ভূমি সম্পর্কিত লকের দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করে। ভূমিকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখা উচিত, যা সুস্থ বা অসুস্থ, আহত বা ধ্বংস হতে পারে।[৪২] লিওপোল্ড বলেন, "ভূমি, নিছক মাটি নয়; এটি মাটি, গাছপালা এবং প্রাণির আবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত শক্তির ফোয়ারা"।[৪৩] তিনি মনে করেন ভূমি, পানি, উদ্ভিদ এবং প্রাণি প্রভৃতি অমানব সত্তাসমূহের জৈবিক অধিকার (biotic rights) থাকা উচিত আর এ জন্য নৈতিক বিবেচনা প্রসারিত করা প্রয়োজন। তবে, লিওপোল্ড কখনোই এই বিশ্বাস ত্যাগ করেননি যে, এই সকল প্রাকৃতিক অমানব সত্তা মানব কল্যাণে সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে লিওপোল্ডকে পিটার সিঙ্গার, টম রিগান বা ক্রিস্টোফার স্টোনের মতো প্রাণি ও উদ্ভিদের অধিকার রক্ষার সমর্থক হিসেবে অভিহিত করা যায় না।[৪৪] কারণ তিনি প্রাণির নৈতিক অধিকার স্বীকার করলেও, তাদেরকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করারও পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়াও লিওপোল্ডের দীর্ঘদিনের শিকার করার অভ্যাসও এই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি প্রাণি অধিকার আন্দোলনের পক্ষে নন। কিন্তু এই আপাতবিরোধীতা দূর হয়, যখন আমরা ভূমি নৈতিকতাকে সামগ্রিক (holistic) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। তখন "ভূমি সম্প্রদায়" ("land community") নৈতিক মর্যাদা লাভ করে। লিওপোল্ডের মতে, এই সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে পুরো সম্প্রদায়ের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সম্মান অটুট থাকতে হবে। কারণ "পরিবেশগত বিবেক" ("ecological conscience") আমাদেরকে শেখায় যে, মানুষ প্রকৃতির বিজয়ী নয়, বরং তারা জীব সম্প্রদায়ের অংশ। অর্থাৎ বাস্তুশাস্ত্র নৈতিক বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্তি থেকে সরিয়ে জীবগত সামগ্রিকতার (biotic wholes) দিকে স্থানান্তরিত করে।[৪৫] সুতরাং বলা যায় যে, লিওপোল্ডের একক প্রচেষ্টায় বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা গড়ে উঠেছে।

বাস্তুতন্ত্রের আলোচনায় লিওপোল্ড স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা অনেকাংশেই নির্ভর করে সুষ্ঠু বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের উপর। এজন্য তিনি বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবীয় ও অজীবীয় সত্তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, এ সকল অমানব সত্তার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই বাস্তুতন্ত্র অটুট থাকে। আর এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের মধ্যে সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমি বা বাস্তুতন্ত্রের সকল ধরনের অমানব সত্তার সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নৈতিক মূল্যায়নের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। নীতিটি হলো-"জীব জগতের অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখে যা তা-ই ন্যায়, এর পক্ষান্তরে করা হবে অন্যায়"।[৪৬] পরিবেশ দর্শনের ইতিহাসে এ নীতিটি অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি নীতি। বর্তমান গবেষণাটি এ নীতির আলোকে পরিচালিত হয়েছে। যে কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে এ নীতিটির সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা একটি দেশের বর্তমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি সুখী এবং সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক। অর্থাৎ লিওপোল্ডের এ নীতিটির মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের পরোক্ষ দিক নির্দেশনা রয়েছে। যদিও লিওপোল্ডের জীবদ্দশায় 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণাটি তেমন পরিচিতি লাভ করেনি বা টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উপায় হিসেবেও লিওপোল্ড এ নীতিটির প্রবর্তন করেননি তারপরও ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য যে ১৭টি অভীষ্টের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ১৫ নম্বর অভীষ্টের সাথে লিওপোল্ডের উক্ত নীতিটির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিশন (World Commission on Environment and Development-WCED) গঠিত হয় যা ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন নামেও বেশ পরিচিত। নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্রো হার্লেম ব্রুন্ডল্যান্ড এই কমিশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের ক্ষেত্রে 'টেকসইযোগ্যতা' (Sustainability) শব্দটি ব্যবহার করার কৃতিত্ব তাঁর। ১৯৮৭ সালে এ কমিশন ব্রুন্ডল্যান্ড রিপোর্ট (Our common future- বলা হয়) জারি করে, যা টেকসই উন্নয়ন ধারণার সূচনা ও সংজ্ঞা প্রদান করে। এ সংজ্ঞায় বলা হয়, টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে সক্ষমতার সাথে আপোষ না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে; এবং এর সাথে আরও যোগ করা হয় যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো অবশ্যই সকল দেশের টেকসইযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা উচিত-বিশেষ করে উন্নত বা উন্নয়নশীল বাজারভিত্তিক বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।[৪৭] WCED কর্তৃক প্রদত্ত এ সংজ্ঞায় প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্বের কথা উল্লেখ

না থাকার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অনবায়নযোগ্য সম্পদের অবসান হচ্ছিল। অবশ্য এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিলো শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯২ সালে রিও আর্থ সামিট (Rio Earth Summit) অর্থাৎ প্রযুক্তিগতভাবে পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘের সম্মেলনে জীববৈচিত্র্যের কনভেনশন গৃহীত হয় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে টেকসই উন্নয়নের একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪৮] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৫ নম্বর অভীষ্টে বলা হয়েছে, "স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ"।[৪৯] জীববৈচিত্র সংরক্ষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে ধারণাগত অসঙ্গতি বা অসততা আছে বলেই এ বিষয়টিকে টেকসই উন্নয়নের উপাদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপরেও বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিবেশ সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের নীতি-নির্ধারণের লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ দর্শনে নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে টেকসইযোগ্যতার ধারণাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কারণ পরিবেশ দর্শন একটি বৃহৎ বিষয়, যা জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, বিজ্ঞানের দর্শন এবং দর্শনের ইতিহাস, সেইসাথে নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনের মতো স্পষ্টতই আদর্শনিষ্ঠ ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত।[৫০]

সাধারণত ভৌগলিক অবস্থান, বনজ সম্পদের পরিমাণ, ভূমির প্রকৃতি, আবহাওয়া-জলবায়ুর তারতম্য, তাপমাত্রা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাত্রা ইত্যাদির উপর বিভিন্ন দেশের বা এলাকার পরিবেশগত অবস্থা ও সমস্যা নির্ভর করে। যেমন, পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অধিক মাত্রার শিল্পায়ন সেসব দেশের পরিবেশের জন্য বড় রকমের হুমকি। পশ্চিমা শিল্প থেকে বছরে ৪০ কোটি টনের মতো বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসে। সাম্প্রতিককালে সেখানে এসিড বৃষ্টি পর্যন্ত হচ্ছে।[৫১] পরিবেশের এরূপ বিরূপ আচরণের মূলে রয়েছে মনুষ্য সৃষ্ট কর্মকাণ্ড। মানুষের ধ্বংসমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর চরম পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বিশ্বের এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা কমানোর জন্য বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলে হীরার ধূলিকণা ছড়ানোর সুপারিশ করেছেন। বিষয়টি অযৌক্তিক মনে হলেও 'জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স'-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী, বছরে ৫০ লাখ টন হীরার গুড়া বিশ্বের তাপমাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষকদের বিশ্বাস হচ্ছে, যদি ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চালানো যায়, তা হলে এই প্রক্রিয়া পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ২.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত কমাতে পারে।[৫২] বিজ্ঞানীদের এ গবেষণা থেকে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমি হ্রাস, অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ভূমিকা অনেক কম। তারপরও বলা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও চরম পরিবেশগত অবক্ষয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হলোঃ ১। জনসংখ্যার আধিক্য, ২। দারিদ্র্য, ৩। ভৌগলিক অবস্থান ও নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৪। স্বীকৃত অনুপাতের চেয়ে কম বনভূমি, ৫। প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাব, ৬। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন এবং শিল্পায়ন, ৭। নিরক্ষরতা,[৫৩] ৮। ভূমি হ্রাস, ৯। অমানব সত্তার বিলুপ্তিসাধন, ১০। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, ১১। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারের উদাসীনতা, ১২। নৈতিকতার অবক্ষয়।

বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের মূলে উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে অধিকাংশ কারণ নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোল টেবিল বৈঠক ছাড়াও নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও 'নৈতিকতার অবক্ষয়'- এ কারণটি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা আজও দৃশ্যমান নয়। অথচ অন্যান্য দেশসমূহের মতো টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশও প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য এবং নৈতিকতার প্রতি উদাসীনতা থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষই উপলব্ধি করতে পারে না যে প্রকৃতি এবং অমানব সত্তাসমূহের প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যদিও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা প্রাকৃতিক অমানব সত্তা, কোনটাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত? কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অজুহাত দিয়ে প্রতি বছর নির্বিচারে অমানব সত্তাসমূহকে ধ্বংস করা হচ্ছে। উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ও পরিবেশ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণ ব্যতীত কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি লিওপোল্ডের অখণ্ডতার নীতিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে অমানব সত্তাসমূহকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় তাহলে যেমন টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব হবে তেমন টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনেও এ নীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যপঞ্জি

১. মুসতাক আহমদ, *পরিবেশ ও গণমাধ্যম নৈতিক বিশ্লেষণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩।
২. J. R. D. Jardins, *Environmental Ethics : An Introduction to Environmental Philosophy*, Fifth Edition, Wadsworth, USA, 2013, P.6.
৩. *প্রাগুক্ত*, P.6.
৪. রাশিদা আখতার খানম, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৭।
৫. Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.17.
৬. Dale Jamieson, *Ethics and the Environment An Introduction*, Cambridge University Press, New York, 2008, PP. 1-2.
৭. *প্রাগুক্ত*।
৮. Eugene C. Hargrove, *Foundations of Environmental Ethics*, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1989, P. 77.
৯. প্রাগুক্ত, P.78.
১০. Jardins, *প্রাগুক্ত*, PP. 97-98.
১১. *প্রাগুক্ত*, P.97.
১২. "Let us make man in our image and likeness to rule the fish in the sea, the birds in the sky, the Cattle, all the wild animals on earth and all the reptiles in his own image and blessed them and said to them "be fruitfull and multiply, and fill the earth and subdue it; and have dominion over the fish

of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth", *প্রাগুক্ত*, P.100.

১৩. *প্রাগুক্ত*।

১৪. *প্রাগুক্ত*, P.105.

১৫. *প্রাগুক্ত*, P.107.

১৬. *প্রাগুক্ত*।

১৭. *প্রাগুক্ত*।

১৮. *প্রাগুক্ত*, PP.106-107.

১৯. *প্রাগুক্ত*, P.107.

২০. *প্রাগুক্ত*।

২১. *প্রাগুক্ত*, P.17.

২২. *প্রাগুক্ত*, PP.17-18.

২৩. "Everything is Connected to everything else". Dale Jamieson, *প্রাগুক্ত*, P. 2.

২৪. *প্রাগুক্ত*।

২৫. *প্রাগুক্ত*, PP. 2-3.

২৬. Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.108.

২৭. মিনারেল কিং ভ্যালি হলো একটি সাবলপাইন হিমবাহ উপত্যকা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সেকোইয়া ন্যাশনাল পার্কের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। উপত্যকাটি কাউয়াহ নদীর পূর্ব ফর্কের প্রধান জলে অবস্থিত, যা উপত্যকার পূর্ব অংশে উঠে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।

২৮. সিয়েরা ক্লাব হলো একটি আমেরিকান পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা। এটি বিশ্বের প্রথম বড় আকারের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি। জন মুইর (John Muir) ১৮৯২ সালে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার পরিবেশবাদের অন্যতম প্রর্বতক। দেখুন, Dale Jamieson, *প্রাগুক্ত*, P.1.

২৯. Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.108.

৩০. "The history of man's moral development has been a continual extension in the objects of his social instincts and sympathics". দেখুন, Jardins, *প্রাগুক্ত*।

৩১. *প্রাগুক্ত*।

৩২. *প্রাগুক্ত*, P.109.

৩৩. *প্রাগুক্ত*, P.110.

৩৪. John Nolt, *Environmental Ethics For The Long Term An Introduction*, Routledge, London, 2015, P. 194.

৩৫. *প্রাগুক্ত*।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, P.193.

৩৭. *প্রাগুক্ত*।

৩৮. *প্রাগুক্ত*।

৩৯. *প্রাগুক্ত*।

৪০. Communities evolve, because of "the tendency of interdependent individuals or groups to evolve modes of co-operation." *প্রাগুক্ত*, P.195.

৪১. Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.180.

৪২. *প্রাগুক্ত*, P.181.

৪৩. "Land, is not merely soil; It is a fountain of energy flowing through a circuit of soils, plants and animals." Aldo Leopold, "The Land Ethic", in *A Sand County Almanac*-(1946; New York : Ballantine, 1970), P.253. দেখুন, Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.181.

৪৪. Callicott argues this point forcefully in "Animal Liberation : A Triangular Affair", *Environmental Ethics2* (Fall 1980) : 311-38. Callicott tempers his claims a bit in later essays, but he does not abandon the essential point that Leopold's views are incompatible with the animal rights movment. See, J. Baird Callicott, In Defense of the Land Ethic (Albany: State University of New York Press, 1989). Jon Moline makes a similar point in "Aldo Leopold and the moral community", *Environmental Ethics8* (Summer 1986): 99-120. দেখুন, Jardins, *প্রাগুক্ত*, P.181.

৪৫. *প্রাগুক্ত*।

৪৬. "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends othewise." Aldo Leopold, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, New York, 1949. P. 224-225.

৪৭. Sahotra Sarker, *Environmental Philosophy From Theory to Practice*, Wiley-Blackwell, 2012, P. 157.

৪৮. *প্রাগুক্ত*।

৪৯. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ২০২০, ঢাকা, পৃ. ২৮।

৫০. Dale Jamieson, *প্রাগুক্ত*, P.1.

৫১. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *পরিবেশ প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের পরিবেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৬।

৫২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩১ অক্টোবর, ২০২৪।

৫৩. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অমানব সত্তা সম্পর্কিত দার্শনিক পর্যালোচনা

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো নীতিবিদ্যা (সনাতনী পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা)। সনাতনী বা প্রচলিত নীতিবিদ্যার কাজ হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মূল্যায়ন করা। কিন্তু বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত অবনতির কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় রোধে এবং প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে বৈশ্বিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি দিবস ধার্য করা হয় যা, 'ধরিত্রী দিবস' (Earth day) নামে পরিচিত। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল পরিবেশ রক্ষায় সমর্থন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মার্কিন সিনেটর গেলর্ড নেলসন ধরিত্রী দিবসের প্রচলন করেন।[১] পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য 'ধরিত্রী দিবস' পালন ছিল প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ। এর ঠিক দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে জাতিসংঘের উদ্যোগে 'মানব পরিবেশ' সম্মেলন আয়োজন করা হয়। একই সালে আমেরিকার জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দার্শনিকদের উদ্যোগে 'দর্শন ও পরিবেশ-সংকট' বিষয়ক দার্শনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২] এটি- ছিল পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিকদের প্রথম সম্মেলন। কিন্তু এ সম্মেলনের অনেক আগে থেকেই স্বতন্ত্রভাবে দার্শনিকেরা পরিবেশ সংকটের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন। যেমন, আমেরিকার জীববিদ অ্যালডো লিওপোল্ড প্রথম তাঁর "The Land Ethic"[৩] প্রবন্ধে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। সাধারণত পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বাস্তুবিদ্যায় (Ecology) আলোচনা করা হয়। কিন্তু লিওপোল্ড পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য প্রচলিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রচলিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তিনি সনাতনী পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝান। সনাতনী নীতিবিদ্যার স্থলে তিনি 'ভূ-নীতিবিদ্যা' নামে নতুন নীতিবিদ্যার প্রস্তাব করেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা লিওপোল্ডের সময় থেকেই নীতিদার্শনিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিদার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য লিওপোল্ডকে 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা'র জনক বলা হয়।[৪] কিন্তু লিওপোল্ডের সময়েরও প্রায় বিশ বছর পর পরিবেশ সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনাকে 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' নামকরণ করা হয়।[৫]

পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সনাতনী নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ 'প্যারাডাইম শিফট' (paradigm shift)[৬] বলা যায়। কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত দীর্ঘদিনের মতবাদের স্থলে যদি কোনো নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে 'প্যারাডাইম শিফট' বলে। যে কোনো নতুন প্যারাডাইম সবসময় দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দেয় যা পুরাতন প্যারাডাইমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, মিশরের জ্যোর্তিবিজ্ঞানী টলেমি বলেছিলেন, পৃথিবী হলো এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। দীর্ঘদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পোল্যান্ডের গণিতবিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস টলেমীর ভূকেন্দ্রিক প্যারাডাইম পরিবর্তন করে সূর্যকেন্দ্রিক প্যারাডাইম প্রতিষ্ঠা করে বলেন : পৃথিবী নয়, সূর্য হলো এই মহাবিশ্বের

কেন্দ্রবিন্দু। সূর্যকেন্দ্রিক এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোপার্নিকাসকে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের প্রচলিত মতবাদ (ভূকেন্দ্রিক মতবাদ) সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তিনি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সনাতনী নীতিবিদ্যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার নৈতিক মূল্য স্বীকার করে না, এজন্য সনাতনী নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক (Anthropocentric)। পরিবেশ নীতিবিদ্যা সনাতনী নীতিবিদ্যার মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে এর পরিধির সীমাকে বিস্তৃত করে; অমানব প্রাণি ও উদ্ভিদসহ পৃথিবীর যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় সত্তার নৈতিক মূল্য স্বীকার করে এবং নীতিবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ পরিবেশ নীতিবিদ্যা হলো সনাতনী নীতিবিদ্যার 'প্যারাডাইম শিফট'। পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সকল জীবীয় ও অজীবীয় সত্তাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত করা হয় বলে পরিবেশ নীতিবিদ্যা অ-মানবকেন্দ্রিক (Non-anthropocentric)।

লিওপোল্ডের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক সকল দার্শনিক মতবাদকে মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক- এ দুটি অবস্থান থেকে বিবেচনা করা হয়। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল সমস্যাকে এই দুটি বিপরীত অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন, খুলনা বিভাগের প্রত্যন্ত উপকূলীয় উপজেলা কয়রার সর্বশেষ ইউনিয়ন দক্ষিণ বেদকাশীর সিঙ্গেরটেকের চরে (বন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল) পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ করা যাবে কিনা, সুন্দরবনের (১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে সুন্দরবনের পরিবেশ এবং জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে কিনা? এসব প্রশ্ন ও সমস্যা পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এবং এ ধরনের সমস্যাগুলোকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক উভয় অবস্থান থেকেই আলোচনা করা হয়। কারণ এই সমস্যাগুলোর সাথে মানব ও অমানব উভয় সত্তার স্বার্থ সম্পৃক্ত। আবার প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহকে (পাহাড়, নদ-নদী, সমুদ্র, বনভূমি ও অমানব প্রাণি) কি স্বতঃমূল্যবান সত্তা হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে, না কি মানুষের প্রয়োজনে নির্বিচারে ব্যবহার করা হবে? এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং এ পার্থক্যের কারণে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় উল্লেখিত দুটি অবস্থান গড়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে এ দুটি অবস্থানের দার্শনিকবৃন্দ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মতবাদ পরস্পরবিরোধী। যেমন, অমানব সত্তার গুরুত্ব কতটুকু?- এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক উভয় অবস্থান থেকেই আলোচনা করা যাবে এবং এ বিষয়ে উক্ত দুটি মতবাদের দার্শনিকবৃন্দের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী মনোভাবের কারণে বিতর্কেরও সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় অমানব সত্তার গুরুত্বের সাথে টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে; সুতরাং পুরো গবেষণায় এ বিষয়টিকে অ-মানবকেন্দ্রিক ও নৈতিক অবস্থান থেকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সাধারণত যে সকল সত্তার মধ্যে মানুষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত থাকে তাদেরকে অমানব সত্তা বলে। 'অমানব' শব্দটিকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, আবার মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিকশিত হয়েছে এমন বস্তু বা সত্তাকেও অমানব সত্তা বলা যেতে পারে। অ-মানবকেন্দ্রিক অবস্থান থেকে বিভিন্ন প্রজাতির অমানব বা মানবেতর প্রাণি, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষসমূহ, প্রাকৃতিক বস্তু যেমন পাহাড়, সমুদ্র, নদী, বনভূমি এবং প্রান্তর এলাকা (wilderness), এমনকি সমগ্র পৃথিবীকেও অমানব সত্তা

হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ সকল সত্তারও যে নৈতিক অধিকার আছে এবং তাদের প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, একথা অনেক দার্শনিকই স্বীকার করেন না। যেমন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে- এ কথা কিছু দার্শনিক স্বীকার করলেও তাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রয়েছে কারণ তাদের সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি বা বলতে পারি। বিশেষ করে উপযোগবাদী দার্শনিকবৃন্দ[৭] ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের কথাটি স্বীকার করলেও অধিকার প্রদানের বিষয়টি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু যখন আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক অধিকার এবং এদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টি আলোচনা করবো, তখন নৈতিক অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিবেচনা করবো। এই অধ্যায়ে অমানব সত্তা সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবাদ পর্যালোচনা করা হবে।[৮]

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস চারটি যুগকে (প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ও সমকালীন যুগ) কেন্দ্র করে বিস্তৃত। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি যুগের দর্শন, দার্শনিক চিন্তা ও মতবাদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, কারণ প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যা ও বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেই দার্শনিক আলোচনা ব্যাপৃত হয়েছে। প্রাচীন, মধ্য, এমনকি আধুনিক যুগের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তায় পরিবেশ বা বাস্তুকেন্দ্রিক আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনার অনুপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়, কারণ বর্তমানে আমরা যে সকল পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তখনো এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টিই হয়নি। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মানবসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হলেও পরিবেশ বা পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের (বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদ, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, জলাশয়, সমুদ্ররাশিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হয়নি। পরিবেশ ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহ মানুষের উপযোগ সাধন করে বলে এদের সহায়ক মূল্য স্বীকার করা হয়। অধিকাংশ দার্শনিকই স্বীকার করেন না যে, পরিবেশ বা পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। দার্শনিকেরা মনে করেন, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব (বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ায়) এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের সত্তাসমূহ মানুষের ভোগের জন্য অস্তিত্বশীল। এজন্য মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতি ও পরিবেশের সত্তাসমূহকে নির্বিচারে ব্যবহার করার অধিকার রাখে। পরিবেশের প্রতি দার্শনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক মতবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দার্শনিকেরাও উপলব্ধি করেন মানবজাতির অস্তিত্ব, ভবিষ্যৎ বিকাশ ও টিকে থাকা নির্ভর করবে বৈশ্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর। অর্থাৎ পরিবেশ ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে সৃষ্টি হবে বৈশ্বিক পরিবেশ সংকট, ধ্বংস হবে মানব সভ্যতাসহ পুরো বিশ্ব। এজন্য পরিবেশ বা পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে এসব সত্তার নৈতিক বা স্বতঃমূল্য স্বীকার করা উচিত। পরিবেশের প্রতি দার্শনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ বলা হয়। তবে পরিবেশের প্রতি দার্শনিকদের এ মনোভাব গড়ে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছে। অনুমান করা যায়, যে সকল দার্শনিক পরিবেশের সত্তাসমূহের সহায়ক বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করতেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের গোড়াপত্তন করেছেন। এ পর্যায়ে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে সকল

দার্শনিক প্রকৃতি ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের সহায়ক বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হবে।

২.১ প্রাচীন যুগ

পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীন যুগের দার্শনিক আলোচনা ছিল বিশ্বতাত্ত্বিক (Cosmological)। দার্শনিক থেলিস থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত সকল দার্শনিক বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তির মূলে আদিসত্তার অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন। আদিসত্তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে থেলিস ‘পানি', অ্যানাক্সিমেন্ডার ‘অসীম সত্তা', অ্যানাক্সেমেনিস ‘বায়ু', পিথাগোরাস ‘সংখ্যা', হিরাক্লিটাস ‘আগুন', জেনোফেনিস ‘মাটি', এম্পিডক্লিস মাটি, পানি, বায়ু ও আগুন এবং ডেমোক্রিটাস পরমাণুর কথা বলেন। অর্থাৎ প্রাচীন যুগের গ্রিক দার্শনিকবৃন্দ বিশ্বপ্রকৃতির মূলসত্তা হিসেবে প্রাকৃতিক উপাদানের কথা বললেও প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনায় তাঁদের আগ্রহ ছিল না। এর মূলে অবশ্য বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের এ উপাদানগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার আলোচনাকে গ্রিক দার্শনিকেরা জ্ঞানের মর্যাদা দিতে চাননি। কারণ পরমসত্তার মতো বস্তুগত জ্ঞানকেও তাঁরা স্থায়ী, চিরন্তন, এবং অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের এরূপ চিন্তাধারার বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে পরিবেশসংক্রান্ত বা বাস্তুসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগুলো ক্ষণস্থায়ী, বিনষ্টযোগ্য এবং নিয়মিত পরিবর্তনশীল।[৯] সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকদের মধ্যে শুধুমাত্র হিরাক্লিটাস জগতের পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করেন। এজন্য হিরাক্লিটাসের দার্শনিক মতবাদকে বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলা যায়। কারণ বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, এই জগত অস্থায়ী, ধ্বংসযোগ্য ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। হিরাক্লিটাসের পরিবর্তনশীলতার নীতি তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে তেমন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, বরং পারমেনাইডিস যখন হিরাক্লিটাসের মতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সত্তাকে স্থায়ী বলে অভিহিত করেন তখন এই স্থায়ীত্বের মতবাদ সবার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়।[১০] সক্রেটিস- পূর্ব দার্শনিকেরা যেহেতু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও পরিবর্তনশীলতার নীতিকে স্বীকার করতেন না সেহেতু তাদের মধ্যে বাস্তুবিদ্যাকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

গ্রিক দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন, জগতের একটি যৌক্তিক (rational) কাঠামো রয়েছে। ‘জগতের যৌক্তিক কাঠামো' বলতে তাঁরা এমন এক জাগতিক কাঠামোকে নির্দেশ করেন যাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য দিয়ে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তি (rationality) দিয়ে জানা যায়। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কারণে গ্রিক দার্শনিকেরা যেভাবে বুদ্ধির মাধ্যমে অন্যান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন সেভাবে বিশ্বপ্রকৃতির আদি নীতিগুলোকেও বুদ্ধির মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন; কারণ তাঁরা মনে করতেন, দার্শনিক যুক্তির ফলাফলগুলি বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশগত সম্পর্ক এবং প্রক্রিয়াগুলির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রিক দার্শনিকেরা মাটি, বায়ু, আগুন, পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান এবং এগুলোর আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ের কথা তাদের দার্শনিক আলোচনায় উল্লেখ করেন বলে মনে হতে পারে যে, তাঁরা হয়তো পরিবেশগত নীতি ও সম্পর্ক আবিষ্কার করে একটি প্রাথমিক পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ধরনের কোনো নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেননি। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যে সন্দেহপ্রবণতা, জগতের যৌক্তিক কাঠামোতে বিশ্বাস এবং বুদ্ধিবৃত্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা গ্রিক দার্শনিকদেরকে জগতের বাস্তুতান্ত্রিক সচেতনতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বা নিরুৎসাহিত করেছে বলে মনে হয়।

গ্রিক দার্শনিক এম্পিডক্লিস (খ্রি. পূ. ৪৯০-৪৩৫) তাঁর বিশ্বতাত্ত্বিক মতবাদে জগতের সত্তার মূলে আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু- এই চারটি উপাদানের কথা বলেন। এজন্য মনে হতে পারে এম্পিডক্লিসের বিশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তুবিদ্যাকেন্দ্রিক। এম্পিডক্লিস বলেন, এ উপাদান চতুষ্টয় বিভিন্ন অনুপাতে সমন্বিত হয়ে পরিবর্তনশীল জটিল সব পদার্থ উৎপাদন করলেও এ উপাদানগুলো নিজে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল।[১১] আসলে এম্পিডক্লিস ও অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকবৃন্দ এ উপাদানগুলোকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে জগতের মূল সত্তা বা উপাদান হিসেবে দেখেছেন, ফলে প্রাকৃতিক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন দার্শনিকবৃন্দ এ উপাদানগুলোর বাস্তুবিদ্যাগত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

পিথাগোরাস (খ্রি. পূ. ৫৭২-৪৯৯) হলেন প্রাচীন যুগের অন্যতম প্রভাবশালী গ্রিক দার্শনিক। সংখ্যাতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে পিথাগোরাস সংখ্যাতত্ত্বের জনক হিসেবে বহুল পরিচিত। পিথাগোরাসের দার্শনিক আলোচনায় অমানব প্রাণির প্রতি সম্মানসূচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। কারণ তিনি ছিলেন শাকাশী। তাঁর প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা সবজি ও বীজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি তিনি তাঁর খাদ্যতালিকা থেকে অনেক উদ্ভিদকেও বাদ দেন। যেমন, তিনি শিম খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। পিথাগোরিয়ান দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুসারীদেরকেও পিথাগোরাস অমানব প্রাণির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শাকাশী হতে অনুপ্রাণিত করেন।[১২] যেহেতু তৎকালীন সময়ের দার্শনিকদের মধ্যে বাস্তুবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি, এজন্য মনে হয় না পিথাগোরাস অমানব সত্তাকে স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে ছিলেন। মানুষের কল্যাণেই পিথাগোরাস অমানব সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেন। কারণ পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন, "মৃত মানুষের আত্মা অমানব প্রাণিতে অভিবাসিত বা স্থানান্তরিত হয়"।[১৩]

যেহেতু পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অমানব সত্তাতে স্থানান্তরিত হয়, সেহেতু অমানব সত্তাকে অসম্মান করার অর্থ হলো মানুষের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা। সুতরাং আমিষ জাতীয় খাবার পরিহার এবং শিমের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার নিষিদ্ধের মূলে কোনো বাস্তুবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। বরং এ বিষয়টিকে পিথাগোরিয়ান দার্শনিক সম্প্রদায়ের এক প্রকার ট্যাবু হিসেবে অভিহিত করা যায়। এজন্যই হয়তো অমানব সত্তার প্রতি পিথাগোরাসের সম্মানসূচক এ দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন দার্শনিকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। অর্থাৎ অমানব সত্তার প্রতি পিথাগোরাসের সম্মান প্রদর্শনের মূল কারণ হলো মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। কারণ তাঁর মতে, অমানব সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ প্রকারান্তরে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।[১৪]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল বিশ্বতত্ত্ব। জগতের আদি সত্তা অনুসন্ধানের মধ্যেই তাদের দার্শনিক আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ প্রথম পর্বের গ্রিক দার্শনিকেরা জগতের স্বরূপ ও মৌল সত্তা আবিষ্কারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে গ্রিক দার্শনিকেরা বাহ্য প্রকৃতিকে জানার চেয়ে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন মানুষকে জানার ব্যাপারে, বিশেষ করে মানুষের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে। এ প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই গ্রিক সমাজে আবির্ভাব ঘটলো সোফিস্ট নামে পরিচিত এক শিক্ষক সম্প্রদায়ের।[১৫] সোফিস্টদের সময় থেকেই প্রথমবারের মতো দার্শনিক আলোচনার আগ্রহের ক্ষেত্র বিশ্বতত্ত্ব থেকে মানুষে

স্থানান্তরিত হয়।[১৬] সোফিস্টরাই প্রথম দার্শনিক যারা মানুষ, সভ্যতা, রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সফোক্লিস বলেন, "মানুষ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা"[১৭], প্রোটাগোরাসের বিখ্যাত উক্তি, "মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি..."[১৮] প্রভৃতি চিন্তা-ভাবনা মানুষকে তৎকালীন দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। প্রোটাগোরাসের এই উক্তি জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ এবং নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদকে সমর্থন করে। অভিজ্ঞতাবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ ব্যক্তি-মানুষকে প্রাধান্যপ্রদায়ী মতবাদ। সুতরাং বস্তুতপক্ষে প্রোটাগোরাসের সময় থেকেই মানুষের উপর, আরও বিশেষভাবে বললে, ব্যক্তি-মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।[১৯]

জগতের মূলতত্ত্ব বা পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকবৃন্দ আধিবিদ্যক ও বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে যে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সেটাই বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি সক্রেটিসের অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, এ প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর এবং এ সমস্যার কোনো চূড়ান্ত সমাধান নেই। সুতরাং এ নিয়ে বৃথা আলোচনা না করে মানুষের জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয় নিয়েই আলোচনা করা দরকার। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী? সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের করণীয় কী?- এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাই চিন্তাশীল মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। আর এটাই ছিল সক্রেটিসের দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয়।[২০]

প্রোটাগোরাসের মতো সক্রেটিসও ব্যক্তি-মানুষের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ জগতে মানুষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[২১] তিনি মানুষের দেহকে জড়বস্তুর যৌগ ও মানুষের বুদ্ধিকে সার্বিক মন (Universal mind) বা সার্বিক বুদ্ধির অংশ বলে গণ্য করেন। আমাদের যে ইন্দ্রিয় যে নির্দিষ্ট অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে, সে অনুভূতিকে ব্যবহার করার যোগ্যতা হিসেবেই আমাদেরকে অনুরূপ ইন্দ্রিয় দেয়া হয়েছে। মানুষের দেখার জন্যই ঈশ্বর আলো দিয়েছেন, মানুষের আহারের জন্যই তিনি পৃথিবীকে খাদ্যের উপহারে সজ্জিত করেছেন। সূর্যকে এত নিকটবর্তী করে দেয়া হয়নি যাতে পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যায়, অথবা মানুষ দুঃসহ তাপে পীড়িত হয়। আবার সূর্যকে এত দূরবর্তী করেও দেয়া হয়নি যাতে পৃথিবী অধিকতর শীতল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সক্রেটিসের মতে, মানুষের সুবিধার জন্যই সব পরিকল্পনা।[২২] সক্রেটিসের এই ধারণাকে মানবকেন্দ্রিক বলা যায়।

দর্শনের ইতিহাসে সক্রেটিস উদ্দেশ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যের রাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতি বা জগত সংসারের কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখেই বিশ্বজগত গতিশীল। বিশ্বজগতের চালক হিসেবে সক্রেটিস একজন বুদ্ধিমান সত্তার উদ্দেশ্যসাধনের সংকেত খুঁজে পান। জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনেও রয়েছে বুদ্ধিমান সত্তার পরিকল্পনা। প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যবাদী ব্যাখ্যা থেকেও সক্রেটিসের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্যবাদের আলামত সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যবাদ থাকলেও তা সুস্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত। প্রকৃতির রাজ্যকে উদ্দেশ্যমূলক বলার অর্থ হলো মানবসত্তাকে প্রকৃতির উপর আরোপ করা বা মানুষের মানদণ্ডে প্রকৃতিকে বিচার করা।[২৩] অর্থাৎ পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মধ্যে সক্রেটিস শুধুমাত্র মানবসত্তার গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং উদ্দেশ্যবাদে বিশ্বাস করেন। স্বাভাবিকভাবেই সক্রেটিসের মতানুসারে বলা যায় যে, মানুষ

হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের নিয়ন্ত্রক এবং অমানব সত্তাসমূহ মানুষের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে অস্তিত্বশীল।

দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো (খ্রি.পূ. ৪২৭-৩৪৭) এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। হিরাক্লিটাসের পরিবর্তনশীল দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে দার্শনিক প্লেটো তরুণ বয়সেই পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সত্তাবাদী দার্শনিক পারমেনাইডিসের প্রভাবও প্লেটোর দর্শনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, পরমসত্তা স্থির, চিরন্তন ও দেশ-কালের উর্ধ্বে বলে প্লেটো যে মত দেন তা প্রকৃতপক্ষে পারমেনাইডিসের দার্শনিক মতেরই প্রতিধ্বনি।[২৪] যেহেতু প্লেটো জগতের পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাস করতেন না, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া হয় তাঁর দার্শনিক চিন্তা বাস্তববিদ্যাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত। কিন্তু দার্শনিক প্লেটো তাঁর *তাইমিয়াস* নামক গ্রন্থে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাদান এবং এদের যৌক্তিক অনুপাতে মিশ্রণ ও দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্লেটোকে প্রথাগত গ্রিক ধারণাকেই সমর্থন করতে দেখা যায়। দার্শনিক এম্পিডক্লিসের মতো প্লেটোও মনে করেন, বিশ্ব চারটি উপাদান, তথা আগুন, মাটি, বায়ু ও পানির সমন্বয়ে সৃষ্ট। এসব উপাদান ছাড়াও সৃষ্টিকর্তা যুক্তিবোধ দিয়ে এই পৃথিবীকে একটি সম্পূর্ণ সমগ্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[২৫] এই গ্রন্থে প্লেটো মানবসত্তা ছাড়াও গাছপালা, নিম্ন পর্যায়ের অমানব প্রাণি প্রভৃতি অমানব সত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। গাছপালার সৃষ্টি প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন,

> ... দেবতাগণ মানুষের প্রকৃতির সমরূপী আরেকটি প্রকৃতি সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলেন; কিন্তু তা করলেন অন্য আদলে এবং অন্য ইন্দ্রিয়, অন্য এক ধরনের জীবন্ত জিনিস-উদ্ভিদ, গাছগাছড়া এবং বীজ যুক্ত করে। চাষাবাস এবং গৃহের পরিচর্যার মাধ্যমে এগুলোর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হল, কিন্তু প্রথমে শুধু তাদের বন্য আদিরূপ ছিল,...। যে-জিনিসেরই জীবন আছে তারই জীবন্ত প্রাণি হিসেবে অভিহিত হওয়ার অধিকার আছে; এখন আমরা যে-দলটির কথা বলছি তার আত্মা তৃতীয় এক ধরনের; বলা হয়ে থাকে যে, এর অবস্থান হল মধ্যঝিল্লি এবং নাভির মাঝামাঝি স্থানে, এর কোনও বিশ্বাস বা যুক্তিবোধ বা অনুধাবনশক্তি নেই, কিন্তু ক্ষুধাসহ সুখ ও বেদনার অনুভূতি আছে। এটি সবসময়ই পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়; বাহির থেকে আগত গতিকে বাধা দিয়ে এবং নিজের গতি ব্যবহার করে এটি কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়; এমন গঠনের কারণে প্রত্যক্ষ করার এবং নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাববার কোনও সহজাত ক্ষমতা নেই এর। এটি বেঁচে থাকে এবং অন্য জীবন্ত প্রাণি থেকে এটি ভিন্ন নয়; কিন্তু এটি স্থির এবং একই স্থানে শেকরগাড়া-এর নিজের কোনও চলাচল করার ক্ষমতা নেই।[২৬]

প্লেটো মনে করতেন মানুষের মতো গাছপালারও আত্মা আছে, কিন্তু এ আত্মা তৃতীয় ধরনের। এছাড়াও গাছপালার সুখ-দুঃখ ও ক্ষুধার অনুভূতি থাকলেও বিশ্বাস, যুক্তিবোধ বা অনুধাবনশক্তি না থাকার কারণে এরা সবসময় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। গঠনগত কারণে এদের প্রত্যক্ষ করার বা অভিজ্ঞতা অর্জন করারও কোনো সহজাত ক্ষমতা থাকে না। অন্যান্য জীবন্ত প্রাণির মতো বেঁচে থাকলেও এরা নিশ্চল, কারণ এদের কোনো চলাচলা ক্ষমতা নেই।

নিম্ন পর্যায়ের প্রাণি বা অন্যান্য অমানব প্রাণি যেভাবে সত্তাবান হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি দার্শনিক প্লেটো, তারপরও স্বল্প কথায় *তাইমিয়াসের* সংলাপে অমানব প্রাণির সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। প্লেটো মনে করেন, মানুষের রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

পক্ষীপ্রজাতি ও অন্যান্য বন্য প্রাণির সৃষ্টি হয়েছে। অমানব বন্য প্রাণি এসেছে সেইসব মানুষ থেকে যারা তাদের জীবনে কখনো দর্শনের কোনোও প্রয়োগ ঘটায়নি এবং কোনোভাবেই উর্ধ্বলোকের প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। প্লেটোর বিশ্বাস ছিল, এই ধরনের মানুষগুলো তাদের মাথার গতিপথকে অনুসরণ না করে বুকের যে অংশে আত্মা বাস করে তাকে অনুসরণ করেছে। এ ধরনের অনুশীলনের ফলে তাদের সামনের অঙ্গসমূহ এবং মাথা পৃথিবীর স্বাভাবিক টানে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং পেছনের অঙ্গাদি তাতে সমর্থন জুগিয়েছে; আর এ সবকিছুর সাথে মিল রেখে তাদের মাথার খুলি বিভিন্ন আকারে লম্বা হয়ে গেছে। যারা অধিক নির্বোধ তাদেরকে দেবতা অধিক সংখ্যক ভর দেওয়ার অঙ্গ দিয়েছে, আর সেজন্যই কারও চার পা আবার কারও তার চাইতেও বেশি। ভূমিতে চারণকারী সবচেয়ে নির্বোধ প্রাণি তারা, যাদের পুরো দেহ মাটিতে পড়ে থাকে, যেহেতু পায়ের কোনোও দরকার নেই তাই দেবতা তাদেরকে সৃষ্টি করেছে পদহীন করে যাতে তারা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারে; যেমন, সাপ। কিন্তু সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিহীন এবং অজ্ঞ চতুর্থ শ্রেণীর প্রাণির জন্ম হয়েছে পানিতে। তাদের আত্মা ডুবে ছিল সব ধরনের ভুলভ্রান্তিতে; তাই তাদের সৃষ্টিকর্তারা ভেবেছেন যে, খাঁটি বায়ু নিশ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত নয়; তাদেরকে পানিতে নিশ্বাস নেয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করেছে এবং শাস্তি হিসেবে তাদেরকে সেইসব কাদাপানিতে নিক্ষেপ করেছে। এই হলো মাছ, শামুক এবং যেসব প্রাণি পানিতে বাস করে তাদের জন্মবৃত্তান্ত; তাদের গভীরে বাস করার কারণ হলো তাদের নির্বুদ্ধিতা। প্লেটোর মতে, উল্লেখিত নীতি অনুসরণেই জীবন্ত প্রাণি রূপান্তরিত হয়েছে এবং সর্বদা পরস্পরে রূপান্তরিত হয়েছে- রূপান্তর সর্বদা অনুধাবনশক্তি খোয়ানো বা অর্জনের ওপর নির্ভরশীল।[২৭]

তাইমিয়াস গ্রন্থে প্লেটো যেভাবে অমানব প্রাণির সৃষ্টি প্রক্রিয়া আলোচনা করেন তা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্লেটো মনে করতেন বুদ্ধিহীন এবং দার্শনিক চিন্তাবিহীন মানুষগুলোর রূপান্তরের মাধ্যমেই অমানব প্রাণির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে প্লেটো প্রাণিচরিত্রকে স্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল বলে মনে করতেন না। কোনো মানুষ যদি সদ্‌গুণের জীবনযাপন করে তাহলে তার পক্ষে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়াও সম্ভব।

প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ *রিপাবলিক* যেমন সংলাপ আকারে রচিত, তেমন *তাইমিয়াস* ও *ক্রিতিয়াস* গ্রন্থ দুটিও সংলাপনির্ভর। *তাইমিয়াসে* প্লেটো মহাবিশ্ব, মানব সত্তা ও অমানব সত্তার সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে *ক্রিতিয়াসে* প্রাচীন নগরী আতলান্তিস নিয়ে আলোচনা করেন এবং এটি একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ। *ক্রিতিয়াসকে তাইমিয়াসের* উত্তরাংশ অথবা যৌথ সংলাপের একটি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।[২৮] কারণ *তাইমিয়াসের* সংলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গকেই *ক্রিতিয়াসের* সংলাপে অংশ নিতে দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন আতলান্তিস নগরীটি প্লেটোর আবিষ্কৃত একটি কাল্পনিক নগরী। প্লেটো আতলান্তিস নগরীকে একটি আদর্শ নগরী হিসেবে অভিহিত করেন।[২৯]

ক্রিতিয়াস গ্রন্থে আতলান্তিস দ্বীপের বর্ণনায় প্লেটো বলেন, দেবতারা পুরো পৃথিবীকে তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলো; নিজের এলাকা হিসেবে দেবতা পসাইদন পেয়েছিলেন আতলান্তিস-এর দ্বীপ এবং তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ দ্বীপটি ছিল সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গার একটি সমতল ভূমি- বলা হয়ে থাকে সৌন্দর্যের দিক থেকে তা ছিল অনন্য, অত্যন্ত ভালো জায়গা এবং উর্বরও বটে। আতলান্তিস দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লেটো বলেন, দ্বীপটি নিজেই এর নগরী এবং

বাকি সব এলাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই সরবরাহ করত। দ্বীপের অনেক অংশের মাটি খনন করে অরিখালক নামক এক পাহাড়ি পদার্থ সংগ্রহ করা হত, যা ছিল স্বর্ণের চেয়ে কিছুটা কম মূল্যবান। দ্বীপটিতে যে পরিমাণ বনভূমি ছিল; সেখান থেকে কাঠমিস্ত্রীরা যেমন তাদের কাজের জন্য সব ধরনের কাঠ সরবরাহ করতে পারত তেমন বন্য ও গৃহপালিত পশুদের জন্য তাতে জন্মানো পশুখাদ্যও যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা যেত। আতলান্তিস দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের অমানব প্রাণির (সবচেয়ে বড় দেহধারী, অতিভোজী) চারণক্ষেত্র বা আবাসভূমি হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলাশয়, হ্রদ, নদ-নদী কিংবা পাহাড় বা সমভূমি ছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণ চারণভূমি বা চারণক্ষেত্র থাকায় দ্বীপের অমানব প্রাণিসমূহ নির্বিঘ্নে চড়ে বেড়াতো। ফুল, ফল, চাষ করা শষ্য এবং ফলদ বৃক্ষের প্রাচুর্য ছিল দ্বীপটিতে।[৩০] সবকিছু মিলিয়ে দ্বীপটি ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল, আভিজাত্যের প্রতীক, সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং পবিত্র একটি দ্বীপ নগরী। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় কিছুসংখ্যক রাজার কর্মকাণ্ড সমভূমির সহজাত প্রকৃতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে।[৩১] যতদিন তাদের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল ততদিন তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, ঐশ্বরিক সত্তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করত, সম্পদ ও সমৃদ্ধির চেয়ে চরিত্রগুণকে অধিক গুরুত্ব দিত এবং যেকোনো পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করত প্রজ্ঞা ও ধৈর্য দিয়ে। তারা সদ্‌গুণ ছাড়া অন্য সবকিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করত।

আতলান্তিস দ্বীপের নাগরিকের মধ্যে উল্লেখিত নীতি এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতি যতদিন অবিকল বেঁচে ছিল ততদিন সমৃদ্ধিও অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির নশ্বর অংশের সাথে অহরহ মেলামেশার মাধ্যমে প্রকৃতির ঐশ্বরিক অংশ দুর্বল হয়ে পড়ল; নাগরিকদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন তারা সংযমের সাথে সমৃদ্ধি আনয়নে অক্ষম হয়ে পড়ল।[৩২] 'সংযম' নামক মূল্যবান সম্পদকে তারা ধ্বংস করেছিলো। সুখ আনয়নে তারা বিচারবুদ্ধির পরিবর্তে অপ্রতিরোধ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতালাভের উপর গুরুত্ব দিতে থাকে। কিন্তু দেবতাদের দেবতা জিউস যিনি আইনের শাসন পরিচালনা করেন তিনি যখন এই প্রশংসাযোগ্য গোষ্ঠীটির দুর্দশা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৩৩] প্লেটো *ক্রিতিয়াসে* বলেন, আতলান্তিস দ্বীপটি নয় হাজার বছর আগে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল।

তাইমিয়াস ও *ক্রিতিয়াস* শীর্ষক সংলাপে দার্শনিক প্লেটো যেভাবে মানবসত্তা, অমানব সত্তার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আতলান্তিস দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের বর্ণনা করেন তার কোনো পরিবেশগত বা বাস্তুবিদ্যাগত ভিত্তি ছিল না। কারণ তখনো বাস্তুকেন্দ্রিক সমস্যার সৃষ্টিই হয়নি (বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে)। তারপরও একটি আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠায় মানবসত্তার পাশাপাশি অমানবসত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুশৃঙ্খল অবস্থান যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্লেটো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য বলা যায়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আতলান্তিস দ্বীপের বর্ণনায় বাস্তুবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে অবিস্মরণীয় এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অনুকরণীয়। সুতরাং প্লেটোর মতানুসারে বলা যায় যে, যদি ঐশ্বরিক সত্তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়, ঐশ্বরিক প্রকৃতি অব্যাহত রাখা যায়, প্রচলিত আইনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং সম্পদ ও সমৃদ্ধির চেয়ে

চরিত্রগুণকে প্রাধান্য দিয়ে যে কোনো সমস্যাকে ধৈর্য ও প্রজ্ঞা দিয়ে মোকাবেলা করা হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয়কেও রোধ করা সম্ভব।

প্রভাবশালী প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে অ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৫-৩২২) ছিলেন একমাত্র দার্শনিক যিনি বাস্তুকেন্দ্রিক শৃঙ্খলাবোধ থেকে প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, যদিও অধিবিদ্যার প্রতি তিনি কখনোই তাঁর আসক্তি ত্যাগ করতে পারেননি। *De partibus Animalium*- এ অ্যারিস্টটল দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দেন যে, প্রাক-সক্রেটিক পদ্ধতিতে যেভাবে পরম উপাদানের (Ultimate Substance) প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হতো সেভাবে প্রাকৃতিক বস্তু, উদ্ভিদ এবং প্রাণি সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।[৩৪] তৎকালীন গতানুগতিক (বিশ্বতাত্ত্বিক ও আধিবিদ্যক) দার্শনিক চর্চার প্রেক্ষাপটে অ্যারিস্টটলের এরূপ চিন্তাভাবনা পরবর্তীতে পরিবেশ দর্শনের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়।

অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকের মতো পরিবেশের প্রতি অ্যারিস্টটলের মনোভাব নিঃসন্দেহে তাঁর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত ছিল। সম্ভবত প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যবাদ ও প্রকৃতির চূড়ান্ত কারণে বিশ্বাস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি মনে করতেন, কোনো নির্দিষ্ট ধরনের বস্তু বিশেষ করে জীবিত প্রাণিসত্তা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নকশার অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অস্তিত্বশীল হয়। যেমন, ওক গাছের বীজের অস্তিত্বশীলতার উদ্দেশ্য অথবা চূড়ান্ত কারণ হলো ওক গাছ। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উচ্চস্তরের জীবসত্তার (মানুষ) সুবিধার জন্যই নিম্নস্তরের জীবসত্তা অস্তিত্বশীল হয় এবং মানুষের অবস্থান শীর্ষে রেখে মানুষের অধীনস্ত হিসেবে নিম্নস্তরের জীবসত্তার ক্রমবিন্যাস করা যেতে পারে।[৩৫]

অ্যারিস্টটল বলেন, প্রকৃতির সর্বত্রই প্রাণের নির্দশন ছড়িয়ে আছে, আর একই সঙ্গে আছে আত্মাও। বিভিন্ন প্রকার প্রাণের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন স্তরের আত্মা[৩৬]- এভাবে তিনি আত্মার শ্রেণীবিভাগ করেন। শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে আত্মার ক্রমবিন্যাস করেন বলে অমানব সত্তার প্রতি অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁর মতে, সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মা ক্রমবদ্ধ অবস্থায় আছে। সবচেয়ে অনুন্নত আত্মাকে বলা হয় উদ্ভিদাত্মা। আত্মপুষ্টিসাধন এবং বংশবৃদ্ধি এর কাজ। দ্বিতীয় স্তরের আত্মা হলো জীবাত্মা। জীবাত্মা ইন্দ্রিয়-সংবেদী। মানুষের আত্মা প্রাণির আত্মার চেয়ে উন্নততর বা সর্বোচ্চ স্তরের আত্মা। অ্যারিস্টটল এ আত্মার নাম দিয়েছেন বৌদ্ধিক (rational) আত্মা। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নামক বৃত্তির কারণে মানুষ তার কর্তব্য নিরূপণ করতে পারে। এই বিশেষত্ব আছে বলেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত।[৩৭] অ্যারিস্টটলের মতে, মানবাত্মায় জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মায় উদ্ভিদ-আত্মার গুণ রয়েছে। কিন্তু বিপরীতভাবে নয়। অর্থাৎ নিম্নতর আত্মায় উচ্চতর আত্মার গুণ নেই।[৩৮] অ্যারিস্টটল মনে করেন, প্রকৃতিতে আবশ্যিকভাবেই এমন একটি স্তরবিন্যাস রয়েছে যেখানে যারা কম যুক্তিবিচার-ক্ষমতার অধিকারী তারা অধিকতর যুক্তিবিচার-ক্ষমতার অধিকারীদের জন্য অস্তিত্বশীল হয়।[৩৯] সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতানুসারে, প্রাকৃতিকভাবেই উদ্ভিদশ্রেণী ও প্রাণিকুল মানুষের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনের জন্য সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ এ সকল অমানব সত্তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার রাখে।

অ্যারিস্টটল তাঁর *পলিটিকস* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের 'সম্পদ সংগ্রহের উপায়' নামক অষ্টম অধ্যায়ে মানুষসহ প্রকৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাণি ও উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জীবন-প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা

করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতি সকল প্রাণিকেই স্বনির্ভরভাবে জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছে। যেমন, মানুষ ছাড়াও প্রকৃতিতে এমন অনেক প্রাণি রয়েছে যারা সন্তান জন্মদানের সময়ই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে সন্তান বড় হয়ে নিজের খাদ্য সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মাতৃদুগ্ধ এরূপ খাদ্য। আবার সন্তান বড় হলেও তার খাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যারিস্টটলের এরূপ মনোভাবের মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধের আভাস পাওয়া গেলেও অচিরেই তা উদ্দেশ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। কারণ তিনি বলেন, "তৃণের অস্তিত্ব যেমন পশুর জন্য, পশুর অস্তিত্ব তেমন মানুষের জন্য।" যদি এ কথা ঠিক হয় যে "প্রকৃতির কোনো সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়, কারণশূন্য নয়, তাহলে আমরা একথা বলতে পারি, প্রকৃতি যা কিছু তৈরি করেছে তা সে নির্দিষ্টরূপে মানুষের জন্যই করেছে।" "যুদ্ধ এবং শিকার জীবনের সম্পদ সংগ্রহেরই প্রকৃতি নির্ধারিত একটি উপায়"।[৪০] অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতে, প্রকৃতির সকল সৃষ্টির মূলে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কারণ রয়েছে এবং তা হলো মানুষ। বিভিন্ন ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদ জন্মের পর নিজেদের জন্য অস্তিত্বশীল থাকলেও পরবর্তীতে এরা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে থাকে।

সুতরাং দেখা যায়, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ সুরক্ষায় অ্যারিস্টটলের তেমন কোনো আগ্রহ বা পরিকল্পনা ছিল না। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য অ্যারিস্টটল প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্যের পরিবর্তে উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করেন। তৎকালীন দার্শনিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম বাস্তুকেন্দ্রিক শৃঙ্খলাবোধের কথা উল্লেখ করলেও তাঁর আলোচনায় বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ উদ্দেশ্যবাদ ও বাস্তুকেন্দ্রিক মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, বাস্তুবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার জন্য অ্যারিস্টটলকে অন্তত উদ্দেশ্যবাদী ধারণা পরিত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল।[৪১]

অ্যারিস্টটলের ছাত্র থিওফাস্টাস বাস্তুকেন্দ্রিক সম্পর্কের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেন এবং বাস্তবে এর বিকাশ ঘটান। 'প্রাণি, উদ্ভিদ এবং পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের জন্য অস্তিত্বশীল'- অ্যারিস্টটলের এই মতবাদকে তিনি বর্জন করেন। তিনি দাবি করেন যে, মানুষের প্রয়োজন ও স্বার্থপূরণ ছাড়াও এ সকল সত্তার নিজস্ব স্বাধীন উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যার সুনির্দিষ্ট আবিষ্কার থেকে তিনি এর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, অনেক উদ্ভিদ তাদের নির্দিষ্ট আবাসস্থলের উপর নির্ভরশীল। থিওফাস্টাস মনে করতেন, এই পর্যবেক্ষণটি পাশ্চাত্যে পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে পারত।[৪২] বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে থিওফাস্টাসের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হলেও পাশ্চাত্য দর্শন ও দার্শনিকদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতে না পারার কারণে তাঁর দর্শনের পরিবেশগত দিকগুলো অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়।[৪৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রাচীন যুগে পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি না হওয়ায় দর্শন ও দার্শনিক চিন্তাধারায় পরিবেশগত ও বাস্তুকেন্দ্রিক আলোচনার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকবৃন্দ দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জগতের আদি বা মূল উপাদানের অনুসন্ধান করতে যেয়ে যদিও প্রায়শই তাঁরা আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের কথা বলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় বা সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও করেন, তবে পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা এ সকল উপাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ

হয়েছেন। অন্যদিকে সক্রেটিসের সময় থেকে দর্শনে উদ্দেশ্যবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহকে মানুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে অস্তিত্বশীল বলে মনে করেন। যদিও প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তায় বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যেই বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সোফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিকবৃন্দ থেকে শুরু করে সক্রেটিস-পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে বাস্তুকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে মানবকেন্দ্রিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক পরিবেশ দার্শনিক ইউজিন সি. হারগ্রভের মন্তব্যকে যথার্থ মনে হয়। তিনি বলেন: এটি একটি সরল সত্য যে, তিন হাজার বছর পূর্বে যখন পাশ্চাত্যের মানুষ দার্শনিক চিন্তা শুরু করে তখন থেকেই তা পরিবেশগত চিন্তার সঙ্গে হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়তো অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। গ্রিক দার্শনিকগণ প্রকৃতিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা বাস্তুবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে, প্রাকৃতিক জগতের নন্দনতাত্ত্বিক প্রশংসাকে নিরুৎসাহিত করেছে, এবং জগৎ সম্পর্কে এমন ধারণা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে যাতে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা নীতিগতভাবে অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।[৪৪]

২.২ মধ্যযুগ

খ্রিষ্টীয় নবম শতক থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত যুগকে স্কলাস্টিক বা মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা ছিল প্রাচীন যুগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীন যুগের দার্শনিক আলোচনায় সক্রেটিস-পূর্ববর্তী সময়ে জগতের আদিসত্তার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা অর্থাৎ বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনা এবং সক্রেটিস ও সক্রেটিস-পরবর্তী সময়ে উদ্দেশ্যবাদ, জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা প্রাধান্য বিস্তার করলেও মধ্যযুগের দর্শন ছিল সম্পূর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক। জগৎ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনাও ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্ব, নৈতিক মর্যাদা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব ও চার্চের আধিপত্যের কারণে বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনা এ যুগে উপেক্ষিত ছিল।

সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৫) ছিলেন মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট দার্শনিক। মধ্যযুগের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধুমাত্র টমাস একুইনাস প্রকৃতির অমানব সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু অমানব সত্তা সম্পর্কিত তাঁর এ আলোচনা মানবকেন্দ্রিক। প্রাচীন যুগের দার্শনিক অ্যারিস্টটল যেভাবে ঈশ্বরের পরেই মানুষের অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন একুইনাস সেটাকে সমর্থন করেন। এজন্যই প্রাণিজগৎ সম্পর্কিত একুইনাসের চিন্তায় অ্যারিস্টটলের উদ্দেশ্যবাদী চিন্তার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একুইনাসের মতে, যেহেতু কেবল মানুষই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণি সেহেতু মানুষ তার নিজের কাজের উপর প্রভুত্ব করতে পারে। সে নিজের জন্যই নিজের কাজের তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু অমানব প্রাণি ও উদ্ভিদের নিজের কাজের উপর নিজের কর্তৃত্ব নেই। তাই প্রাণি ও উদ্ভিদ হলো যন্ত্রসম। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণিসমূহের নিজেদের জন্যই ঈশ্বর তাদের তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাণি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণিকে উদ্দেশ্য করে পরিচালিত হয়।[৪৫] অর্থাৎ একুইনাস অনুসারে, ঈশ্বরের কৃপা বা ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নামক গুণটি থাকা আবশ্যক। কিন্তু

জগতের সকল সত্তার (মানব ও অমানব) মধ্যে শুধুমাত্র মানবসত্তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ায় ঈশ্বর তাদের উদ্দেশ্য পূরণে অন্যান্য সকল সত্তাকে (অমানব) পরিচালিত করেন, কারণ এই জগতের ধারক, বাহক এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর।

একুইনাস পশুহত্যায় কোনো অন্যায় দেখেন না। বাকশক্তিহীন প্রাণিহত্যা পাপ, এই বিশ্বাসকে তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে মনে করেন। কারণ, প্রকৃতির রাজ্যে ঈশ্বরই এদেরকে মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। একুইনাস তাঁর সমর্থনে বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেন। এতে বলা হয়েছেঃ প্রত্যেক গমনশীল প্রাণি তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিৎ ঔষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। সুতরাং ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারেই উদ্ভিদের জীবন প্রাণির জন্য এবং প্রাণির জীবন মানুষের জন্য ধ্বংস করা যাবে।[৪৬]

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হওয়ার কারণে একুইনাস মানুষকে 'অধিকতর পূর্ণাঙ্গ' সত্তা হিসেবে অভিহিত করেন, আর এদিক থেকেই মানুষের পশু হত্যা করার অধিকার রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে একুইনাস মনুষ্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং এই অজুহাতে নির্বিচারে পশু হত্যাকে বৈধতা দেন। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন না হলেও একটা জীবন্ত প্রাণিকে শুধুমাত্র মানুষের ভোগের জন্য হত্যা করা যে অন্যায় বা পাপ হতে পারে একথা একুইনাস কখনো স্বীকার করেননি। তিনি তিন প্রকারের পাপের কথা স্বীকার করেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, নিজের বিরুদ্ধে পাপ এবং প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ। অমানব প্রাণির প্রতি অন্যায্য আচরণকে তিনি পাপের মধ্যে গণ্য করেননি।[৪৭] সুতরাং তাঁর পাপের ধারণা বা নৈতিকতার সীমা অমানব প্রাণিকে স্পর্শ করে না। অমানব সত্তাসমূহকে তিনি মানুষের ব্যবহারের উপাদান হিসেবেই গণ্য করেন। তিনি বলেন: একটি তুর্কি মোরগ ক্ষুধার্ত বলে আমরা মোরগটিকে ভালোবেসে খাবার দিতে পারি না। বরং আমরা যদি মোরগটিকে কারও বড়দিনের নৈশভোজ হিসেবে বিবেচনা করি তবেই একে খাবার দিতে পারি।[৪৮] অর্থাৎ একুইনাসের মতে, পশুর প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়ার একটাই কারণ; পশুর প্রতি নিষ্ঠুর হলে তা একজন মানুষকে মানুষের প্রতিও নিষ্ঠুর হতে পরিচালিত করতে পারে। তাঁর এ যুক্তির মধ্যে প্রজাতিবাদের সারকথা সুস্পষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য সাম্প্রতিককালের পরিবেশ দার্শনিকেরা তাঁকে প্রজাতিবাদী হিসেবে শনাক্ত করেন।

একুইনাসের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নবম পোপ রোমে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতাবিরোধী একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে অনুমোদন দেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ করার অর্থ হলো- অমানব প্রাণির প্রতি মানুষের কর্তব্য রয়েছে একথা স্বীকার করা।[৪৯] তাই এ রকম গোষ্ঠীকে অনুমোদন দেওয়া সমীচীন নয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ অদ্যাবধি এ রকম ধারণাই পোষণ করে। একটি রোমান ক্যাথলিক পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছেঃ "প্রকৃতির স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গের জন্য, যুক্তিবুদ্ধিহীন যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্নদের সেবার জন্য অস্তিত্বশীল। যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতির এই স্তরবিন্যাসের জন্যই তার নিচের স্তরের সবকিছুকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছে। মানুষ তার জীবনধারণ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রাণি ও উদ্ভিদকে ভোগ করতে পারে। ভোগ করার জন্য এদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। সুতরাং একটি কাজ হিসেবে হত্যা স্বগুণে অনৈতিক বা অন্যায় নয়"।[৫০]

মধ্যযুগের অন্যান্য প্রভাবশালী দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে শুধুমাত্র একুইনাস অমানব সত্তা (মানবেতর প্রাণি) সম্পর্কে আলোচনা করেন। বুদ্ধিবৃত্তি নামক গুণের দোহাই দিয়ে তিনি মানবসত্তাকে সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে অমানব সত্তার স্বতঃমূল্য ও নৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণকে পাপ হিসেবে অভিহিত করলেও ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টিকে (অমানব সত্তাসমূহ) নির্বিচারে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার ও হত্যা করাকে পাপ বলে স্বীকার করেননি। সুতরাং অমানব সত্তা সম্পর্কিত একুইনাসের মতবাদে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও প্রজাতিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

২.৩ আধুনিক যুগ

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে আধুনিক যুগের শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ব্যাপী এর পরিসর। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রতিটি যুগের দর্শন ও দার্শনিক মতবাদ স্বতন্ত্র বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষণীয়। এজন্য অমানব সত্তা সম্পর্কে আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করার পূর্বে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক। আধুনিক যুগের প্রথম দিকের দর্শন ও দার্শনিক চিন্তায় মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় দর্শন প্রায় সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টান ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের প্রথম দিকে গ্রিক দর্শনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মধ্য ও শেষ মধ্যযুগের দার্শনিকদের কাজ ছিল সম্পূর্ণ খ্রিষ্টান ধর্মের প্রেক্ষাপটে গ্রিক দর্শনের (বিশেষ করে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দর্শন) পুনঃপ্রবর্তন এবং আত্তীকরণ করা।[৫১] যখন মধ্যযুগের দার্শনিকবৃন্দ গ্রিক দর্শনের সান্নিধ্যে আসেন তখন তাঁরা প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। তৎকালীন সময়ের দার্শনিকবৃন্দ জগতের অস্তিত্ব বিষয়ক আলোচনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা প্লেটোর প্রত্যয় (ideas) বা আকার (forms) বিষয়ক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন, এজন্য জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কিত তাদের মতবাদকে নব্য-প্লেটোবাদ বলে অভিহিত করা হয়। প্লেটো জগতকে পরিদৃশ্যমান ও বুদ্ধিগ্রাহ্য-এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন, আমরা যে জগতে (পরিদৃশ্যমান জগত) বাস করি সেটা বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের অনুলিপি বা ছায়া। বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে বিভিন্ন ধরনের সার্বিক ধারণা রয়েছে এবং আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত বিষয় বা বস্তু দেখি সেগুলো ঐ বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের সার্বিক ধারণার ছায়া। প্লেটোর মতে, বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের সার্বিক ধারণাই একমাত্র বাস্তব; যেমন, পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে মানুষ দেখি তারা বিশেষ বিশেষ মানুষ। এই মানুষ হলো বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের সার্বিক ধারণা 'মানুষ'-এর অনুলিপি, ছায়া বা নকল (copy)। অর্থাৎ সার্বিক ধারণাসমূহ পরিদৃশ্যমান জগতের বাইরে অস্তিত্বশীল হয়েও পরিদৃশ্যমান জগতে অস্তিত্বশীল ধারণাসমূহের সাথে যেভাবে সম্পর্কিত, ঠিক একইভাবে খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে ঈশ্বর জগতের বাইরে অস্তিত্বশীল হয়েও জগতের সাথে সম্পর্কিত। এভাবে প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ দ্বারা সেন্ট অগাস্টিনসহ মধ্যযুগের অনেক দার্শনিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

মধ্যযুগের শেষে অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তার পুনঃপ্রবর্তন হতে দেখা যায় এবং এসময় অ্যারিস্টটলের দর্শন এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে তা প্লেটোর প্রভাবকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ রেনেসাঁর সময় দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত

করেন। অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়ার মূলে ছিল প্লেটোবাদ, কারণ প্লেটোবাদই সর্বপ্রকার প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্লেটোবাদকে তখন সচেতনভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আধুনিক যুগের প্রথম দিকে ডেকার্ট, ম্যালব্রাঞ্চ, এমারসন ও রয়েস প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দকে প্লেটোবাদ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায়।[৫২]

আধুনিক যুগের দর্শন প্রথম দিকে স্কলাস্টিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হলেও মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন মধ্যযুগীয় দার্শনিক যখন কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা প্রাকৃতিক বস্তুর চিত্রের সম্মুখীন হন (যেমন- পাহাড়, নদী, বনভূমির চিত্র), তখন তিনি বাইবেলের মূল বক্তব্য বা দৃষ্টান্তের সাথে এই বস্তু বা চিত্রের সাদৃশ্য ঘটিয়ে এগুলোর মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মীয় তাৎপর্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে আধুনিক যুগের শুরুর দিকে দার্শনিকদের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক চিন্তার (representational thinking) প্রচলন দেখা যায়। দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক বস্তুর চিত্রকে বাইবেলের বানী বা গল্পের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না করে প্রকৃত বস্তুর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেমন, কোনো পাহাড় বা নদীর চিত্র দেখে তাঁরা বাহ্যিক জগতের সত্যিকারের পাহাড় বা নদী সম্পর্কে চিন্তা করতেন। এরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ফরাসি দার্শনিক রেঁনে ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০)- এর দর্শনে যার হাত ধরে দর্শন আধুনিক যুগে পদার্পণ করে। আধুনিক দর্শন ও দার্শনিক চিন্তা কতিপয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়; যেমন, ১) বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব ২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং ৩) মূল্যের বস্তুনিষ্ঠতা। এই সমস্যাগুলো সমাধানে গুরুত্বারোপ করার কারণে আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যেও প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণবিরোধী চিন্তা পরিলক্ষিত হয়।[৫৩]

রেঁনে ডেকার্ট মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ধ্যানধারণা একেবারে বর্জন করতে না পারলেও তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, দার্শনিক জ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে গাণিতিক জ্ঞানের মতো সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর মতে, মানুষের মন হচ্ছে চৈতন্যধর্মী দ্রব্য এবং দেহ জড় পদার্থ বিশেষ অর্থাৎ বিস্তৃত্বধর্মী দ্রব্য। পৃথিবীতে অবস্থিত সকল সত্তার মধ্যে শুধুমাত্র মানুষের মন বা চেতনা আছে, এজন্য অন্যান্য সত্তাসমূহ জড়পদার্থ বা যন্ত্রের সামিল। কারণ তাদের চেতনা নেই। সুতরাং ডেকার্টের মতে, পৃথিবীতে অবস্থিত অন্য সকল সত্তাসমূহের প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই।

প্রাণিজগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডেকার্ট তাঁর *Discourse On Method* গ্রন্থে মানুষ ও প্রাণির মধ্যেকার পার্থক্য আলোচনা করেন। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি হতবুদ্ধি, বোকা বা পাগল হোক না কেন, সে তার চিন্তা-ভাবনাকে কথার সমষ্টির মাধ্যমে অথবা ইশারায় অন্যকে বোঝাতে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণি আছে যারা হুবহু মানুষকে অনুকরণ করতে পারলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে, এরা যা চিন্তা-ভাবনা করছে সেটাই অন্যের নিকট প্রকাশ করছে। কারণ মানুষের মতো প্রাণির কোনো যুক্তিশক্তি নেই। ডেকার্ট বলেন, আমাদের চৈতন্যের প্রকৃতি আর প্রাণি চৈতন্যের প্রকৃতি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।[৫৪] ডেকার্ট প্রাচীন দার্শনিক মঁতেইনের (১৫৩৩-১৫৯২) যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেন, "কোনো কোনো প্রাণিদের মতো এমন ভাবাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে, পশুরা আসলে সত্যিই কথা বলে, শুধু আমরাই তাদের

ভাষাটা বুঝিনা"।[৫৫] পশুরা যে যুক্তিশক্তিহীন নয়, তার সপক্ষে মঁতেইনের যুক্তি হলো: "**এক.** পশুদের ভাষা আছে, যদিও মানুষ সেটা বোঝে না; **দুই.** কোনো কোনো পশু-পক্ষী-কীটের (যেমন, বাবুই পাখি বা মৌমাছি বা পিঁপড়ে) মধ্যে এমন দক্ষতা ও গুণপনা দেখা যায় যা মানুষে মেলা ভার"।[৫৬] ডেকার্টের মতে, কোনো-কোনো কাজে কিছু প্রাণির মানুষের চেয়ে বেশি দক্ষতা রয়েছে এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি অন্য অনেক কাজে সেই একই প্রাণির কোনো দক্ষতাই প্রদর্শিত হয় না। যার ফলে কোনো কোনো কাজ তারা আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে করছে বলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাদের বুদ্ধি আছে।[৫৭] অর্থাৎ ডেকার্টের মতে, কোনো ব্যাপারে দক্ষতা থাকা মানেই যে যুক্তিশক্তিরও অধিকারী হওয়া তা নয়। প্রাণির এ দক্ষতাকে ডেকার্ট যন্ত্রের সাথে তুলনা করে বলেন, যেমন করে বড় কোনো ঘড়ি যন্ত্রের সাহায্যে সময় দেয় তেমনি প্রাণিও অঙ্গসমূহের বিন্যাস ও প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই যান্ত্রিকভাবে কাজ করে। সুতরাং ডেকার্ট অনুসারে বলা যায়, মানুষই পৃথিবীতে একমাত্র যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা; এজন্য মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক অমানব সত্তাকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারে।

ডেকার্ট একদিকে আধুনিক দর্শনের জনক, অন্যদিকে একজন আদর্শ খ্রিস্টান ছিলেন এবং তাঁর চিন্তার দুটি দিকের সমন্বয় থেকে অমানব প্রাণি সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছে। নতুন যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবে ডেকার্ট মনে করতেন, যে সকল জিনিস জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত তা যান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়, যেভাবে একটি ঘড়ি পরিচালিত হয়। মানবদেহ জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং তা জড়জগতের অংশ। সুতরাং মানবদেহও যন্ত্রের মতো আচরণ করে এবং বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু মানুষ দেহ ও মনের সমন্বয়ে গঠিত এবং দেহ ও মন যেহেতু আলাদা সেহেতু মানুষের মন বা আত্মাকে যান্ত্রিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। চেতনা ও আত্মা অভিন্ন। ঈশ্বর আত্মাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন, এজন্য মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংস হলেও আত্মা অবিনশ্বর থাকে। কেবল মানুষেরই আত্মা আছে। অমানব প্রাণির আত্মা নাই, এরা আনন্দ বা বেদনা অনুভব করে না, সুতরাং অমানব প্রাণি যন্ত্রমাত্র। এরা ঘড়ির মতো একই নিয়মে চলে, এবং এদের কাজ একটি ঘড়ির চেয়ে জটিলতর, কারণ ঘড়ি মানুষের তৈরি যন্ত্র, কিন্তু প্রাণি ঈশ্বরের সৃষ্ট সীমাহীন যন্ত্রবিশেষ।[৫৮]

মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিক দর্শনের পরিবর্তে দর্শনকে গাণিতিক, জ্যামিতিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো রেঁনে ডেকার্টকে আধুনিক দর্শনের জনক বলে অভিহিত করা হয়। ডেকার্ট ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি সন্দেহাতীতভাবে আত্মসত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ আলোচনার মাধ্যমে তিনি দ্বৈতবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডেকার্ট প্রকৃতি, প্রকৃতির কোনো অমানব সত্তা বা মানবেতর প্রাণির রক্ষণাবেক্ষণ এবং এদের নৈতিক মূল্যের কথা স্বীকার করেননি। বরং মানুষের মতো অমানব সত্তার চৈতন্যধর্মী আত্মা না থাকার কারণে অমানব সত্তাকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করেন। মানুষ যেমন তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছামত যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে ঠিক একইভাবে অমানব সত্তা বা মানবেতর প্রাণিকে মানুষ তার যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং অমানব সত্তা সম্পর্কিত ডেকার্টের এ মতবাদকে মানবকেন্দ্রিক মতবাদ বলে অভিহিত করা যায়।

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রভাবশালী জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) বিচারবাদী (জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ) দার্শনিক হিসেবে বহুল পরিচিত। জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধনে তিনি যেমন অসামান্য অবদান রেখেছেন তেমনি নীতিবিদ্যায়ও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

কান্টের নীতিবিদ্যা পরিণতিমুক্ত বা মানমুক্ত নীতির (Deontological Rules) উপর প্রতিষ্ঠিত।[৫৯] এজন্য কান্টকে পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ (Deontologist) বলেও অভিহিত করা হয়। পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ্যা অনুসারে, "কাজের ভালত্ব বা মন্দত্ব ফল উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয়। কোনো কাজের পিছনে যে অভিপ্রায় (Motive) থাকে তা' দিয়ে কাজের মূল্যায়ন করা হয়"।[৬০] কান্টের মতে, "প্রকৃতিতে সব কিছুই আপন নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে। বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণিরই শুধু নিয়মের ধারণা অনুযায়ী অর্থাৎ নীতি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা অর্থাৎ ইচ্ছা আছে"।[৬১] অর্থাৎ প্রকৃতির সকল সত্তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হলেও মানুষ যেহেতু বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা এবং ইচ্ছাবৃত্তির (Will) অধিকারী, সেহেতু মানুষ নৈতিক নিয়ম বা আইন অনুযায়ী তার কাজকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালিত করতে পারে। কারণ কান্টের মতে, নৈতিক আইন সকল বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণিদের জন্য প্রযোজ্য।[৬২] সুতরাং মানুষের বোধজগতই নৈতিকতার উৎসস্থল।[৬৩] তিনি মনে করেন নৈতিকবোধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত না, বরং অভিজ্ঞতাপূর্ব (সার্বিক এবং অনিবার্য জ্ঞান)।

প্রাচীন যুগের দার্শনিক অ্যারিস্টটল এবং মধ্যযুগীয় দার্শনিক একুইনাসের মতো কান্টও জগতকে (পৃথিবী) উদ্দেশ্যের জগৎ বলে অভিহিত করেন। কান্ট বলেন, "জগৎ বলতে আমি একটা বিশেষ ব্যবস্থায় অভিন্ন আইনের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন বুদ্ধিমান মানুষের সংহত সম্মিলনকে বুঝাই।"[৬৪] তাঁর মতে এ উদ্দেশ্যের জগতে সকল বুদ্ধিমান সত্তাই একে অপরকে সব সময় শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবেই গণ্য করবে, কখনোই উপায় হিসেবে নয়। কারণ পৃথিবীতে একমাত্র বুদ্ধিমান সত্তাই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। বুদ্ধিমান এবং স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা বলতে তিনি শুধুমাত্র মানুষকেই বোঝান। এর প্রমাণ শর্তহীন আদেশের (Categorical imperative) দ্বিতীয় আকারের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, "এমনভাবে কাজ করো তা তোমার নিজের ক্ষেত্রেই হোক আর অন্য কারো ক্ষেত্রেই হোক- যেন মনুষ্যত্বকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, শুধু উপায় হিসেবে কখনোই নয়।"[৬৫]

কান্ট তাঁর *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals* গ্রন্থে বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন, যে সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছার উপর নয় বরং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, সেগুলো যদি যুক্তি-নিরপেক্ষ (non-rational) সত্তা হয়, তাহলে সেগুলোরও উপায় হিসেবে একটি আপেক্ষিক মূল্য আছে এবং যে-জন্য সেগুলোকে বস্তু (things) বলা হয়। অন্যদিকে বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তাকে ব্যক্তি (person) বলা হয়, কারণ তাদের প্রকৃতিই তাদেরকে নিজস্বভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশ করে, অর্থাৎ এমন কিছু হিসেবে যাতে তাদেরকে নেহাত উপায় হিসেবে কখনোই ব্যবহার করা যাবে না, আর সেই হিসেবে তা তাদের কাজের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিশেষে সম্মানজনক পাত্রে পরিণত হয়।[৬৬] কান্টের এ আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রকৃতিতে যে সকল অমানব সত্তা রয়েছে এরা বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়ার কারণে এদেরকে মানুষ তাদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্য কান্ট অমানব সত্তাসমূহকে নৈতিক বা স্বতঃমূল্যে মূল্যায়ন না করে পরোক্ষ বা আপেক্ষিক মূল্য স্বীকার করে এদেরকে বস্তু বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মানবসত্তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বলে তাদের নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে এবং তারা তাদের কাজকেও স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং কান্ট অনুসারে, বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি থাকার কারণেই মানব সত্তা সম্মানজনক বা শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করতে পারে কিন্তু

অমানব সত্তাকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। শুধুমাত্র যুক্তি বা বুদ্ধি নামক বৃত্তি বা গুণের কারণে কেনো মানবসত্তাকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা বলে বিবেচনা করা হবে?-এ প্রশ্নের কোনো যথার্থ উত্তর বা যুক্তি কান্ট তাঁর কোনো আলোচনায় ব্যাখ্যা করেননি।

কান্ট অনুসারে, আমরা যদি জগতের অস্তিত্বশীল সব কিছুকে ব্যক্তি ও বস্তু- এই দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে অমানব সত্তাসমূহ (জীব-জন্তু) কান্টের দর্শন সাহিত্যে ঠিক কোন শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত হবে তা সুস্পষ্ট নয়। এতক্ষণে এটা স্পষ্ট যে, এরা যুক্তিজীবী অর্থাৎ rational being– এর আওতায় পড়ে না। সেক্ষেত্রে এরা 'বস্তু'-জগতের অধিবাসী। এখন যে প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন তা হলো- "আমরা পশু-পাখি, জীব-জন্তুকে কি শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবে অর্থাৎ আমাদের স্বার্থের সহায়ক রূপে ব্যবহার করতে পারি এবং এই আচরণ কি নৈতিকতার দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য"? যদি তারা "ব্যক্তি"-গোষ্ঠীভূত না হয়, তা'হলে তাদের প্রতি অবহেলা, তাদের নির্যাতন, আনন্দের খাতিরে তাদের রক্তপাত কোনোটাই "নৈতিক অন্যায়" বলে আখ্যায়িত হয় না।[৬৭] কান্টের এ মতবাদকে অনেক দার্শনিক বা নীতিদার্শনিক সমর্থন করেন বলে মনে হয় না। আবার অনেক ধর্মে জীবে প্রেম করাটাও অপরিহার্য নৈতিক শর্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু নৈতিকতার এ প্রচলিত দিকটাও কান্টের দর্শনে অবহেলিত হয়েছে।

কান্ট মনে করেন, জগতের অস্তিত্বশীল সকল অমানব সত্তা সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। এছাড়া মানুষ যেভাবে অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে অমানব সত্তার প্রতিও মানুষ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। সুতরাং অমানব প্রাণির প্রতি মানুষের কর্তব্যকে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেন: প্রাণিদের প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো কর্তব্য নেই। প্রাণিরা আত্মসচেতন নয়। তারা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। মানুষ হলো উদ্দেশ্য। অমানব প্রাণিদের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের অর্থ হলো মানুষের প্রতি পরোক্ষভাবে আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করা।[৬৮]

কান্ট-প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর উল্লেখিত মতবাদকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাঁর মতে, সেবা করতে পারছে না বলে যদি কোনো ব্যক্তি তার পোষা কুকুরকে গুলি করে হত্যা করে তবে এই ব্যক্তি কুকুরটির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন একথা বলা যাবে না।[৬৯] অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্য কোনো প্রাণিই নয়, কেউ যদি তার পোষা প্রাণিকেও হত্যা করে সেটাও কান্টের কাছে অনৈতিক বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ তিনি কখনোই প্রাণি বা অমানব সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্য (intrinsic value) স্বীকার করেননি। যেহেতু প্রাণি মানুষের প্রয়োজন সাধন করে, সেহেতু প্রয়োজন সাধনের উপায় হিসেবেই প্রাণি বা অমানব সত্তাসমূহের মূল্য নির্ধারিত হয়। এ মূল্য পরতঃমূল্য (extrinsic value)। মানুষ যেন নিজেদের অনুভূতিগুলোকে যথাযথভাবে লালন করতে পারে সেজন্যই কান্ট মানুষকে প্রাণির প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি যদি তার মানুষী অনুভূতিগুলোকে দমন না করে থাকে তবে প্রাণিদের প্রতি তার দয়ালু হওয়া উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি প্রাণিদের প্রতি ক্রুর আচরণ করে সে মানুষের প্রতিও নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে। প্রাণির প্রতি কৃত আচরণ দিয়ে আমরা একজন মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিচার করতে পারি।[৭০]

সুতরাং মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা থেকে বিরত থাকার জন্যই কান্ট প্রাণির প্রতি সদয় আচরণ করার নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে তাঁর ধারণা ছিল, মানুষ প্রাণির প্রতি যে আচরণ প্রদর্শন করে তার মাধ্যমেই মানুষের হৃদয়ানুভূতির মূল্যায়ন করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবন্ত প্রাণিকে হত্যা করা বা ব্যবহার করাকেও কান্ট বৈধতা প্রদান করেছেন। কারণ এ ধরনের গবেষণার মধ্যে মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল নিহিত থাকে। তিনি বলেন: জীবব্যবচ্ছেদবাদীরা যখন পরীক্ষার জন্য জীবন্ত প্রাণিদের ব্যবহার করেন তখন নিঃসন্দেহে তারা নিষ্ঠুর আচরণ করেন, যদিও তাদের উদ্দেশ্য প্রসংশনীয়। কিন্তু যেহেতু প্রাণিকে অবশ্যই মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (instrument) হিসেবে গণ্য করতে হবে সেহেতু জীবব্যবচ্ছেদকগণ তাদের এই নিষ্ঠুরতার যথার্থতা প্রতিপাদন করতে পারেন। তবে বিনোদনের জন্য এ রকম নিষ্ঠুর কাজের যথার্থতা প্রতিপাদন করা যাবে না।[৭১] অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজন সাধনে কান্ট নির্দ্ধিদায় জীবন্ত প্রাণি হত্যা ও ব্যবহারের অনুমোদন দিলেও অন্য কোনো কাজে (মানুষের প্রয়োজন সাধন ব্যতীত) প্রাণির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সমর্থন করেননি।

কান্ট শুধুমাত্র মানব সত্তাকেই (বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ায়) স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে অভিহিত করেন। মানব সত্তা ছাড়া জগতের অস্তিত্বশীল অমানব সত্তাসমূহকে মানুষের প্রয়োজনের মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেন। মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রত রাখার জন্য এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্যই কান্ট অমানব সত্তাসমূহের প্রতি দায়িত্ব পালন করার কথা বলেন। কান্ট বিশ্বাস করেন, অমানব সত্তাসমূহের প্রতি দায়িত্ব পালনের এই চর্চা পরোক্ষভাবে মানুষের প্রতি মানুষকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলা যায় যে, অমানব সত্তাসমূহ সম্পর্কে মানবকেন্দ্রিক মনোভাবই কান্টের দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগের অধিকাংশ দার্শনিক প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক বিবেচনার অর্ন্তভুক্ত করেননি। কিন্তু আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) মানবসত্তা ছাড়াও সকল ধরনের অমানব প্রাণিকে নৈতিক বিবেচনার অর্ন্তভুক্ত করেন। পাশ্চাত্য আধুনিক দার্শনিকদের গতানুগতিক চিন্তাভাবনার তুলনায় এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল ব্যতিক্রম। বেনথাম বলেন:

> ... এমন দিন আসতে পারে, যেদিন প্রাণিজগতের বাকি অংশগুলো সেই অধিকারগুলো অর্জন করতে পারে যা তাদের কাছ থেকে কখনোই স্বেচ্ছাচারীদের দ্বারা কেড়ে নেয়া হবে না। ফরাসিরা ইতোমধ্যে আবিষ্কার করেছে যে, ত্বকের কালোত্বের কোনোও কারণ নেই যে একজন মানুষকে যন্ত্রণাদানকারীর খেয়াল খুশির প্রতিকার ছাড়াই পরিত্যাগ করা উচিত। এটি একদিন স্বীকৃত হতে পারে যে, পায়ের সংখ্যা, ত্বকের ভিলোসিটি বা শ্রেণি-অস্থির সমাপ্তি, একই ভাগ্যের জন্য একটি সংবেদনশীল সত্তাকে পরিত্যাগ করার জন্য কারণগুলো সমানভাবে অপর্যাপ্ত। যুক্তিবুদ্ধি থাকা বা কথা বলতে পারা কি নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ড? একটি পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া বা কুকুর, একদিন বা এক সপ্তাহ, এমনকি এক মাস বয়সী শিশুর চাইতে বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন বা ভাববিনিময়ে সক্ষম। কিন্তু এদেরকে (একটি পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া বা কুকুরকে) অন্যভাবে দেখা হয়। এভাবে দেখার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? এদের কি বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে, অথবা এরা কি কথা বলতে পারে, এ প্রশ্ন তোলা হয়। আসলে এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং বিবেচ্য হলো, এদের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি আছে কি-না? [৭২]

উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেনথাম নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতো তিনি শুধুমাত্র 'বুদ্ধিবৃত্তিকে' নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ড বলে বিবেচনা করেননি, বরং আনন্দ ও বেদনা অনুভব করার ক্ষমতাকেও নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ডের অর্ন্তভুক্ত করেন। ফলে এ মানদণ্ডে অমানব প্রাণিসমূহও নৈতিক বিবেচনা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। কারণ বেনথাম মনে করেন, সদ্যজাত বা অল্প বয়স্ক মানব শিশুর তুলনায় অনেক অমানব প্রাণি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বা ভাববিনিময়ে সক্ষম। অমানব প্রাণি সম্পর্কে বেনথামের এরূপ চিন্তাধারা পরবর্তীতে দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছে এ কথা বলা যায়। কারণ বেনথাম-পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় প্রকৃতি ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের প্রতি নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে।

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের) যে কয়েকজন দার্শনিকের প্রকৃতি এবং পরিবেশের অমানব সত্তা বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বেনথাম ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিকেরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃতি ও অমানব সত্তাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষা ব্যবহার ও স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার ক্ষমতাকে নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ড বলে স্বীকার করেন। অমানব সত্তাসমূহের মধ্যে উল্লেখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত থাকার কারণে দার্শনিকেরা এদের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন না। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ যেহেতু নানাবিধ প্রয়োজনে অমানব সত্তাসমূহকে ব্যবহার করে আসছে এজন্য দার্শনিকেরাও এদের সহায়ক বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনের তিনটি যুগের (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) অধিকাংশ দার্শনিকই শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক অধিকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু বেনথামের মতো সংবেদনশীলতাকেও যদি নৈতিক বিবেচনার মানদণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করা হতো তাহলে অমানব সত্তাসমূহও নৈতিক অধিকার বা আত্মমর্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জন করতো। যাইহোক, প্রকৃতি বা অমানব সত্তাসমূহের প্রতি বেনথাম-পূর্ব দার্শনিকদের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বেনথামের অমানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীতে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের মধ্যে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সত্তা সম্পর্কে অমানবকেন্দ্রিক দার্শনিক মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

২.৪ র‍্যাচেল কারসনের *সাইলেন্ট স্প্রিং (Silent Spring)* ও পরিবেশবাদী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশের প্রতি সচেতনতামূলক মনোভাব যেমন গড়ে ওঠে তেমন পরিবেশবাদী আন্দোলনও ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। পরিবেশবাদী বিভিন্ন আন্দোলনসমূহের প্রবর্তকদের মধ্যে আমেরিকার র‍্যাচেল কারসন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব। তিনি পেশায় একজন মেরিন জীববিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি যে একজন প্রকৃত প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন এটা বললে ভুল হবে না। কারণ মানবসত্তার পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা থেকে তিনি *সাইলেন্ট স্প্রিং (Silent Spring)*- গ্রন্থটি রচনা করেন। কৈশোরে কারসন লক্ষ্য করেছিলেন যে, শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় ঢেউ পিটসবার্গ এলাকাকে পশ্চিমা বিশ্বের লোহা ও ইস্পাতের রাজধানীতে পরিণত করেছিল। স্প্রিংডেলের ছোট্ট শহরটি দুটি বিশাল কয়লা-চালিত বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টের মধ্যে স্যান্ডউইচের মতো একটি নোংরা বর্জ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, এর বাতাস রাসায়নিক নির্গমনের দ্বারা, এর নদী শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছিল। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, শিল্পের কর্ণধারেরা কোনো নোটিশ ও দায়বদ্ধতা ছাড়াই

শহরগুলোকে দূষিত করে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতাগুলো কারসনকে রসায়নের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি, এবং প্রযুক্তি একটি ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করবে, এমন দাবির প্রতি চিরকালের জন্য সন্দেহজনক করে তুলেছিল।[৭৩]

১৯৪৫ সালের দিকে কারসন নতুন সিন্থেটিক রাসায়নিক ডিডিটি[৭৪] এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী কৃষি কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার থেকে পরিবেশগত ক্ষতির উদ্বেগজনক প্রমাণ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কারসনের মতে, ডিডিটি এমনই ক্ষতিকর যে তা শুধু ফসলের জন্য ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গকেই ধ্বংস করে না, অনেক উপকারী পোকা-মাকড়কেও ধ্বংস করে; পাখির কোলাহলকে থামিয়ে আসন্ন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, প্রচন্ড শারীরিক দুর্বলতার কারণে পাখিগুলো উড়তেও পারেনা। যে সকাল একসময় রবিন, ক্যাটবার্ড, ঘুঘু, জেস, রেন এবং অন্যান্য পাখির সম্মিলিত কলকাকলিতে কম্পিত হতো এখন সেখানে আর কোনো শব্দ নেই; মাঠ ও কাঠ এবং জলাভূমি জুড়ে শুধুই নীরবতা।[৭৫] আপেল গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল কিন্তু মৌমাছি রেনু সংগ্রহ না করায় পরাগায়ন ঘটেনি, এবং কোনো ফলও হবে না। এলাকার উদ্ভিদের মধ্যে এক প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। রহস্যময় রোগে মুরগি, গবাদি পশু এবং ভেড়া অসুস্থ হয়ে মারা যায়। চারিদিকে শুধু মৃত্যুর ছায়া। রোগীদের মধ্যে যে নতুন ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে শহরের ডাক্তারেরা আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কারণ এ রোগ শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যেই নয়, শিশুদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল।[৭৬] এটা ছিল বসন্তকাল কিন্তু চারিদিকে শুধুই নীরবতা। কীটনাশকগুলো এত বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে প্রাণি ও জড় উভয় জগতে এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। এগুলো বেশিরভাগ প্রধান নদীব্যবস্থা থেকে শুরু করে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অদেখা ভূগর্ভস্থ জলের স্রোত থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে। বারো বছর পূর্বে প্রয়োগ করা ডিডিটি রাসায়নিক পদার্থের অবশিষ্টাংশও মাটিতে থেকে যায়। এগুলো মাছ, পাখি, সরীসৃপ, গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণির দেহে এতটাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রাণির উপর গবেষণা করা বিজ্ঞানীরা ভূপৃষ্ঠকে দূষণমুক্ত করা অসম্ভব বিষয় বলে মনে করেন। কারণ দুর্গম পাহাড়ি হ্রদের মাছে, মাটির গর্তে থাকা কেঁচোতে, পাখির ডিম এবং বয়স নির্বিশেষে মানুষের মধ্যেও ডিডিটির ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্তন্যদানকারী মা এবং সম্ভবত অনাগত শিশুও এ বিষাক্ত পদার্থ থেকে নিরাপদ ছিল না। অর্থাৎ ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ নাশক ডিডিটি যেভাবে পানি ও মাটি দূষণের মাধ্যমে প্রাণিকূল ও জীবকূলের স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বিপর্যয় সাধন করে, কারসন এর বিস্তারিত বর্ণনা করে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, পৃথিবীর এই রাসায়নিক দুর্নীতি আমাদেরকে গর্ভধারণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত করে।

সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থে কারসন দেখান যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ব্যাপক পুর্নগঠন কর্মকাণ্ড ও অতি দ্রুত উচ্চফলনশীল কৃষি উৎপাদনের আশায় আমেরিকায় যুগান্তকারী রাসায়নিক কীটনাশক ডিডিটি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী নির্বিচারে এ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বিজ্ঞানীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্ষতিকর কীট–পতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য এ ঔষধ বা কীটনাশক ব্যবহার করা হলেও একটা পর্যায়ে যেয়ে কীট–পতঙ্গের মাঝে ঔষধ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ ধ্বংসাত্মক পোকামাকড়গুলি সবসময় একটা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যায়, ফলে ঔষধ স্প্রে করার পরে এদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে ডারউইনের বির্বতনবাদের যোগ্যতমের টিকে থাকা (survival for the

fittest) নীতির বাস্তব উদাহরণ বলা যায়।[৭৭] কারসনের মতে, এভাবে রাসায়নিক যুদ্ধে কখনও জেতা যায় না এবং সমস্ত জীবন এর সহিংস ক্রসফায়ারে জড়িয়ে পড়ে।[৭৮] কারসন বলেন যে, "কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে যে এমন বিষকে সকল প্রাণের জন্য অনুপযোগী না করে পৃথিবীর উপরিভাগে বিছিয়ে দেওয়া সম্ভব? এদেরকে "কীটনাশক" না বলে "বায়োসাইড" বলা উচিত"।[৭৯]

সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মানবসত্তা ও অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে কারসন যে সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আর এদিক থেকে এ গ্রন্থকে পরিবেশ- সচেতনতামূলক প্রথম ও ঐতিহাসিক প্রতিবাদী গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়। কারণ তৎকালীন সময়ে আমেরিকার সরকার রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম না জেনেই এগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেয়, এজন্য কারসন তাঁর বইয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরকারের বিচক্ষণতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে জনগণকে রক্ষা করার পরিবর্তে এবং কোনো জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না রেখেই সরকার এ ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে। এসব পদার্থ থেকে নাগরিকদের অরক্ষিত রাখায় সরকারের নৈতিক অধিকার নিয়েও কারসন প্রশ্ন তোলেন, কারণ নাগরিকেরা এসব উপাদানকে যেমন শারীরিকভাবে এড়াতে পারে না তেমন প্রকাশ্যে প্রশ্ন বা প্রতিবাদও করতে পারে না। কারসন অভিযোগ করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুনাফা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসায়নিক শিল্পের দাসী হয়ে উঠেছে।[৮০]

১৯৬৪ সালের বসন্তে কারসন মৃত্যুবরণ করেন। কারসনের মৃত্যুর ছয় বছর পর সংশ্লিষ্ট (পরিবেশ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত) আমেরিকানরা প্রথম ধরিত্রী দিবস উদযাপন করে এবং কংগ্রেস জাতীয় পরিবেশ-নীতি আইন পাস করে। কারসন এমন একটি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে ডিডিটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন নিষিদ্ধ হবে এবং রাষ্ট্র ও ফেডারেল প্রধানের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার দাবিতে একটি তৃণমূল আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের বিষয়ে মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা বা জাগরণ সৃষ্টি করা না যায় তাহলে রাসায়নিক কীটনাশকের অপব্যবহারের ফলে আমরা ভবিষ্যতে ধীরগতির বিষক্রিয়ার শিকার হবো এবং মানুষের স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত পরিবেশের অসুস্থতাকে প্রতিফলিত করবে। হাজার বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও কারসন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও *সাইলেন্ট স্প্রিং* গ্রন্থের মাধ্যমে যে পরিবেশবাদী সচেতনতা ও আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা শতভাগ সফল হয়েছে বলা যায়। অনেক আলোচনা, বিতর্ক এবং গবেষণার পর ১৯৭২ সালে আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত ডিডিটি নিষিদ্ধ করা হয়।[৮১] পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশেই এখন আর এ কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার না থাকলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ডিডিটি উৎপাদনের একমাত্র কারখানাটি এখন বন্ধ। তবে তাতে ১৫ টন ডিডিটি জমাকৃত অবস্থায় আছে উল্লেখ করে গ্রীনপিসের এক প্রতিবেদনে এটির মজুদ ও এর গাদের (স্লাজ) জন্য বাংলাদেশকে বিশ্বের ৫০ টি হটস্পটের মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮২]

২০২২ সালের ৬ ডিসেম্বরের বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত সাড়ে তিন দশক ধরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বন্দর-নগরী চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে মজুত করে রাখা হয়েছিল নিষিদ্ধ এই কীটনাশক ডিডিটি। এই কীটনাশকের মজুত বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদে সরিয়ে বিশেষজ্ঞের

তত্ত্বাবধানে বিনষ্ট করার জন্য ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছে। ২০২১ সালে পরিবেশসম্মতভাবে ডিডিটি অপসারণের জন্য 'পেস্টিসাইট রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ' নামে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে ম্যালেরিয়ার জীবানু বহনকারী মশা নিধনের জন্য পাকিস্তান থেকে আনুমানিক ৫০০ মেট্রিক টন ডিডিটি আমদানি করে তৎকালীন সরকার। কিন্তু আমদানিকৃত এই ডিডিটি নিম্নমানের হওয়ায় সে-সময় ব্যবহার না করে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের গুদামে রাখা হয়। জীব-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় ১৯৯১ সালে দেশে ডিডিটি নিষিদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ২০০১ সালে স্টকহোম সম্মেলনের চুক্তি অনুযায়ী সারাবিশ্বে এই রাসায়নিক নিষিদ্ধ করা হয়। অবশেষে ডিডিটি আমদানির ৩৭ বছর পর বাংলাদেশ এই ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত হলো।

২.৫ পিটার সিঙ্গারের প্রাণিমুক্তি তত্ত্ব

দর্শনের শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যার সূচনালগ্ন থেকে সকল দার্শনিকই মানুষের স্বতঃমূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যে সকল কারণে অমানব প্রাণিসমূহের স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হয় না তা হলো প্রাণি আত্ম-সচেতন নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা নেই, নির্বাচন ক্ষমতা নেই, ভাষা নেই অথবা থাকলেও সে ভাষায় বিবর্তন নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় এনে অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা ও অধিকারকে অস্বীকার করেছেন প্রাচীন যুগের দার্শনিক অ্যারিস্টটল, মধ্যযুগের সেন্ট টমাস একুইনাস এবং আধুনিক যুগের দার্শনিক ডেকার্ট ও কান্ট। আঠারো শতকের উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথাম সর্বপ্রথম অমানব প্রাণির নৈতিক অধিকারের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মানুষের মতো প্রাণিও নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বেনথামের এ প্রচেষ্টা পরবর্তীতে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সত্তুরের দশক থেকে এ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দান ও বেগবান করে তোলেন পিটার সিঙ্গার। অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা ও মুক্তির আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে পিটার সিঙ্গার রচনা করেন *অ্যানিম্যাল লিবারেশন* (*Animal Liberation*) গ্রন্থটি।[৮৩] এ গ্রন্থটি পরবর্তীতে অন্যান্য দার্শনিক ও সাধারণ মানুষের মাঝেও প্রাণি-অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

প্রাণির নৈতিক মূল্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক অ্যারিস্টটল, ডেকার্ট, কান্ট বিশেষ করে একুইনাস স্তরায়নের মাপকাঠিতে মানবসত্তা ও প্রাণিসত্তার মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেন। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হওয়ায় মানব সত্তাকে স্তরায়নের মাপকাঠিতে উঁচু স্তরের সত্তা বলে দাবি করা হয়। উঁচু স্তরের সত্তা হওয়ায় যে কোনো প্রয়োজনে অমানব প্রাণিকে ব্যবহার করার অধিকার মানুষের রয়েছে এমনটাই মনে করতেন বেনথাম-পূর্ব দার্শনিকবৃন্দসহ সাধারণ মানুষ। আর এমন ধারণা থেকেই প্রথমে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে এবং পরবর্তীতে প্রাচ্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণি উৎপাদন ও বানিজ্যকরণের ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। এ ব্যবস্থায় ফার্মে বিশেষভাবে উৎপাদনের হার বাড়িয়ে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লালন-পালনের মাধ্যমে প্রাণির মাংসকে বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করা যায়। কৃত্রিমভাবে মাংসের উৎপাদন বাড়িয়ে বৃহৎ পরিমাণ জনগোষ্ঠীর মাংসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হলেও এরূপ পদ্ধতি অমানব প্রাণির জন্য যন্ত্রণাদায়ক ও নিপীড়ণমূলক। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে ফার্মিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা হলেও পিটার সিঙ্গার সর্বপ্রথম ফার্মিং পদ্ধতির বিরুদ্ধে নৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অমানব প্রাণির প্রতি অমানবিক আচরণ ও ফার্মিং পদ্ধতিতে প্রাণি লালন–পালন প্রক্রিয়াই পিটার

সিঙ্গারকে অমানব প্রাণির নৈতিক মূল্য প্রদান সম্বন্ধীয় আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ফার্মিং পদ্ধতি ছাড়াও প্রসাধনী সামগ্রীর উপকরণ,ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য পরীক্ষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্র হিসেবে যে বিভিন্ন ধরনের অমানব প্রাণির উপর পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালানো হয় তার বিরুদ্ধেও সিঙ্গার মত প্রকাশ করেন।[৮৪] অমানব প্রাণির নৈতিক মূল্যের বিষয়টি আমরা যদি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় যে, অন্যান্য অমানব সত্তার মতো প্রাণিসত্তাও পরিবেশের অন্তর্গত। আর পরিবেশ সম্পর্কে দর্শনে দুই ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছেঃ মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) ও অ-মানবকেন্দ্রিক (non-anthropocentric)।[৮৫] মানবকেন্দ্রিক মতবাদ প্রজাতিবাদের সমর্থক। ১৯৭০ সালে রিচার্ড রাইডার বর্ণবাদ (racism) ও লিঙ্গবাদের (sexism) সাথে সাদৃশ্য দেখাতে 'প্রজাতিবাদ' বা 'speciesism' শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্ণবাদ ও লিঙ্গবাদের মতো প্রজাতিবাদও মানবপ্রজাতি ব্যতীত অন্য প্রাণিদের জীবন,মর্যাদা, অধিকার বা প্রয়োজনের প্রতি সম্মান অস্বীকার করে।[৮৬] অর্থাৎ প্রজাতিবাদ সাম্যবাদ-বিরোধী মতবাদ। প্রজাতিবাদ অনুসারে নিজ প্রজাতির বাইরে অন্য প্রজাতির সদস্যকে প্রয়োজনে আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া এমনকি হত্যাও করা যায়। কারণ প্রজাতিবিদগণ দৈহিক গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রজাতিসমূহের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু যে দৈহিক অনুভূতিটি সকল প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান সে অনুভূতিটি প্রজাতিবিদরা বিবেচনায় আনেননি– এ বিষয়টি হলো ব্যথা ও যন্ত্রণার অনুভূতি। রাইডার বিশ্বাস করেন মানুষসহ সকল অমানব প্রাণিসত্তার মাঝে ব্যাথা ও যন্ত্রণার অনুভূতি রয়েছে। যেহেতু অন্য প্রজাতির সদস্যকে আঘাত করা প্রজাতিবাদ নৈতিকভাবে অনুমোদন দেয়, সেহেতু রাইডার প্রজাতিবাদকে অনৈতিক বলে অভিহিত করেন।[৮৭]

পিটার সিঙ্গার প্রজাতিবাদের সমালোচনা করে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, "যখন স্ব-বর্ণ ও অপর বর্ণের স্বার্থের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন বর্ণবাদী তার স্ব-বর্ণের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে সমতার নীতিকে ভঙ্গ করেন। লিঙ্গবাদীরা সমতার নীতিকে ভঙ্গ করেন নিজ লিঙ্গের স্বার্থকে প্রশ্রয় দিয়ে। একইভাবে, প্রজাতিবাদী অপর জাতির সদস্যদের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাহ্য করার জন্য স্বজাতির স্বার্থকে মেনে নেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে অভিন্ন আদর্শ"।[৮৮] সমতার নীতির মূল বক্তব্য হলো-'সকল প্রজাতি সমান'। কিন্তু বাস্তবে আমরা এর উল্টো চিত্র দেখতে পাই, কারণ মানবপ্রজাতির ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগের কথা বলা হলেও অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করা হয় না। এমনকি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে দার্শনিকেরা সমতার কথা বললেও এর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের এরূপ বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পিটার সিঙ্গার প্রজাতিবাদকে দায়ী করেন। যেহেতু সমতার নীতির মাধ্যমে মানবপ্রজাতি এবং অন্য প্রজাতির সকল সদস্যদের সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, এজন্য সিঙ্গার সমতার একটা মৌলিক নীতি বা ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। 'স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি' হচ্ছে সমতার সেই মৌলিক নীতি যার মাধ্যমে মানব প্রজাতিসহ অন্যান্য প্রজাতির সকল সদস্যদের সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পিটার সিঙ্গারের মতে, "স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটির মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের নৈতিক বিচার-বিবেচনায় যেমন নিজেদের স্বার্থকে গুরুত্ব দিই ঠিক তেমনি আমাদের কাজের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকলের স্বার্থের প্রতিও সমগুরুত্ব প্রদান করি। এর অর্থ হচ্ছে সম্ভাব্য কোনো কাজ দ্বারা যদি শুধু ক এবং খ-এর

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং খ-এর লাভবান হওয়ার চেয়ে যদি ক-এর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কাজটি না করাই অধিকতর ভাল"।[৮৯] অর্থাৎ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি অনুসারে আমাদের সকলের স্বার্থকে সমানভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। কখনো ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া যাবে না। স্বার্থকে আমরা যদি স্বার্থ হিসেবেই বিবেচনা করতে পারি, তাহলে আমরা নিজস্ব প্রজাতি ও নিজস্ব প্রজাতির বাইরেও অন্য প্রজাতি অর্থাৎ অমানব প্রাণির সাথেও একটি সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবো। কিন্তু অধিকাংশ দার্শনিকই মানবেতর প্রাণির ক্ষেত্রে স্বার্থের সমবিবেচনা নীতির প্রয়োগযোগ্যতা স্বীকার করেন না। তবে আধুনিক উপযোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা জেরেমি বেনথাম অমানব প্রাণির নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বার্থের সমবিবেচনা নীতিকে স্বীকার করেন।

পিটার সিঙ্গার অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে বেনথামের উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। উপযোগবাদ সম্পর্কে বেনথাম তাঁর *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789)* গ্রন্থে বলেন, "উপযোগ হচ্ছে কোনো বস্তুর ঐ গুণ যা উপকার, সুবিধা, সুখ, ভালো অথবা আনন্দ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে ... অথবা অমঙ্গল, ব্যাথা, মন্দ অথবা নিরানন্দ প্রভৃতিকে ব্যহত করে"।[৯০] বেনথামের মতে যা সুখ বা আনন্দ সৃষ্টি করে এবং ব্যথা বা নিরানন্দ পরিহার করে সেটা ভালো আচরণ। আর যা ব্যথার সৃষ্টি করে সেটা মন্দ আচরণ। অর্থাৎ উপযোগবাদ সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজের বা আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব নির্ধারণ করে। উপযোগবাদের এ নীতিকে 'সর্বাধিক সুখ নীতি' ('The greatest happiness principle') নামেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু পিটার সিঙ্গার উপযোগবাদের সর্বাধিক সুখ (maximizing happiness) নীতির পরিবর্তে সর্বনিম্ন ব্যথা ও যন্ত্রণার (minimizing pain and suffering) নীতিকে সমর্থন করেন। সুখ বৃদ্ধির মনোভাবকে 'সদর্থক উপযোগবাদ' এবং ব্যথা হ্রাস করার মনোভাবকে 'নঞর্থক উপযোগবাদ' বলে অভিহিত করা হয়।[৯১] সদর্থক উপযোগবাদ বলতে প্রচলিত বা চিরায়ত উপযোগবাদকেই বুঝায়। আর নঞর্থক উপযোগবাদ শব্দটির পরিবর্তে এখানে 'বিপরীত উপযোগবাদ'(reverse utilitarianism) শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কারণ সিঙ্গার তাঁর *প্র্যাকটিক্যাল এথিকস* (*Practical Ethics)* গ্রন্থে 'বিপরীত' শব্দটিকে 'চিরায়ত' শব্দের সমান্তরাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বৈষম্যের নীতির' সমান্তরাল 'বিপরীত বৈষম্য নীতি'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।[৯২] অর্থাৎ সিঙ্গার অমানব প্রাণির সমতা ও নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চিরায়ত উপযোগবাদের 'ব্যথা ও যন্ত্রণাকে' সর্বনিম্নে হ্রাস করার পক্ষে মত দেন। সিঙ্গার বলেন,

> আমি যখন নৈতিকভাবে আমার স্বার্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তখন আমার স্বার্থকে বিস্তৃত করে অন্যের স্বার্থ হিসেবে দেখতে প্রত্যাশা করি। ... আমার স্বার্থ শুধু আমার নিজস্ব হওয়ার কারণে অন্যের স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না, তখন আমার নিজস্ব স্বার্থের স্থলে এখন আমাকে আমার সিদ্ধান্ত দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিতে হয়। এ কাজটি করতে হলে আমাকে এ সব স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হয় যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থকে যথাসম্ভব সর্বাধিক করা যায়। এভাবে সবকিছু বিবেচনা করে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করি যার সবচেয়ে ভালো ফলাফল রয়েছে। এটি উপযোগবাদের একটি রূপ। উপযোগবাদের এই রূপটি চিরায়ত উপযোগবাদ থেকে পৃথক।[৯৩]

পিটার সিঙ্গারের মতে, যখন আমরা আমাদের স্বার্থের পরিধিকে বিস্তৃত করে অন্যান্য সকলের স্বার্থকে অর্ন্তভুক্ত করবো, তখনই আমরা সমতাকে সার্বজনীন রূপ দিতে পারবো। এজন্য সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিকে সমতার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। নৈতিক দিক থেকে সকলের স্বার্থকে আমাদের সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অমানব প্রাণির স্বার্থকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারলে এদের সমতা ও নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রজাতিবিদগণ যে সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষ ও প্রাণির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করে মানবপ্রজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন সে বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– অমানব প্রাণির ব্যথার সংবেদন নেই, যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও তৈরির ক্ষমতা নেই, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা নেই এবং আত্মসচেতনতা নেই। অমানব প্রাণির বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো পিটার সিঙ্গার একে একে খণ্ডন করেন এবং উল্লেখিত বিষয়ে অমানব প্রাণির বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো সিঙ্গার যে সকল যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে খণ্ডন করেন এ পর্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথমত

মানব প্রজাতির বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রজাতিবিদরা বিভিন্নভাবে অমানব প্রাণি ব্যবহারের নৈতিক অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এমনকি মানুষের প্রসাধন সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রয়োজন মেটাতেও গবেষণাগারে পরীক্ষণপাত্র হিসেবে অমানব প্রাণিসমূহকে নিদারুণ যন্ত্রণা ও কষ্টের সম্মুখীন করানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রজাতিবিদদের যুক্তি হলো অমানব প্রাণির ব্যাথার সংবেদন নেই, আর থাকলেও তা বোঝার উপায় নেই। সিঙ্গার একটি হৃদয়স্পর্শী উদাহরণের মাধ্যমে প্রজাতিবিদদের এ অভিযোগ খণ্ডন করেন। সিঙ্গার বলেন, অন্য কোনো সত্তার অনুভূত বেদনা সম্পর্কে আমরা কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি না, সে সত্তা মানুষ হোক আর না হোক। আমি যখন একটি শিশুকে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ক্ষত হতে দেখি, তখন তার কান্না, হাঁটু ব্যাথা সম্পর্কে আমাকে বলা,ক্ষত স্থানটি ঘষা ইত্যাদি আচরণ থেকে আমি জানি যে, সে বেদনা অনুভব করে। আমি যখন ব্যাথা পাই তখন আমি নিজেও একই আচরণ করি। সুতরাং আমি স্বীকার করি যে, হাঁটুতে ক্ষতের সৃষ্টি হলে আমি যেমন ব্যাথা অনুভব করি বাচ্চাটিও অনুরূপ অনুভব করে। অমানব প্রাণির ব্যাথা অনুভব করার ঘটনা সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের ভিত্তিটি বাচ্চাটির ব্যাথা অনুভব করতে পারার বিশ্বাসের ভিত্তিটির অনুরূপ। ব্যাথায় মানুষ যেরূপ আচরণ করে অমানব প্রাণিও প্রায় অনুরূপ আচরণই করে, এবং তাদের ব্যাথা অনুভব করতে পারার ঘটনাটি বিশ্বাসের জন্য তাদের আচরণই পর্যাপ্ত ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে।[৯৪]

দ্বিতীয়ত

মানুষ ও অমানব প্রাণির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে অমানব প্রাণি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও তৈরি করতে পারে না। কিন্তু সিঙ্গার দেখান যে, গ্যালাপ্যাগোজ (Galapagos) নামক এক কাঠ ঠোকরা পাখি গাছের ফাটল থেকে পোকামাকড় বের করার জন্য ফনিমনসা গাছের কাঁটা ব্যবহার করে। যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে জেন গুডল (Jane Goodall) খেয়াল করেন যে, তানজানিয়ার জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি জলে পূর্ণসিক্ত করার জন্য গাছের পাতা চিবিয়ে স্পঞ্জ তৈরি করে এবং পোকামাকড় ধরার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য গাছের পাতা ছিড়ে সাজিয়ে রাখে।[৯৫]

তৃতীয়ত

ভাষার ব্যবহার হলো মানুষ ও অমানব প্রাণির মধ্যে পার্থক্যের আর একটি সীমারেখা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, শিম্পাঞ্জি ও গরিলারা মূক ও বধিরদের ভাষা শিখেছে এবং এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তিমি ও ডলফিনের নিজস্ব জটিল ভাষা আছে।[৯৬]

চতুর্থত

যেহেতু অমানব প্রাণি চিন্তা করতে বা যুক্তি প্রদান করতে পারে না সেহেতু তাদের নিজেদের সম্পর্কে কোনো ধারণা বা আত্মসচেতনতা নেই। এরা শুধু বর্তমানের মধ্যে বসবাস করে এবং অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কেও এরা অবগত নয়। স্বনিয়ন্ত্রণ না থাকায় জীবনযাপন পদ্ধতি নির্বাচনের কোনো সামর্থ্যও তাদের নেই।[৯৭] চিন্তন ক্ষমতা বা বুদ্ধিবৃত্তি, আত্মসচেতনতা বা স্বনিয়ন্ত্রণ এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যারা মানুষ ও অমানব প্রাণির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদেরকেও সিঙ্গার যুক্তিসম্মত উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়। তাঁর মতে, মানসিকভাবে অপরিণত এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আত্মসচেতনতা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনেক অমানব প্রাণির চেয়ে কম। যেমন আমাদের সমাজের সকল মানব শিশু, দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের আত্মসচেতনতা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে আমরা যেমন গবেষণাগারে পরীক্ষণপাত্র হিসেবে ব্যবহার করি না তেমন তাদের স্বতঃমূল্যকেও অস্বীকার করি না। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে, এ সকল মানুষের মধ্যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাদের স্বতঃমূল্যকে নৈতিকভাবে অনুমোদন দেয়া হয়? অথচ প্রজাতিবিদগণ বুদ্ধি, স্বনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সচেতনতা না থাকার কারণে অমানব প্রাণির পরতঃমূল্য (extrinsic value) স্বীকার করে।

পিটার সিঙ্গার তাঁর *প্র্যাকটিক্যাল এথিকস* (*Practical Ethics*) গ্রন্থে মানুষ ও অমানব প্রাণির পার্থক্যের পাশাপাশি অমানব প্রাণির সহায়ক মূল্য বা পরতঃমূল্য স্বীকার করার পক্ষে প্রজাতিবিদদের যুক্তিগুলোকেও খণ্ডন করেছেন। অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে সিঙ্গার সমতার যে নৈতিক মানদণ্ডের (স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি) কথা বলেছেন এবং যেভাবে প্রজাতিবিদদের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন, তাতে বলা যায় প্রজাতিবাদ সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথামের পরে পিটার সিঙ্গারের প্রজাতিবাদ-বিরোধী মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অমানব প্রাণির নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অধিকার আদায়ের আন্দোলনের রূপরেখা প্রনয়ণে সাহায্য করে। কারণ অমানব প্রাণির সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিটার সিঙ্গারের আলোচনার মধ্যে অধিকারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে টম রিগান সিঙ্গারকে সমর্থন করে অমানব প্রাণির অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

অমানব প্রাণি ছাড়াও প্রকৃতিতে আরো যে সকল অমানব সত্তা (উদ্ভিদ, নদী, পাহাড়, ঝর্ণা, ভূমি, সমুদ্র) রয়েছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাদের নৈতিক মূল্য নিয়ে পিটার সিঙ্গার কোনো আলোচনা করেননি। এজন্য বেয়ার্ড কালিকট পিটার সিঙ্গারের মতবাদের সমালোচনা করে সিঙ্গারকে নব্য বেনথামবাদী বলে অভিহিত করেন। কারণ বেনথামের পরে সিঙ্গারই প্রাণিসমূহের ব্যাথা হ্রাস করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালিকটের মতে, সিঙ্গার মানুষ ও প্রাণি উভয়কেই সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে ব্যাথার সংবেদনকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ব্যাথার

সংবেদনশীল অমানব প্রাণি ছাড়াও প্রকৃতিতে আরও অনেক বিষয় আছে যাদেরকে সিঙ্গার সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। এদিক থেকে বিচার করে কালিকট বলেন, ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যে বৃক্ষরাজি, নদী, ঝর্ণা যদিও সজিব অথবা জীবন প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী, তবু সিঙ্গারের মতবাদ অনুসারে নৈতিক মর্যাদা লাভের কোনো সুযোগ এগুলোর ক্ষেত্রে নেই।[৯৮] সিঙ্গারের বিরুদ্ধে কালিকটের এরূপ অভিযোগের কারণ হলো কালিকট প্রাণির সমতার বিষয়টিকে পরিবেশবাদের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করেন এবং লিওপোল্ডের সমগ্র মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ মতবাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

২.৬ টম রিগানের প্রাণিঅধিকার তত্ত্ব

সৃষ্টির শুরু থেকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার নানবিধ প্রয়োজনে অমানব প্রাণিকে ব্যবহার করে আসছে, কারণ অমানব প্রাণিও যে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা একথা কখনো স্বীকার করা হয় না। মানুষ অমানব প্রাণির মাংসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, বিভিন্ন গবেষণায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরীক্ষণপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে, শিকার করে, ফাঁদ পেতে ধরে, আরো নানা উপায়ে শোষণ করে। অমানব প্রাণির এ সকল উপযোগিতা ছাড়াও যে একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে এ কথা আমরা ভুলে যাই। অর্ন্তনিহিত বা স্বতঃমূল্য থাকার কারণে আমরা একজন ব্যক্তির সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করি এবং অন্য কারো স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে কখনোই উপায় হিসেবে ব্যবহার করি না, কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত মানবেতর বা অমানব প্রাণিকে আমাদের বিভিন্ন স্বার্থে ব্যবহার করে থাকি, কারণ আমরা প্রাণির নৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করি। সর্বপ্রথম পিটার সিঙ্গার মানবসত্তার পাশাপাশি প্রাণিসত্তার নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাণিমুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান ও নেতৃত্ব দেন। এক্ষেত্রে তিনি "সমতার নীতি"কে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। তাকে সমর্থন করে পরবর্তীতে টম রিগান অধিকারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাণিসত্তার নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। টম রিগানের প্রাণি অধিকার দর্শন এই দাবি করে যে যুক্তিকে সম্মান দেওয়া হোক। কারণ মানুষের স্বতন্ত্র মূল্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে- সেরকম যে কোনো যুক্তিই ইঙ্গিত করে যে অন্য প্রাণিরও একই রকম মূল্য আছে এবং সমানভাবেই আছে। এবং মানুষের সম্মানজনক আচরণ পাওয়ার অধিকারকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে- সেরকম যে কোনো যুক্তি এই ইঙ্গিতও দেয় যে অন্য প্রাণিকূলের এই একই অধিকার আছে, এবং সমানভাবেই আছে।

অমানব প্রাণির ব্যক্তিসত্তা ও বুদ্ধিমত্তা না থাকার কারণে এরা নৈতিক কর্তা হবার যোগ্য নয়। তবে অমানব প্রাণির ব্যক্তিত্ব আছে কিনা এ নিয়ে দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়: ১. ম্যাক্সিমালিস্ট ধারা এবং ২. মিনিমালিস্ট ধারা।[৯৯] **প্রথমত:** যারা ব্যক্তিসত্তাকে 'নৈতিক কর্তা' হিসেবে বিবেচনা করেন তাঁরা প্রথম ধারার তাত্ত্বিক। তাঁরা দাবি করেন- পূর্ণ নৈতিক মর্যাদার জন্য অনিবার্য শর্ত[১০০] এবং নৈতিক কর্তা হবার জন্য পর্যাপ্ত শর্ত[১০১] পূরণ করতে হবে। প্রথম ধারার প্রবক্তা হলেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। দ্বিতীয় ধারার প্রবক্তা হলেন টম রিগান। রিগান তাঁর *The Case For Animal Rights(1985)* গ্রন্থে বলেন, নৈতিক মর্যাদা অর্জন করার জন্য নৈতিক কর্তা হওয়ার প্রয়োজন নেই, চিন্তা করা ও আত্মসচেতনতার সামর্থ্য থাকলেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া যায়। মিনিমালিস্ট ধারা অনুযায়ী যাদের "Subjects-of a-life"[১০২] রয়েছে তারাই নৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন। এ অর্থে, এই গুণাবলীসম্পন্ন যে কোনো সত্তাই সমানভাবে নৈতিক মর্যাদার অধিকারী। এ বিবেচনায় এক বছরের যে কোনো স্তন্যপায়ী অমানব প্রাণির যেহেতু "Subjects-of a-life" রয়েছে সেহেতু নৈতিক মর্যাদাও রয়েছে। এই মর্যদা যে কোনো মানবসত্তার মতোই সমান গুরুত্ব বহন করে। এ

কারণে একটি স্তন্যপায়ী তিমির যে নৈতিক মর্যাদা রয়েছে, মানুষেরও একই নৈতিক মর্যাদা রয়েছে দাবি করা যেতে পারে। অধিকারের দাবিতে তারা একই নৈতিক গোষ্ঠীর সদস্য। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা হওয়া এবং নৈতিক মর্যাদা অর্জনের জন্য বুদ্ধিমত্তা কোনো অনিবার্য শর্ত না, বরং যাদের জীবন আছে তাদের অধিকার আছে বেঁচে থাকার। সুতরাং টম রিগানের মতে বেঁচে থাকার অধিকারই কোনোকিছুর ব্যক্তিসত্তাকে নির্ধারণ করে।

বর্তমানে খামার পদ্ধতিতে বানিজ্যিকভাবে প্রাণি লালন–পালন ও চাষ অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু টম রিগান অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খামার পদ্ধতিতে প্রাণি লালন–পালন প্রক্রিয়াকে অন্যায্য বলে দাবি করেন, কারণ খামারের প্রাণিদের প্রাপ্য সম্মানের সাথে আচরণ করা হয় না। খামার পদ্ধতিতে প্রাণিকে নবায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার মূল্য শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত। রিগানের মতে, খামার পদ্ধতিতে প্রাণি লালন–পালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে সেটা ভুল, কারণ এ পদ্ধতিতে শুধু যে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাণি লালন–পালন করা হয় তা নয়, বরং এতটাই অমানবিকভাবে লালন – পালন করা হয় যে মানুষের স্বার্থের কারণে অসময়ে এদের জীবন শেষ হয়ে যায়। এজন্য খামার পদ্ধতিতে প্রাণি লালন–পালন প্রক্রিয়াকে রিগান কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তুলনা করেন। কারখানাগুলোতে যেমন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে বিভিন্ন পণ্যের দ্বিগুণ উৎপাদন করা হয়, ঠিক একইভাবে অধিক মুনাফা লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা খামারগুলোতে অমানবিকভাবে অমানব প্রাণিসমূহ (গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ভেড়াসহ অন্যান্য প্রাণি) চাষ করে থাকে। এক্ষেত্রে খামারের মালিকেরা প্রাণিকে আইনগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। টম রিগান বলেন, "খামারের প্রাণিগুলোকে আইনগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে যেভাবে আচরণ করা হয় তার প্রতিবাদের বিরুদ্ধে তাদের আইনি মালিকেরা যে যুক্তি দেখান তা খোঁড়া, কারণ **প্রথমত**, যা আইনি তা নৈতিক নয় এবং **দ্বিতীয়ত**, অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি আইনগত সম্পত্তি হিসেবে প্রাণির ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে"।[১০৩] রিগান প্রাণির অধিকারকে নৈতিক অধিকার হিসেবে অভিহিত করেছেন, আইনগত নয়। আইনগত অধিকার আইন দ্বারা সমর্থিত হতে হয় এবং একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আইন পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, নৈতিক অধিকার দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল জীবন্ত প্রাণির জন্য সমান। অমানব প্রাণির নৈতিক অধিকার দাবি করার অর্থ এই নয় যে, এদের রাজনীতি করার অধিকার আছে বা শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। প্রাণির অধিকার আছে বলার অর্থ এই যে, তাদেরকে লালন–পালন ও ব্যবহার করার সময় আমরা যেন তাদের সাথে সদয় আচরণ করি। সুতরাং, অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে টম রিগান মনে করেন, অমানব প্রাণিও মানুষের মতো স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা। এজন্য তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক আচরণ পরিহার করে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়া উচিত।

অমানব প্রাণির ক্ষেত্রে আমরা নৈতিক মর্যাদার বিষয়টিকে কীভাবে বিবেচনা করতে পারি? এ প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার "স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি"র কথা বললেও টম রিগান অধিকারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি আলোচনা করেন। টম রিগান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন পণ্য ও ঔষধের বিষাক্ততা পরীক্ষা এবং গবেষণায় অমানব প্রাণি ব্যবহারের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করেন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে প্রাণি ব্যবচ্ছেদের নিন্দা করেন, কারণ ঔষধ বা কসমেটিকসের সেফটি পরীক্ষা করার জন্য যখন জীবিত অমানব প্রাণিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় তখন তাদেরকে নির্বিচারে যন্ত্রণা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার দীর্ঘমেয়াদে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিকে এমন সব পাত্রে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় যেখানে এরা প্রয়োজন অনুযায়ী

নড়াচড়া করতে পারে না, ভালোভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসও নিতে পারে না। এই অবরুদ্ধ অবস্থা অমানব প্রাণিসমূহের শারীরিক বিকাশেরও অনুকূল নয়। আবার অধিকাংশ পরীক্ষণে প্রাণিকে অর্ধমৃত করে রাখা বা হত্যা করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিভিন্ন গবেষণাকালীন সময়ে প্রাণিদের যে অবেদন (anesthesia) দেয়া হয়, তাতে শুধু এদের ব্যাথা বা কষ্টই হয় না, অনেক ক্ষেত্রে এরা মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে।

টম রিগান বলেন, "ল্যাবরেটরিতে প্রাণির উপর বিষাক্ততার পরীক্ষার অনুমোদন দেয়া মানে নিত্যনৈমিত্তিক তাদের অধিকার লঙ্ঘনের অনুমোদন দেয়া। অধিকারের দৃষ্টিতে এই ধরনের সকল পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে"।[১০৪] কিন্তু বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রাণি স্তন্যপায়ী নয়, এজন্য এরা অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমর্থিত নীতিগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে না- এ যুক্তি দিয়ে ল্যাবগুলোতে নির্বিচারে প্রাণির ব্যবহারকে নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে টম রিগান বলেন, গবেষণাগারে অ-স্তন্যপায়ী প্রাণির নিয়মিত ব্যবহারও পরোক্ষভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে যা সংশ্লিষ্ট কাজ এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিতে অবদান রাখে, যা স্তন্যপায়ী প্রাণির প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয় এবং এভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণির অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। অর্থাৎ রিগান মনে করেন সকল ধরনের অমানব প্রাণির (স্তন্যপায়ী ও অ-স্তন্যপায়ী) উপর বিষাক্ততার পরীক্ষা বন্ধ করা উচিত, কারণ তিনি "The experiencing subject of life" নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এ নীতি অনুযায়ী, যাদের জীবন অনুভব করার ক্ষমতা রয়েছে, তাদের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। কোনোকিছুর অন্তর্নিহিত মূল্য থাকার অর্থই হলো তাদের প্রতি নৈতিক বিবেচনাও থাকতে হবে। এ মতানুসারে অমানব প্রাণিও "The experiencing subject of life" হবার যোগ্য।

অমানব সত্তা সম্পর্কে উল্লেখিত দার্শনিক পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত খুব কম দার্শনিকই অমানব সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং যে কয়েকজন দার্শনিক এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাদের আলোচনাও শুধুমাত্র মানবেতর বা অমানব প্রাণির পরতঃমূল্য স্বীকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মানবেতর প্রাণি ছাড়াও পৃথিবীতে অসংখ্য অমানব সত্তা (জড় ও অজড়) রয়েছে যাদের আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের) এবং প্রচলিত নীতিবিদ্যায় স্থান পায়নি। সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিকবৃন্দ জগতের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এসব আলোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মতবাদ। কিন্তু জগতের গঠন-প্রণালী ও স্থায়িত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় দার্শনিকদের অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। জগতের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও পরিণতির আলোচনার পাশাপাশি দার্শনিকেরা যদি জগতের গঠন ও স্থায়িত্বের আলোচনায় ব্রতী হতেন তাহলে হয়তো তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন, জগত গঠনে ও জগতের স্থায়িত্ব রক্ষায় অমানব সত্তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

জগতের আদিসত্তা সম্পর্কে সক্রেটিস-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল এবং এ সম্পর্কে সঠিক বা নির্ভুল তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিকবৃন্দ, সক্রেটিস ও সক্রেটিস-পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দ নিজেকে (মানুষ) জানার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। এ সকল দার্শনিকেরা সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির অমানব সত্তাকে মানুষের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য অস্তিত্বশীল বলে মনে করে। অর্থাৎ অমানব সত্তা সম্পর্কিত তাদের আলোচনা ছিল মানবকেন্দ্রিক। তবে একথাও সত্য যে তৎকালীন সময়ে বর্তমানের মতো পরিবেশ সংকট ছিলো না, হয়তো এ কারণেও তৎকালীন সময়ে পরিবেশ ও পরিবেশের অমানব সত্তাকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেনি। অন্যদিকে মধ্যযুগের একমাত্র দার্শনিক টমাস একুইনাস এবং আধুনিক যুগের দার্শনিক ডেকার্ট, কান্ট মানুষ ও অমানব প্রাণির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য তুলে ধরে অমানব প্রাণির উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করেন। উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথাম অমানব প্রাণির নৈতিক মূল্য স্বীকার করলেও প্রকৃতির অন্যান্য অমানব সত্তা নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেননি। বেনথামের পরবর্তী সময়ে পিটার সিঙ্গার ও টম রিগান বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রাণির নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠায় প্রাণিঅধিকার আন্দোলন গড়ে তোলেন। অর্থাৎ সকল অমানব সত্তার মধ্যে শুধুমাত্র অমানব প্রাণির ক্ষেত্রেই নৈতিক মূল্য স্বীকার করেন উপযোগবাদী দার্শনিক বেনথাম এবং প্রাণিঅধিকার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত পিটার সিঙ্গার ও টম রিগান। শুধুমাত্র র‍্যাচেল কারসন তাঁর সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষ যেভাবে প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহের ক্ষতিসাধন করে, অজান্তেই মনুষ্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। এজন্য র‍্যাচেল কারসনকে পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক এবং *সাইলেন্ট স্প্রিং*-কে পরিবেশ সচেতনতামূলক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে অ্যালডো লিওপোল্ড তাঁর '*The Land Ethic*' প্রবন্ধে মানুষ ছাড়াও ভূমি এবং ভূমির উপর অস্তিত্বশীল সকল সত্তাকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দার্শনিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ কাজটি করার জন্য তিনি প্রচলিত নীতিবিদ্যার পরিধি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পৃথিবীর সমগ্র সত্তাকে (মানব ও অমানব) নৈতিক বিবেচনায় আনার জন্য লিওপোল্ড 'ভূমি নীতিবিদ্যা' নামক নতুন নীতিবিদ্যার প্রবর্তন করেন। নৈতিকতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'ভূমি নীতিবিদ্যা' অ-মানবকেন্দ্রিক এবং বাস্তুবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমষ্টিবাদী মতবাদ। যে-সকল দার্শনিক অমানব সত্তাসমূহের স্বতঃমূল্য ও নৈতিক অধিকারের পক্ষে কথা বলেন এবং এ সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাদের মধ্যে লিওপোল্ড প্রবর্তিত ভূমি নীতিবিদ্যা শীর্ষক মতবাদকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যথার্থ মতবাদ বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ ভূমি নীতিবিদ্যায় লিওপোল্ড অখণ্ডতার নীতি নামে যে নীতির কথা বলেন তার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে শুধু অমানব সত্তাই নয়, বরং পৃথিবীর সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

তথ্যপঞ্জি

১. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩।
২. *প্রাগুক্ত*।
৩. ষাটের দশকের শেষদিকে *Science* পত্রিকায় প্রকাশিত এ বিষয়ে দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecological Crisis," *Science*, Vol. 155, March, 1967, এবং Ges Garrett Hardin.

"The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, Dec. 1968. দেখুন, কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩।

৪. J. Baird Callicott, "Animal Liberation: A Triangular Affair", in Donald Scherer & Thomas Atting (ed.), *Ethics and the Environment*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1983, p.54.

৫. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩।

৬. 'প্যারাডাইম শিফট' শব্দটির প্রথম প্রচলন করেন টমাস কুন (Thomas Kuhn) তাঁর বিখ্যাত বই *The Structure of Scientific Revolution*-এ। সাধারণভাবে 'প্যারাডাইম' বলতে কোনো কিছুকে দেখার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদকে বোঝায়।

৭. J.R.D. Jardins, Environmental Ethics : An Introduction to Environmental Philosophy, Wadsworth, Australia, 2012, p. 12.

৮. বিশেষ করে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ এবং আধুনিক পরবর্তী যে সকল দার্শনিক অমানব সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাদের মতবাদ।

৯. Eugene C. Hargrove*, Foundations of Environmental Ethics*, Prentice-Hall, 1989, New Jersey, PP. 21-22.

১০. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬।

১১. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, London, 1996, P. 73.

১২. Peter Singer, *Animal Liberation*, HarperCollins Publishers, New York, 1975 P. 188.

১৩. "The souls of dead men migrated to animals". Peter Singer, *প্রাগুক্ত*।

১৪. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৮।

১৫. ড. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭৯।

১৬. Frederick Copleston, *A History of Philosophy*, Image Books, New York, Vol. 1, Part 1, 1993. pp. 96-101.

১৭. *প্রাগুক্ত*, p. 102.

১৮. "Man is the measure of all things of those that are they are of these that are not that they are not".

১৯. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৮-৪৯।

২০. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

২১. E. Zeller, *Outline of the History of Greek Philosophy*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1963, p. 134.

২২. Frederick Copleston, *প্রাগুক্ত*, p. 133.

২৩. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

২৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

২৫. প্লেটো, *তাইমিয়াস ও ক্রিতিয়াস*, অনুবাদ, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১৭-১৮।

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

২৯. আতলান্তিস নামের ব্যাখ্যা, এর প্রতিষ্ঠাতা সমুদ্রদেব পসাইদন, দ্বীপটির প্রাকৃতিক সম্পদ, এর দালানকোঠা, অন্যান্য এলাকা, এর সামরিক বাহিনী, রাজনৈতিক ও আইনগত কর্তৃত্ব এবং পরিশেষে এর অবক্ষয় ও ধ্বংসমূলক (তথা, সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া) শাস্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এ সংলাপে। *ক্রিতিয়াসে* প্লেটো দাবি করেছিলেন যে, মহাজ্ঞানী সোলনের কাছ থেকে তিনি আতলান্তিস নগরীর গল্পটি শুনেছিলেন। সোলন ছিলেন এথেন্সের বিখ্যাত নীতিনির্ধারক। তিনি যখন মিশরে যান তখন সেখানকার প্রাচীন কিছু পুঁথি ও ধর্মযাজকদের থেকে অ্যাথেন্স এবং আতলান্তিস সম্পর্কে জানতে পারেন। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১-১৯২।
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮।
৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।
৩৩. *প্রাগুক্ত*।
৩৪. Eugene C. Hargrove*, প্রাগুক্ত*, P. 24.
৩৫. *প্রাগুক্ত*, P. 25.
৩৬. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯।
৩৮. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।
৩৯. Peter Singer, *Animal Liberation*, HarperCollins Publishers, New York, 1975, P.196.
৪০. এ্যারিস্টটল, *পলিটিক্স*, অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০১৩,পৃ. ৪৮।
৪১. Eugene C. Hargrove, *প্রাগুক্ত*, p. 25.
৪২. *প্রাগুক্ত*, p. 25.
৪৩. *প্রাগুক্ত*।
৪৪. *প্রাগুক্ত*, p. 21.
৪৫. ST. Thomas Aquinas*, Summa Contra Gentiles*, Tr. By English Domican Fathers, Benbigr Brother, Chicago, 1928, Third Book, Part 2, chap. CXII, selection reprented in, Tom Regan and Peter Singer(ed.), *Animal Right and Human Obligation*, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1989, P. 6-7. দেখুন, কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫।
৪৭. Peter Singer, *প্রাগুক্ত*, P. 194.
৪৮. "We cannot lovingly give food to turkeys because they are hungry, but only if we think of them as someone's Christmas dinner". *প্রাগুক্ত*, p. 195.
৪৯. *প্রাগুক্ত*, p. 196.
৫০. "In the order of nature, the imperfect is for the sake of the perfect, the irrational is to serve the rational. Man, as a rational animal, is permitted to use things below him in his order of nature for his proper needs. He needs to eat plants and animals to maintain his life and strength. To eat plants and animals, they must be killed. So killing is not, of itself, an immoral or unjust act". *প্রাগুক্ত*।
৫১. Eugene C. Hargrove, *প্রাগুক্ত*, p. 34.
৫২. *প্রাগুক্ত*।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, pp.34-35.

৫৪. রনে দেকার্ত, *পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা*, মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অবসর প্রকাশ, ঢাকা-১১০০, ২০০৪, পৃ. ৬৫।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

৫৮. Peter Singer, *প্রাগুক্ত*, p. 200.

৫৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৫।

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

৬৩. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতি দর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৮২, পৃ. ৮৭।

৬৪. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৬৭. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৬৮. I. Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*, Tr. by T.K. Abbott, Longmans, London, p. 191.

৬৯. *প্রাগুক্ত*, p. 240.

৭০. *প্রাগুক্ত*।

৭১. *প্রাগুক্ত*।

৭২. "... The day may come, when the rest of the animal creation may acquire those rights which never could have been withholden from them but by the hand of tyranny. The French have already discovered that the blackness of the skin is no reason why a human being should be abandoned without redress to the caprice of a tormentor. It may come one day to be recognised, that the number of the legs, the villosity of the skin, or the termination of the os sacrum, are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same fate.... is it the faculty of reason, or, perhaps, the faculty of discourse? But a full-grown horse or dog in beyond comparison a more rational, as well as a more conversable animal, than an infant of a day, or a week, or even a month, old. But suppose the case were otherwise, what would it avail? The question is not, can they reason? nor, can they talk? but, can they suffer"? Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, 1823, ch., 17, sec., 1, P. 311.

৭৩. Rachel Carson, *Silent Spring*, Hought Mifflin Company, New York, 2002, P. 18.

৭৪. আবিষ্কারের প্রথম দিকে ডিডিটি কীট নাশক রাসায়নিক ঔষধ হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে জার্মানের একজন গবেষক ওথমার জাইডলার ডিডিটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটা যে কীট-পতঙ্গ বিনাশে কার্যকরী সেটা তাঁর জানা ছিলো না। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে সুইজারল্যান্ডের রসায়নবিদ পল হারমেন মুলার কাপড়ের পোকা মারার জন্য দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক খুঁজতে গিয়ে এটি পুনরায় আবিষ্কার করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে এ আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডিডিটি গ্রহণযোগ্যতা

পেয়েছিল বিভিন্ন কারণে। ম্যালেরিয়া ও পীত জ্বরের বাহক মশাকে ধ্বংস করতে ডিডিটি সক্ষম ছিল; গম, ধান, ভুট্টাসহ কৃষি উৎপাদনে যেসব কীট-পতঙ্গ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল সেগুলো ধ্বংস করতে ডিডিটি ছিল কৃষকের জন্য মহৌষধ। এ কারণে আমেরিকা ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ডিডিটির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুহম্মাদ হুমায়ুন কবির, পরিবেশকোষ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০৩-২০৪।

৭৫. Rachel Carson, *প্রাগুক্ত*, p. 26.

৭৬. *প্রাগুক্ত*।

৭৭. Louis Paul Pojman, *Global Environmental Ethics*, London, Mayfield Publishing, 1999, P. 269.

৭৮. Rachel Carson, *প্রাগুক্ত*, p. 31.

৭৯. *প্রাগুক্ত*, p. 30.

৮০. *প্রাগুক্ত*, p. 20.

৮১. Louis Paul Pojman, *প্রাগুক্ত*, p. 269.

৮২. মুহম্মাদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪।

৮৩. রাশিদা আখতার খানম, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৩।

৮৪. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Peter Singer, *Animal Liberation*, Harper Collins Publishers, New York, 2002, Chs. 1-3 এবং Peter Singer, *Practical Ethics,* Cambridge University Press, Cambridge, 2011, Ch. 3.

৮৫. রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

৮৬. Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford University Press, New York, 1996, P. 358.

৮৭. রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৮৮. Peter Singer, *Animal Liberation*, *প্রাগুক্ত*, p. 9. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২।

৮৯. Peter Singer, *Practical Ethics, প্রাগুক্ত*, p. 20. দেখুন, প্রদীপ কুমার রায় (অনুদিত), *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮।

৯০. J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, The Clarendon Press, Oxford, 1789, p. 2. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৯১. Hursthouse Rosalind, *Ethics, Human and Other Animal: An Introduction with Readings*, Routledge, London, 2000, P. 13. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৯২. Peter Singer, *Practical Ethics,* Ch. 2. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৯৩. পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, অনুবাদ, প্রদীপ কুমার রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১-১২।

৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

৯৬. *প্রাগুক্ত*।

৯৭. *প্রাগুক্ত*।

৯৮. J.B. Callicott, "Animal Liberation: A Triangular Affair", in H. Lafollette, ed., Ethics in Practice: An Anthology, Blackwell, Oxford, 1997, P. 671.

৯৯. মেরি অ্যান ওয়ারেন ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত আলোচনায় এ দু'টি ধারার কথা বলেন।

১০০. যে কারণটি কোনো একটি ঘটনা সংঘঠিত হবার জন্য অনিবার্যভাবে দায়ী সেটি অনিবার্য শর্ত, যেমন মেঘ হলে বৃষ্টি হয়। এখানে মেঘ হলো বৃষ্টির অনিবার্য শর্ত। আবার "সড়ক দুর্ঘটনা মৃত্যুর কারণ", সড়ক দুর্ঘটনা পর্যাপ্ত শর্ত। কারণ এটি ছাড়া অন্য কোনো কারণেও মৃত্যু হতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনাই মৃত্যুর একমাত্র কারণ নয়।

১০১. ১০০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০২. 'Subject-of-a-life' বলতে টম রিগান যে কোনো সত্তার (মানব এবং অমানব) নিছক জীবিত থাকা এবং সচেতন হওয়ার চেয়ে আরও বেশি কিছুকে বুঝিয়েছেন। একটি জীবন থাকা বলতে তিনি কতোগুলো বৈশিষ্ট্যের একটি জটিল সেটকে বুঝিয়েছেন, যেমন; বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, উপলব্ধি, স্মৃতি, ভবিষ্যতের অনুভূতি, আনন্দ এবং বেদনার অনুভূতি, পছন্দ, কল্যাণ এবং স্বার্থ; আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা; সময়ের সাথে সাথে নিজের একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় (ভালো বা অসুস্থ) গড়ে তোলা, অন্যের উপযোগিতা সাধনের পরিবর্তে নিজেকে স্বাধীন হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রভৃতি। এগুলোকে একত্রে 'অন্তর্নিহিত মূল্য' বলে অভিহিত করা যায়। এই মূল্যের জন্যই ব্যক্তি বিশেষের সাথে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা হয়। রিগান মনে করেন, এমন অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণি আছে যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান। এজন্য ব্যক্তি বিশেষের মতো তাদের সাথেও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা উচিত।

১০৩. Tom Regan, *The Case for Animal Rights*, Routledge, London, 1988, P. 394.

১০৪. *প্রাগুক্ত*, p. 397.

তৃতীয় অধ্যায়
ভূমি নীতিবিদ্যায় অমানব সত্তার গুরুত্ব : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই মানুষের সীমাহীন ভোগবাদী চাহিদার যোগান দিয়ে আসছে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকৃতি ও প্রতিবেশের সকল সত্তার উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করেছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির বিজয়ী হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং প্রকৃতিকে পরিণত করেছে নিজেদের দাসে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান প্রাণি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ও প্রতিবেশের বাস্তুতন্ত্রের একজন সদস্য। শুধু মানুষ নয়, যে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অমানব প্রাণিসমূহ, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা এবং সমুদ্ররাশিসহ যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহ ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের অধিবাসী। একই বাস্তুতন্ত্রের সদস্য হিসেবে মানুষ এবং উক্ত অমানব সত্তাসমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু মানুষের ভোগবাদী ও উন্নত জীবনযাপনের অভিলাষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে। এমতাবস্থায় প্রকৃতি ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা মূল্যায়ন করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে মানুষের আচরণের মূল্যায়নের বিষয়টি নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। নীতিবিদ্যা মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া, অভ্যাস, আচরণ এবং চরিত্রের মূল্য বিচার করে থাকে। এজন্য নীতিবিদ্যাকে মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ ভালোত্বের বিজ্ঞান (Ethics is the science of the highest good of human life) বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন যুগ (গ্রিক দর্শন) থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত নীতিবিদ্যাকে প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যায়। তা হলো- সনাতনী বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা (nor-mative ethics) ও ভাষাতাত্ত্বিক বা পরানীতিবিদ্যা (meta-ethics)। সনাতনী বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। তা হলো- তাত্ত্বিক (theoritical) ও প্রায়োগিক (practical)।

৩.১ সনাতনী বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

সনাতনী নীতিবিদ্যার বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "নীতিবিদ্যা হলো এমন একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞান যা কেবল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদি মূল্যায়ন করে"।[১] প্রতিটি বিজ্ঞানের যেমন নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকে, তেমন শুধুমাত্র সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের মূল্যায়নই হলো সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়। প্রশ্ন হলো- সনাতনী নীতিবিদ্যা মানুষের কোন ধরনের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষের সাথে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের নৈতিক বা দার্শনিক মূল্যায়ন করাই সনাতনী নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ। এজন্য সনাতনী নীতিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্যায়নমূলক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ সমাজ-বহির্ভূত কোনো মানুষের আচরণ অথবা প্রাকৃতিক অমানব সত্তার সাথে মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্নও হতে পারে- সনাতনী নীতিবিদ্যা কেনো শুধুমাত্র মানুষ বা মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে? এর উত্তর হলো- সনাতনী

নীতিবিদ্যা পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সকল সত্তার মধ্যে শুধুমাত্র মানুষকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা বলে গণ্য করে। দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড ম্যূর (G.E. Moore, ১৮৭৩-১৯৫৮) 'স্বতঃমূল্য' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করেন।[২] স্বতঃমূল্য বলতে তিনি 'অন্তর্নিহিত গুণাবলীর মূল্যে মূল্যবান' সত্তাকে বোঝান। অর্থাৎ কোনো বস্তু যখন শুধুমাত্র নিজের মধ্যে নিহিত গুণাবলীর মূল্যে মূল্যবান হয় তখনই ঐ বস্তুকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা বলা হয়। ম্যূর বলেন, "কোনো এক প্রকার মূল্যকে 'স্বতঃমূল্য' বলার অর্থ হলো, কোনো বস্তু এই মূল্য ধারণ করে কিনা এবং কী পরিমাণে ধারণ করে তা সম্পূর্ণরূপে সেই বস্তুটির অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে"।[৩] ম্যূরের উল্লেখিত স্বতঃমূল্যের ধারণা অনুযায়ী বলা যায়, যে মূল্যের নিজস্ব মূল্য রয়েছে এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তাকে স্বতঃতমূল্য বলে।

পৃথিবীতে একমাত্র মানব সত্তাই বুদ্ধিবৃত্তি (rationality) নামক গুণের অধিকারী। এ অন্তর্নিহিত গুণের কারণে মানুষকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা বলে স্বীকার করা হয় এবং সনাতনী নীতিবিদ্যায় মানুষের আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়। সুতরাং সনাতনী নীতিবিদ্যা মানবকেন্দ্রিক। অবশ্য সনাতনী নীতিবিদ্যা প্রাকৃতিক অমানব সত্তাকে একেবারে মূল্যহীন মনে করে না। অমানব সত্তার ক্ষেত্রে সনাতনী নীতিবিদ্যা নৈতিক মূল্যের পরিবর্তে সহায়ক মূল্য বা উপযোগিতার মূল্য স্বীকার করে। অর্থাৎ অমানব সত্তা যতটুকু মানুষের উপযোগিতা সাধন করে ততটুকুই মূল্যবান। অমানব প্রাণী হত্যা, নির্বিচারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করা, পাহাড় কাটা, কৃত্রিমভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা প্রভৃতি বিষয়গুলো যদি মানুষের উপযোগ সাধন করে বা সুখ বৃদ্ধি করে তাহলে তা অনৈতিক নয়। বরং মানব উন্নয়নে সহায়ক বলে তা-ই করা উচিত।

প্রাকৃতিক অমানব সত্তার প্রকৃতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অমানব সত্তাও মানুষের মূল্যায়ন-নিরপেক্ষ স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা। মানব সত্তার মতো অমানব সত্তাও নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে অস্তিত্বশীল। নিজেদের প্রয়োজনে এরাও প্রকৃতির অন্যান্য অংশকে ব্যবহার করে থাকে, যেমন- মাকড়সা বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই জীবনধারণ করে এবং প্রকৃতির অন্যান্য ছোট ছোট পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই যে মাকড়সার জীবনধারণ বা বেঁচে থাকা তা কখনোই অন্য সত্তার জন্য নয়। অর্থাৎ মাকড়সা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। অস্তিত্বশীলতার এই সংগ্রামের জন্য মানুষ মাকড়সাকে মূল্যায়ন করুক বা না করুক তাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণীটির কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। কারণ জনমানবশূণ্য স্থানেও মাকড়সার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের মূল্যায়ন ছাড়াও মাকড়সা মূল্যসম্পন্ন থাকে এবং এ মূল্য স্বতঃমূল্য। এই অর্থে মাকড়সার মতো প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল অন্যান্য অসংখ্য অমানব সত্তার উপরেও এ মূল্য (স্বতঃমূল্য) প্রযোজ্য। আবার প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও (aesthetic value) রয়েছে যা সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক অমানব সত্তার সৌন্দর্য আবিষ্কার বা মূল্যায়ন না করলেও নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে অমানব সত্তাসমূহের সৌন্দর্য মূল্যহীন হয়ে যায় না। কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কখনোই অন্য কারো প্রয়োজন সাধনের জন্য মূল্যবান হয় না, বরং তা নিজেই মূল্যবান। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও স্বতঃমূল্য। সুতরাং প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের জীবনধারণ ক্ষমতা ও নান্দনিক সৌন্দর্য নামক অন্তর্নিহিত মূল্যের কারণে এদেরকেও নৈতিক বা দার্শনিক দিক থেকে মূল্যায়ন করা যায়, যেটা সনাতনী নীতিবিদ্যা এড়িয়ে

গিয়েছে। নৈতিক বা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা হিসেবে অমানব সত্তাসমূহকে সনাতনী নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধির সম্প্রসারণ ঘটানো আবশ্যক।

৩.২ ভূমি নীতিবিদ্যা

বিশ শতকে অ্যালডো লিওপোল্ড সর্বপ্রথম পরিবেশ বিষয়ক বা বাস্তুবিদ্যাগত সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ বিষয়ে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রচলিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রাসরণ প্রয়োজন।[৪] এজন্য লিওপোল্ড সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধিকে ব্যাপক এবং বিস্তৃত করে তা পরিবেশ নীতিবিদ্যার অংশ হিসেবে সংযোজন করেন। পরিবেশ সম্পর্কিত লিওপোল্ডের এ মতবাদ ভূমি নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত এবং এ মতবাদ অমানবকেন্দ্রিক।

লিওপোল্ড পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় প্রথম অমানব সত্তার নৈতিক মূল্য স্বীকার করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত না হলে বাস্তুতন্ত্রের শোচনীয় পরিণতি রোধ করা সম্ভব না। লিওপোল্ড ছিলেন বনবিভাগের একজন কর্মী। বনবিভাগে নিয়োজিত থাকার সময় তিনি অনুধাবন করেন, আমরা যদি নির্বিচারে গাছপালা ও বন-জঙ্গল ধ্বংস করতে থাকি তাহলে একদিন মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ মানব-অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রয়োজনের অজুহাতে প্রতিদিন যেভাবে বন উজাড় করা হয় তাতে বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের টিকে থাকার সাথে মানুষের টিকে থাকা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এজন্য বনবিধ্বংসী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা এবং বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন। লিওপোল্ড প্রথম বনজ-সম্পদ ও প্রাণী-সম্পদকে বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেই লিওপোল্ডের একক প্রচেষ্টায় বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার জন্ম হয়। পরিবেশের অবক্ষয় ও সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারার কারণে তিনি এ সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে "The Land Ethic" শীর্ষক প্রবন্ধটি অমানবকেন্দ্রিক মতবাদের গোড়াপত্তন করে[৫] (প্রবন্ধটি ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর *A Sand County Almanac* শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়)।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে পরিবেশের অবক্ষয় রোধে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে এবং এ সংগঠনগুলো নানাবিধ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবেশের অবক্ষয়ের প্রতি আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। এ সময় থেকেই পরিবেশের প্রতি সংরক্ষণবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। পরিবেশের প্রতি লিওপোল্ডেরও সংরক্ষণবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি যে সময়ে পরিবেশ ধ্বংসের ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন পর্যন্তও দর্শনে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবিদ্যক অথবা জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেনি।[৬] ভূমি (সমগ্র অমানব সত্তা) প্রকৃতি বা পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে অমানব সত্তাকে কখনোই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়নি, মূল্যায়ন করা হয়েছে অর্থনৈতিক বা উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। লিওপোল্ড সর্বপ্রথম ভূমিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

নীতিবিদ্যা এতদিন পর্যন্ত একটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে বিবর্তিত হয়েছে আর তা হলো: ব্যক্তি একটি কমিউনিটির সদস্য যার পারস্পরিক নির্ভরশীল অংশ রয়েছে। তার প্রবৃত্তি ঐ কমিউনিটিতে স্থান লাভের জন্য তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রাণোদিত করে, কিন্তু তার নৈতিকতা তাকে সহযোগিতা করতেও প্রণোদিত করে। ভূমি নীতিবিদ্যা কমিউনিটির সীমানাকে বিস্তৃত করে মৃত্তিকা, পানি, গাছ-পালা এবং প্রাণি অথবা সামগ্রিকভাবে, ভূমিকে অর্ন্তভুক্ত করে...

সংক্ষেপে, ভূমি নীতিবিদ্যা মানব গোষ্ঠীর বিজয়ীর ভূমিকাকে পরিবর্তন করে সাধারণ সদস্য এবং নাগরিকের ভূমিকাতে নিয়ে আসে ...[৭]

যেদিন থেকে নীতিবিদ্যা দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন থেকে তা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে আসছে। অর্থাৎ সনাতনী নীতিবিদ্যা শুধুমাত্র মানুষকে এর পরিধির অর্ন্তভুক্ত করে। লিওপোল্ড সনাতনী নীতিবিদ্যার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করে মানুষ ছাড়াও প্রকৃতির অন্যান্য অমানব সত্তাসমূহকেও নীতিবিদ্যার অর্ন্তভুক্ত করেন। নীতিবিদ্যা যেভাবে মানুষকে নৈতিক মূল্যে মূল্যায়ন করে ভূমি নীতিবিদ্যা সেই মূল্যকে ভূমির উপর অস্তিত্বশীল যাবতীয় অমানব সত্তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যকে মানুষ থেকে সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত করাই ছিল লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য।

লিওপোল্ড মনে করেন যান্ত্রিকতার ধারণা দিয়ে পৃথিবীকে জানতে গেলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রখর উপলব্ধিসম্পন্ন বিশ্বের বহু মানুষের কাছে আমাদের তথাকথিত 'প্রাণহীন প্রকৃতি' একটি সজীব বস্তু এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন যে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্ক বিরাজ করছে, যা যান্ত্রিক নীতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না; এই উপলব্ধিকে আমরা 'বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধি' বলে আখ্যায়িত করতে পারি।[৮] শুধুমাত্র নৈতিক চেতনা জাগ্রত হলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে প্রকৃতিরও প্রাণ আছে এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ উপলব্ধি যেহেতু নৈতিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার উপর নির্ভরশীল সেহেতু বাস্তুবিদ্যক উপলব্ধিকে বাস্তুবিদ্যক নীতিবোধ (ecological moral sense) বলেও অভিহিত করা যায়। লিওপোল্ডের পূর্বে অন্য কেউ প্রকৃতি বা পরিবেশ প্রসঙ্গে নৈতিক চেতনাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। ভূমি নীতিবিদ্যা শীর্ষক প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম আমাদের মাঝে পরিবেশ সংক্রান্ত নৈতিক উপলব্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। লিওপোল্ড বুঝতে পেরেছিলেন যে মানব জাতির আগ্রাসী আচরণ থেকে প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তাও আবশ্যক। বৃহৎ অর্থে মানবিক মূল্যবোধ বলতে শুধু দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালোবাসাকেই বোঝায় না, বরং এর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধও অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। মূল্যবোধ বলতে আমরা ভালো–মন্দ মূল্যায়নের চেতনাকে বুঝে থাকি, আর নৈতিকতা বলতে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ও কার্যকলাপের মূল্যায়নকে বোঝায়। মানুষের যে কোনো ধরনের কাজ বা ইচ্ছাকে নৈতিকতা সমর্থন করে না, বরং নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে যেমন মানুষের আচরণের মুল্যায়ন প্রয়োজন তেমন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের প্রতি মানুষের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করাটাও এখন জরুরি হয়ে

পড়েছে। সুতরাং যেকোনো অসামাজিক কার্যকলাপ, যেমন, চুরি-ছিনতাই, খুন-রাহাজানি প্রভৃতি শুধু অন্যায় নয়, প্রকৃতির প্রতি ধ্বংসমূলক আচরণও অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

৩.৩ ভূমি পিরামিড

লিওপোল্ড তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধে ভূমির গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীব পিরামিডের আলোচনা করেন।[৯] ভূমির উপর অস্তিত্বশীল অমানব সত্তাসমূহের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান যাকে খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। ভূমিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এ সকল অমানব সত্তাকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে পিরামিডের সাথে তুলনা করে লিওপোল্ড এর নামকরণ করেন জীব পিরামিড। কখনো কখনো তিনি জীব পিরামিড শব্দটির পরিবর্তে ভূমি পিরামিড শব্দটিও ব্যবহার করেন এবং জীব পিরামিডকে ভূমির প্রতীক হিসেবে গণ্য করেন।[১০]

সমাজজীবনে মানুষ যেমন একে অপরের সাহচর্যে বেঁচে থাকে তেমন বাস্তুতন্ত্রের অমানব সত্তাসমূহও একে অন্যের নির্ভরশীলতায় বাঁচে। এভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে যখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবমণ্ডলের সত্তাগুলোর সমন্বয়ে একটি একক গড়ে ওঠে তখন তাকে জীবগোষ্ঠী (community) বলা হয়। জীবগোষ্ঠীর অর্ন্তগত সত্তাগুলো শৃঙ্খলার সাথে অবস্থান করে। মানুষ, অমানব প্রাণি ও উদ্ভিদসমূহের সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল কিন্তু জটিল তন্ত্রই হলো জীবগোষ্ঠী। জীবগোষ্ঠী ও এর আশপাশের অজৈব উপাদানগুলোর সমন্বিত অবস্থানকে বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) বলা হয়। বাস্তুতন্ত্রের আলোচনায় আমরা দেখি জীবগোষ্ঠী, মাটি, পানি ও বাতাসের মত অজৈব ও জৈব উপাদানসমূহের জটিল ও আন্তঃসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এই জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে মিথষ্ক্রিয়া বলা হয়। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর্থার ট্যান্সলী প্রথম মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানগুলোর সমন্বয়ের ফলে বাস্তুতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বাস্তুতন্ত্রে জীবগোষ্ঠী যেমন একদিকে অজৈব উপাদানসমূহ দ্বারা প্রভাবিত, অন্যদিকে তেমন অজৈব উপাদানগুলোকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং বলা যায়, মিথষ্ক্রিয়া একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। কোনো কারণে যদি এই প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।[১১] বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে জীবমণ্ডলের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

জীবগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে ট্যান্সলীর ধারণাকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন আমেরিকান জীববিজ্ঞানী ইউজিন ওডাম।[১২] ওডাম দেখান যে, বাস্তুতন্ত্রের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যেকার জটিল ও আন্তঃসম্পর্কের কারণে অবিরাম শক্তিপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং পুষ্টির আবর্তন ঘটে। তাঁর মতে, যখন কোনো একটি জীবগোষ্ঠীর এর ভৌত পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ঘটে তখন সেখানে শক্তিপ্রবাহের উদ্ভব ও আবর্তন ঘটে এবং পুষ্টির আদান-প্রদান হয়। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেই এর ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে। এজন্য বাস্তুতন্ত্রকে আমরা এমন একটা তন্ত্র হিসেবে অভিহিত করতে পারি যার স্ব-অস্তিত্ব (self-sustainability) রক্ষা ও স্ব-নিয়ন্ত্রণ (self-regulatory) করার ক্ষমতা রয়েছে।[১৩]

ট্যান্সলি ও ওডাম যেভাবে বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেন তাতে বাস্তুতন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে পিরামিডের সাথে তুলনা করে একে বাস্তুবিদ্যক পিরামিড বলে অভিহিত করা যায়। কারণ সাধারণত দেখা যায় বাস্তুতন্ত্রে একটি খাদ্যস্তর থেকে অপর খাদ্যস্তরে শক্তি স্থানান্তরিত হওয়ার সময় কিছু পরিমাণ শক্তি তাপশক্তি রূপে পরিবেশে ফিরে যাওয়ার কারণে পরবর্তী খাদ্যস্তরে মোট শক্তির পরিমাণ কমে যায়। নিম্ন খাদ্যস্তর থেকে উচ্চ খাদ্যস্তর পর্যন্ত জীবের সংখ্যা, ভর এবং স্থানান্তরিত শক্তিকে পরপর সাজালে যে শঙ্কু আকৃতির চিত্র পাওয়া যায় তাকে খাদ্য পিরামিড বা বাস্তুবিদ্যক পিরামিড বলা হয়। লিওপোল্ড এ ধরনের পিরামিডকে জীব পিরামিড বা ভূমি পিরামিড নামে নামকরণ করেন।

জীব পিরামিডের আলোচনায় লিওপোল্ড ভূমিকে এই পিরামিডের প্রাণ বা ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন, যার উপরে রয়েছে তৃণভোজী ও মাংসাশী জীবের বিভিন্ন স্তর। জীব পিরামিডের জীবসমূহের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান তার উপর ভিত্তি করে পিরামিডের বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে শক্তিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলের[১৪] মাধ্যমে এই শক্তিপ্রবাহ জীব পিরামিডের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।[১৫] জীব পিরামিডের সবগুলো স্তরের মধ্যে সবচেয়ে নিচের স্তরে রয়েছে ভূমি বা মাটি এবং পর্যায়ক্রমে ভূমির উপরের স্তরগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, তৃণভোজী প্রাণি এবং মাংসাশী প্রাণি। জীব পিরামিডের বিভিন্ন স্তরের সত্তাসমূহ নিজেদের অস্তিত্বের জন্য খাদ্য-শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীল।

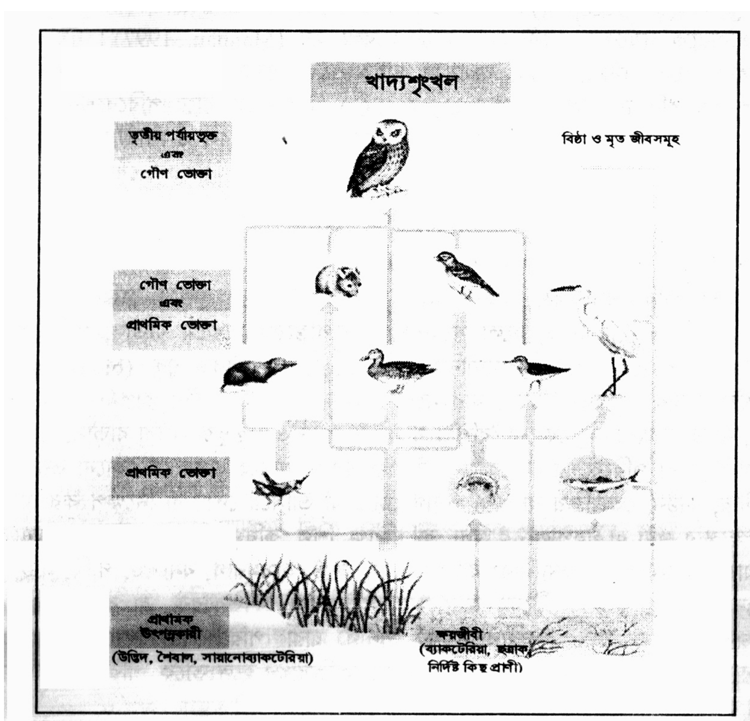

খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত উৎপন্নকারী, ভোক্তা ও ক্ষয়কারী।
দেখুন, অরুণ কুমার লাহিড়ী, *পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৩

লিওপোল্ড বলেন, এক সময় আমেরিকাতে খাদ্য-শৃঙ্খলকে ব্যাখ্যা করা হতো মৃত্তিকা-ওক-হরিণ-ইন্ডিয়ান এভাবে স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে; কিন্তু খাদ্য-শৃঙ্খলের রূপ সব সময় এক রকম থাকে না, পরিবর্তিত

হয়। এখন দেখা যায় ওক ছাড়াও হরিণ অন্য গাছপালাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে, কারণ ওক ছাড়াও এখন মাটির উপর অনেক ভূট্টা জাতীয় শস্য রয়েছে, হরিণ ছাড়াও আছে গরু এবং ইন্ডিয়ানের স্থলে আছে কৃষক।[১৬] লিওপোল্ড জীব পিরামিডকে একটি জটিল শৃঙ্খলের জট বলে অভিহিত করেন যাকে আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল মনে হলেও সিস্টেমের স্থিতিশীলতা একে একটি অত্যন্ত সংগঠিত কাঠামো বলে প্রমাণ করে। এর কার্যকারিতা এর বিভিন্ন অংশের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। উল্লেখিত উদাহরণের মাধ্যমে লিওপোল্ড বোঝাতে চেয়েছেন যে, অজৈব উপাদান অর্থাৎ ভূমির উপরেই উদ্ভিদের জন্ম হয় ও বিকাশ ঘটে। আবার বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের অমানব প্রাণিসমূহ বেড়ে ওঠে। ভূমি থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভিদ যেমন বেঁচে থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমন তৃণভোজী প্রাণি বা সাকাশী প্রাণি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে। কীট-পতঙ্গভুক ও মাংসাশী প্রাণীরাও উদ্ভিদ ও প্রাণি ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে, উল্লেখিত খাদ্য-শৃঙ্খলে ভূমির গুরুত্ব কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, ভূমির গুরুত্ব এখানে যে উদ্ভিদ প্রথমে ভূমি থেকে খাদ্য তৈরির মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহের (energy circuit)[১৭] সৃষ্টি করে এবং এই শক্তিপ্রবাহ খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়ে অন্যান্য সত্তাসমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ভূমিই হলো জীব পিরামিডের ভিত্তি বা প্রাণ যার উপর নির্ভর করে সমগ্র জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকে থাকে।

৩.৪ ভূমি পিরামিডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

লিওপোল্ডের ভূমি পিরামিডে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়[১৮] লক্ষণীয়:

১) ভূমি বলতে 'মৃত্তিকা' বোঝায় না, ভূমি হলো জীব পিরামিডের সকল স্তরের মূল ভিত্তি বা প্রাণের ভিত্তি। সাধারণভাবে ভূমি বলতে আমরা মাটিকে বুঝে থাকি। কিন্তু লিওপোল্ড ভূমিকে জীব পিরামিডের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, যার উপর নির্ভর করে জীব পিরামিডের সমগ্র জীবগোষ্ঠী অস্তিত্বশীল হয়; ২) দেশজ উদ্ভিদ ও প্রাণি জীব পিরামিডের শক্তিপ্রবাহকে অবাধ রাখে; ৩) প্রকৃতিজগতে মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবর্তন ভিন্ন ধরনের, এ পরিবর্তন অনিচ্ছাকৃত ও অভাবনীয় রূপ ধারণ করতে পারে।

উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের প্রথমটি নিয়ে আর কোনো বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, কারণ জীবগোষ্ঠী বা বাস্তুতন্ত্রের গঠনতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভূমির গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য একথা পূর্বের আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় নিয়ে লিওপোল্ড নিজে যেমন উদ্বিগ্ন ছিলেন, তেমন তাঁর সমগ্র আলোচনা এ দুটি দিক নিয়ে আমাদেরকেও বার বার ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

লিওপোল্ডের জীব পিরামিডের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, জীব পিরামিডের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত উদ্ভিদসমূহ মাটি থেকে পুষ্টি সরবরাহ করে নিজেদের খাদ্য তৈরি করার পাশাপাশি যে শক্তিপ্রবাহ সৃষ্টি করে সেটা খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে অন্যান্য স্তরে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ জীব পিরামিডের প্রথম স্তরের ভূমির মতো দ্বিতীয় স্তরের উদ্ভিদসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব জীব পিরামিডে একই ধরনের উদ্ভিদের আর্বিভাব ঘটে না। কারণ এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে জীবমণ্ডল গঠিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং এই উদ্ভিদসমূহের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই অমানব প্রাণির জীবন আবর্তিত হয়। এজন্য লিওপোল্ড বনায়ন কার্যক্রমে দেশজ

উদ্ভিদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যখন কোনো স্থানে বনায়ন কার্যক্রম প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তখন ঐ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত পরিবেশ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ ভূমি বা অজৈব উপাদান থেকে খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে উদ্ভিদশ্রেণির বৃদ্ধি ঘটে এবং এ উদ্ভিদশ্রেণির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রজাতির অমানব প্রাণি বিস্তার লাভ করে।

বনায়ন কার্যক্রমে যদি বেশি করে দেশজ বৃক্ষ রোপন করা হয় তাহলে বছরের পর বছর ধরে যে কোনো দেশের জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেক সময় দেখা যায় সৌন্দর্যবর্ধন বা বেশি ফলনের আশায় বিদেশী জাতের বৃক্ষ রোপন করা হয়। এতে যেমন পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়, তেমন জীব-বৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়ে। বনায়ন কার্যক্রম ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে যে বন গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক বন বলা হয়। যেমন, সুন্দরবন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বন হিসেবে স্বীকৃত। সুন্দরবন ছাড়াও পার্বত্য চট্রগ্রাম ও মধুপুর অঞ্চলের বনও এক সময় প্রাকৃতিক বন হিসেবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু এসব অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন ও শিল্প বনায়নের নামে কৃত্রিম বনের সৃষ্টি হয়েছে। কৃত্রিম বনায়ন প্রাকৃতিক বননির্ভর জীব-বৈচিত্র্যকে বিলীনের পথে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশেও কৃত্রিম বনায়ন প্রক্রিয়ায় দেশজ প্রজাতির বৃক্ষের স্থলে বিদেশি প্রজাতির বৃক্ষায়ন ঘটায় প্রাকৃতিক অরণ্যের জীব-বৈচিত্র্য ও বৃক্ষরাজি বিলুপ্তির পথে বলে সমালোচিত হচ্ছে।[১৯] বর্তমানে মধুপুর বন বাণিজ্যিক বনে রুপান্তরিত হয়েছে। বনের জায়গা দখল করে লাগানো হয়েছে নানাধরনের ফলদ বৃক্ষ, প্রায় চার দশক ধরে চাষ করা হচ্ছে রাবার। বন বিভাগ শাল গাছ কেটে লাগিয়েছে বিদেশি প্রজাতির ইউক্যালিপটাস ও আকাশিয়া গাছ। যার ফলে বনের জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমন অমানব বন্য প্রাণির সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় মধুপুর বনাঞ্চল বর্তমানে সংকটাপন্ন অবস্থায় টিকে আছে।

সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন[২০] থেকে জানা যায়, আমাদের দেশের অনেক দেশীয় উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে। ইতিমধ্যে সাত প্রজাতির উদ্ভিদ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীব-বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ভিদ নিয়ে দেশের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের করা একটি জরিপে বিষয়টি উঠে এসেছে। বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর ওপর জরিপ চালিয়ে একটি লাল তালিকা বা রেড লিস্ট করার উদ্যোগ নেয় প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থা আইইউসিএন। সে লাল তালিকা প্রণয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশের চারজন জ্যেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এর আগে দেশে একাধিকবার প্রাণির লাল তালিকা তৈরি হলেও উদ্ভিদের তালিকা এই প্রথম প্রকাশ করা হলো। জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৩৯ শতাংশ উদ্ভিদই কোনো-না-কোনোভাবে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে বা বিপদাপন্ন। পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ গত ১০০ বছরের মধ্যে দেশের আর কোথাও দেখা যায়নি এমন উদ্ভিদ হচ্ছে সাতটি- ফিতাচাঁপা, কুড়াজিরি, ভানু দেয়পাত, গোলা অঞ্জন, সাত সারিলা, থার্মা জাম ও মাইট্রাসিস। মহাবিপন্ন আছে বাঁশপাতা, বনখেজুর, বালবোরক্স, লম্বা ট্রায়াস অর্কিড ও বলগাছ। অল্প কিছু জায়গায় উদ্ভিদের এ প্রজাতিগুলো আছে। সংরক্ষণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ না নিলে সেগুলোও দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া জরিপে ১২৭টি বিপন্ন, ২৬২টি সংকটাপন্ন, ৬৯টি প্রায় সংকটাপন্ন, ২৭১টি উদ্ভিদ পরিবেশে ভালোমতো টিকে আছে এবং ২৫৮টি উদ্ভিদ প্রজাতির ব্যাপারে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

উদ্ভিদের প্রজাতি সংরক্ষণবিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের[২১] হিসাবে, দেশে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উদ্ভিদের প্রজাতি ছিল ৩ হাজার ৮৪০টি। যদিও পরে আরও ১০টি উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়। আইইউসিএন এক হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির ওপর তাদের জরিপটি চালায়। এতেই এই ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। বাকি ২ হাজার ৮৫০টি উদ্ভিদের কী অবস্থা, আমরা তা জানি না।[২২] সেগুলো নিয়েও জরিপ চালানো জরুরি হয়ে পড়েছে। সেটি করতে আমাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত। এর আগে মহাবিপন্ন প্রাণি ঘোষিত বাঘ, শকুন বা ঘড়িয়াল নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ায় প্রাণীগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেগুলো বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি কমেছে। আশা করা যায়, মহাবিপন্ন, বিপন্ন ও সংকটাপন্ন উদ্ভিদগুলোর রক্ষায়ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর জন্য সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন জনসচেতনতাও আবশ্যক। কারণ দেশীয় উদ্ভিদসমূহ কোনো- না-কোনোভাবে আমাদের নানা উপকারে আসে। এগুলো আমাদের বাস্তুতন্ত্র ও জীব-বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং কৃষিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য আমাদের অজান্তেই অনেক ধরনের উদ্ভিদ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এজন্য বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদসমূহকে সংরক্ষণের জন্য এগুলোকে বনায়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির সংকটাপন্ন উদ্ভিদকে সংরক্ষণের জন্য যদি বিদ্যমান আইন ও প্রবিধানমালার যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে তা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ১৪ মে, ২০২৩-এ বন অধিদপ্তরে আয়োজিত 'ফাইনাল ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ অন ন্যাশনাল রেড লিস্ট অব প্লান্টস' শীর্ষক কর্মশালার প্রধান অথিতির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ (সংকটাপন্ন উদ্ভিদের লাল তালিকা প্রণয়ন) গ্রহণ করা হলো, সেটি আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও এটি জীব-বৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন এবং সিআইটিইএস[২৩] রিপোর্টিং-এ সহায়তা করবে।

যেকোনো দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণের সাথে অমানব প্রাণি সংরক্ষণের বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, কারণ অধিকাংশ অমানব প্রাণির আবাসস্থল হলো বনভূমি। বলা যায়, বনভূমি এবং বনভূমির বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ হলো বন্য অমানব প্রাণির অভয়ারণ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বিচারে বনভূমি উজাড় করা ও গাছপালা কাটার কারণে বন্য অমানব প্রাণির আবাসস্থল ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং এ সকল অমানব সত্তার অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বনভূমি ও গাছের সংকটের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব অমানব বন্য প্রাণির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন তার একটা চিত্র তুলে ধরা যাক। একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে ছিল ধনেশের (শক্ত ও লম্বা বাঁকানো ঠোঁটওয়ালা পাখি) উপস্থিতি, কিন্তু এখন আর তেমন দেখা যায় না। ২০২১ সালের বর্ষাকালে রাঙামাটির কাসালং বনে একসাথে ১৫-২০টি ধনেশকে উড়ে যেতে দেখা যায়। দেশের সবচেয়ে গহীন অঞ্চল হিসেবে কাসালং বন পরিচিত, বনের সারি সারি উঁচু বুনো ফলের গাছগুলোতেই ধনেশের আনাগোনো বা বসবাস। কাসালং বন ও সাঙ্গু-মাতামুহুরীর বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্যে এখনো ধনেশের দেখা মেলে তবে আগের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। খাবার হিসেবে পাকা ডুমুর ধনেশের খুব পছন্দ। বাংলাদেশের বুনো পাখির মধ্যে রাজধনেশই সবচেয়ে বড় পাখি, কিন্তু বাহারি ঠোঁটের এ পাখি প্রজাতিটি শুধুমাত্র গাছের অভাবে বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[২৪]

বিলুপ্তির সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা বানরগোত্রীর প্রাণির (প্রাইমেট) একটি বৈশ্বিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশে থাকা উল্লুক (Western Hoolock Gibbon) ও চশমাপরা হনুমান (Phayre's Langur)। 'প্রাইমেটস ইন পেরিল : দ্য ওয়ার্ল্ডস টুয়েন্টিফাইভ মোস্ট এনডেঞ্জারড প্রাইমেটস' (২০২৩-২৫) শীর্ষক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি (১২তম সংস্করণ) ২০২৫ সালের ৮মে প্রকাশিত হয়েছে। এটি যৌথভাবে প্রকাশ করেছে প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএনের স্পিশিজ সারভাইভাল কমিশনের (আইইউসিএন-এসএসসি) প্রাইমেট স্পেশালিস্ট গ্রুপ (পিএসজি), প্রকৃতি সংরক্ষণ-পুনরুদ্ধারে কাজ করা সংস্থা রি-ওয়াইল্ড ও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইমেটোলজিক্যাল সোসাইটি (আইপিএস)।[২৫]

বাংলাদেশে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা এ দুটি প্রাণিকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণায় অর্থায়ন ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণের একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের সীমান্তবর্তী বনাঞ্চলে এই প্রজাতিগুলোর টিকে থাকার জন্য ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমন্বিতভাবে সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। উক্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চশমাপরা হনুমানের বিস্তার বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলে সীমিত হয়ে পড়েছে। প্রজাতিটির সঠিক সংখ্যার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, গত তিন প্রজন্মে প্রজাতিটির সংখ্যা ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। বাংলাদেশ ও ভারতে শিকারসহ বাসস্থান ধ্বংসের কারণে এই প্রজাতির অনেকগুলো ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ ছাড়া পাচার, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া ও সড়কে মারা যাওয়ার কারণে এই প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। প্রজাতিটি দুই দশক ধরে আইইউসিএনের বিপন্ন প্রজাতির লাল তালিকায় রয়েছে।[২৬]

২০২৫ সালে জার্মান প্রাইমেট সেন্টার পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সিলেটের বনাঞ্চলে মাত্র ৪৮৪টি চশমাপরা হনুমানের অস্তিত্ব রয়েছে। হবিগঞ্জের সাতছড়ি, রেমা-কালেঙ্গা এবং মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া, আদমপুর, পাথারিয়া ও সাগরনাল বনে এসব হনুমান টিকে আছে। 'প্রাইমেটস ইন পেরিল' শীর্ষক প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল (আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম), মিয়ানমারের ইরাবতী ও চিন্দুইন নদীর পশ্চিম অঞ্চলে উল্লুক দেখা যায়। আবাসস্থল ক্রমাগত ধ্বংস হওয়া, শিকার ও চোরাচালান এই প্রাণির অস্তিত্বের জন্য প্রধান হুমকি।[২৭]

উল্লুক বনের একটি স্তন্যপায়ী প্রাণি। এরা উঁচু গাছের ওপরের ডালে বাস করে, কখনো নিচে নামে না। চাপালিশ, বনডুমুর, বনকাঁঠাল, বনজাম আর বট তাদের প্রিয় গাছ। মৌলভীবাজার জেলার লাওয়াছড়া উদ্যানে এ ধরনের গাছের সংখ্যা বেশি থাকায় উল্লুকের উপস্থিতি এখানে বেশ ভালো। কিন্তু অন্য বনগুলোতে উঁচু গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এদের বিচরণ এলাকা সংকুচিত হয়ে এসেছে। কমতে কমতে উল্লুকের সংখ্যাও নেমে এসেছে পাঁচশোর নিচে।[২৮] অন্যদিকে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলে রয়েছে হিজল, করচ এবং বরুন গাছসহ আরোও নানা প্রজাতির গাছ। এই গাছগুলো বর্ষায় পানির নিচে ডুবে থাকলেও শীতে সারি সারি গাছ মাথা উঁচু করে আবার জেগে ওঠে। শীতে বাংলাদেশে যেসব অতিথি পাখির আগমন ঘটে তার মধ্যে কুড়া ইগল অন্যতম।

মিঠাপানির জলার এসব গাছে বাসা বানায় কুড়া ইগলসহ অন্যান্য পরিযায়ী পাখিরা। কিন্তু মিঠাপানির এসব গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়ায় প্রতিবছর সংকটের মুখে পড়ছে বাংলাদেশে আসা অতিথি পাখিরা।

বাংলাদেশের বনগুলোতে টিকে আছে প্রায় আড়াই'শ হাতি। বনের ভেতর বাঁশ, ফুলঝাড়ু, ছোট লতাগুল্ম, কলাগাছ, ঘাস আর গাছের বাকল হাতির খুব প্রিয়। এসব গাছ এখন কমে যাওয়ায় হাতির খাবারে টান পড়েছে। বনের ভেতর তাদের খাবার না থাকায় হাতি এখন লোকালয়ে চলে আসছে। মুখ দিচ্ছে ফসলি জমিতে, যার ফলে দ্বন্দ্ব বাড়ছে মানুষ ও হাতির। এছাড়া বাংলার শকুনেরও প্রিয় কিছু গাছ আছে। সাধারণত উঁচু এবং পাতাশূণ্য গাছে শকুন বিশ্রাম নিতে ভালোবাসে। এজন্য প্রায় সময় বড় শিমুল গাছে বসে শকুনকে বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার[২৯] গবেষণায় উঠে এসেছে বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়েকটি শকুন টিকে আছে, সেগুলো বিশ্রাম ও বাসা বানানোর জন্য চার জাতের গাছ পছন্দ করে- গর্জন, বনাক, শিমুল ও জাম। সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের পাশাপাশি অন্যান্য গাছেও সম্প্রতি এদের বাসা বানানোর তথ্য আছে।

বাবুই পাখিসহ বেশ কয়েক জাতের পাখি বাসা বানানোর জন্য তালগাছ পছন্দ করে। বাবুইয়ের বাসা বোনা প্রাণিজগতের এক অনন্য উদাহরণ। কিন্তু বাবুই পাখি বাসা বানানোর প্রধান বৃক্ষ তালগাছও গ্রামীণ জনপদ থেকে কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাঁশঝাড় পছন্দ প্যাঁচার, মোটুসির পছন্দ ফুলগাছ, কালেম আর দলপিপির পছন্দ নলখাগড়া।[৩০] দেশের সংকটাপন্ন প্রাণির মধ্যে অন্যতম লজ্জাবতী বানর। সিলেট ও চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চলের বাসিন্দা এরা। তবে এদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। বনজঙ্গল উজার হয়ে যাওয়া ও জনবসতি বেড়ে যাওয়ার কারণে এ প্রাণির আবাসস্থলও কমে যাচ্ছে।[৩১] অর্থাৎ গ্রামীণ জনপদ বা গহীন বন, সব জায়গায় বন্য প্রাণিদের প্রিয় গাছগুলো দিন দিন বিপজ্জনক হারে কমছে। কিন্তু অমানব প্রাণির টিকে থাকা অনেকটাই নির্ভর করে তাদের আবাসস্থলের ওপর। এজন্য লিওপোল্ড জীব পিরামিডের শক্তি প্রবাহকে অবাধ রাখার জন্য দেশজ উদ্ভিদ ও অমানব প্রাণি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে যদি দেশজ উদ্ভিদ ও অমানব প্রাণি সংরক্ষণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ সকল অমানব সত্তার বিলুপ্তির কারণে দেশের জীব-বৈচিত্র্যে ও জনজীবনে অচিরেই বিপর্যয় নেমে আসবে। এ সংকট মোকাবিলায় মানুষকেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়াও সরকারি জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ, বন্য প্রাণি ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বৃক্ষপ্রেমী-প্রাণিপ্রেমী এবং পরিবেশকর্মীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে দেশজ উদ্ভিদ ও অমানব প্রাণি রক্ষায়।

গাছের সংকটে অমানব প্রাণি

গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কের পক্ষিশালায় একটি রাজধনেশ।
ছবি: প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০২৩

শিমুলগাছে শকুনের ঝাঁক।
ছবি: প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২৩

মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে জামগাছে চশমাপরা হনুমান।
ছবি: প্রথম আলো, ০৬ মে, ২০২৫, পৃ.-১৬

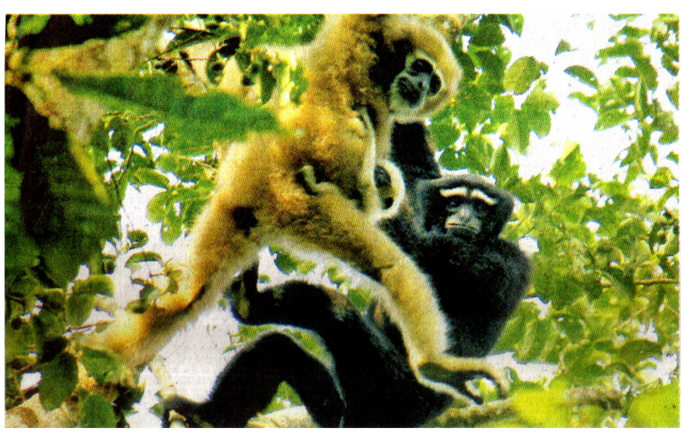

উঁচু গাছের ওপরের ডালে উল্লুক। ছবি: প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২৩

সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সভ্যতা, বড় শহর ও বন্দর নগরীগুলো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ তাদের নানবিধ প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য সমুদ্র, নদী, পাহাড় ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক এ অমানব সত্তাসমূহ ও এর সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে মানবজাতি আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্ট ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সত্তার অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন এবং অনেক প্রাকৃতিক সত্তার বিলুপ্তিও ঘটেছে। যেমন, অতিরিক্ত পরিমাণে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের কারণে সমুদ্র তলদেশের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; নদী দখল, দূষণ, ভরাট ও কৃত্রিমভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হচ্ছে, পাহাড় ও গাছ কেটে জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এমন একদিন আসবে যখন মানবজাতির ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবে যে পরিবর্তন ঘটে তার চেয়ে মনুষ্য সৃষ্ট-পরিবর্তন একেবারে আলাদা। এ পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে প্রকৃতি এক সময় অভাবনীয় রূপ ধারণ করবে বলে লিওপোল্ড মনে করেন। প্রাকৃতিক সত্তা ও বাস্তুতন্ত্রের জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে লিওপোল্ড সংরক্ষণবাদী মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। বাস্তুতন্ত্র ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অমানব সত্তা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যদি লিওপোল্ডের মতো সংরক্ষণবাদী মনোভাবের চর্চা করা হতো, তাহলে বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, ভাওয়াল ও মধুপুর প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল এবং সর্বোপরি বৃক্ষরাজিসহ অমানব প্রাণীকূলে এতো বিপর্যয় নেমে আসতো না।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং ভূমির নৈতিক মূল্য স্বীকার করতে হবে। সাধারণত ভূমিকে মূল্যায়ন করা হয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ লাভ-লোকসানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যেখানে কর্তব্যবোধ অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু যখন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূমিকে মূল্যায়ন করা হবে তখন নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি ভূমির প্রতি গড়ে উঠবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন, "এটা আমার কাছে অচিন্তনীয় মনে হয় যে, ভূমির প্রতি নৈতিক কোনো সম্বন্ধ, ভালোবাসা, সম্মান এবং শ্রদ্ধা ও ভূমির মূল্যের প্রতি উচ্চ বিবেচনা ছাড়া থাকতে পারে। মূল্য বলতে আমি অবশ্যই সাধারণ আর্থিক মূল্যমানের চাইতে ব্যাপক কিছুকে গণ্য করছি; আমি দার্শনিক [স্বতঃমূল্য] অর্থে গণ্য করছি"।[৩২] লিওপোল্ডের এ উক্তি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, তিনি ভূমির নৈতিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ভূমির সাথে নৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ভূমিকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা এবং এর মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ বলে মনে করেন।

লিওপোল্ড ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধটি শুরু করেন একটি গল্প দিয়ে। গ্রীসের রাজা ওডিসিয়াস যখন ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাঁর বাড়ির এক ডজন দাসীকে এক দড়িতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি সন্দেহ করেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তারা খারাপ আচরণ করেছিলো। এই ফাঁসির ঘটনায় কোনো ন্যায়ের প্রশ্ন ছিল না। এই মেয়েগুলো দাসী হওয়ায় তারা ছিল ওডিসিয়াসের সম্পত্তি। বর্তমানের মতো তৎকালীন সময়েও সম্পত্তিকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করাও ক্ষমতার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো, সঠিক এবং ভুলের নয়।[৩৩] প্রাচীন গ্রীসে অন্যান্য বস্তুগত সম্পত্তির মতো দাস বা দাসীরও বেচাকেনা হতো, মানুষ হিসেবে তাদের স্বতঃমূল্য স্বীকার না করার কারণে তাদের মালিক তাদেরকে সম্পত্তি হিসেবে

বিবেচনা করে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারতো। এক্ষেত্রে মালিকদের সাথে তাদের কোনো নীতিগত সম্পর্ক ছিল না। এই গল্পের মাধ্যমে লিওপোল্ড আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত ভূমি এবং এর উপর বেড়ে ওঠা প্রাণি ও উদ্ভিদ অর্থাৎ অমানব সত্তাসমূহের সাথে মানুষেরও কোনো নীতিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন, ওডিসিয়াসের ক্রীতদাসীদের মতো ভূমি এখনো সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত।[৩৪] ভূমির স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হয় না বলে ভূমি এবং ভূমির উপর বেড়ে ওঠা অমানব সত্তাসমূহকেও সম্পত্তি মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেমন সকল মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলা হয়, ভূমি এবং সকল অমানব সত্তাকেও সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করে মানুষের সাথে এদের নীতিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরী।

লিওপোল্ড মনে করেন ভূমিনীতির বিবর্তনে সবচেয়ে গুরুতর বাধা হলো আমাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ভূমির তীব্র চেতনার দিকে না গিয়ে বরং দূরে চলে যাচ্ছে এবং বাস্তবে এর সত্যতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাস্তুবিদ্যাসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমে বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণাকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়না। লিওপোল্ডের মতে অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অনেক উচ্চশিক্ষা পরিবেশগত ধারণা এড়িয়ে যায়। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে ভূমির বিপন্ন অবস্থার জন্য লিওপোল্ড শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করলেও বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থাও এর জন্য কম দায়ী নয়। দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুকে অর্থনৈতিক মূল্যে মূল্যায়ন করার কারণে ভূমির নৈতিক মূল্যায়নের প্রতি মানুষের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। লিওপোল্ড বলেন, এ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য ভূমি ব্যবহারকে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে গণ্য না করে নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যে গণ্য করা উচিত। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, নান্দনিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই। যদি সকল সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে অর্থনৈতিক দিক থেকেই সমাধান করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরও নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য সমস্যাগুলোকে সবসময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে সমাধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। ভূমির সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলোকে লিওপোল্ড নৈতিক ও নান্দনিক দিক থেকে সমাধান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কারণ একদিকে নৈতিকতা যেমন ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে অনুপ্রাণিত করে তেমন নান্দনিকতা নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। লিওপোল্ডের মতে কেবলমাত্র নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমেই ভূমিকে বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। লিওপোল্ড একটি নীতির মাধ্যমে ভূমির প্রতি তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। নীতিটি হলো–''জীবজগতের অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখে যা তা-ই ন্যায়, এর পক্ষান্তরে করা হবে অন্যায়"।[৩৫]

লিওপোল্ডের উক্ত নীতিকে 'অখণ্ডতার নীতি' বলে অভিহিত করা হয়। এ নীতিকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে যদি জীব পিরামিড বা ভূমি পিরামিড সম্পর্কে লিওপোল্ডের মতামতকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে ভূমি নীতিবিদ্যায় অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাক। সাধারণভাবে মাটি, পানি, বাতাস, দেশজ উদ্ভিদ ও অমানব প্রাণি প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় প্রাকৃতিকভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় গড়ে ওঠে একটি বনাঞ্চল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে

তরান্বিত করার জন্য যদি ঐ এলাকার বিস্তৃত বনাঞ্চলের এক অংশ ধ্বংস করে পোশাক-শিল্প স্থাপন করা হয় তাহলে ঐ বনাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। শিল্প কারখানার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মাটি খননের কারণে প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ঐ অঞ্চলের মাটি বা ভূমি। প্রচুর পরিমাণে দেশজ প্রজাতির গাছ কাটা পড়বে, কিন্তু প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে অমানব প্রাণির আশ্রয়স্থল ও খাদ্যের উৎসস্থল হলো এই গাছ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের অমানব সত্তাসমূহ একটি চক্রাকার সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। বাহ্যিক কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া এ সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় থাকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ।

পোশাক-শিল্প নির্মাণের কারণে যেভাবে ঐ অঞ্চলের অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে সেটা পর্যালোচনা করা যাক। একটি পোশাক-শিল্পে যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো পানি, কারণ স্ক্রোলিং, ব্লিচিং, ডায়িং, ওয়াশিংসহ বিভিন্ন কাজে প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কেমিক্যাল ও ডাই ব্যবহারের কারণে এই ব্যবহৃত পানি তীব্র মাত্রায় দূষিত হয়। পরিশোধন না করেই যদি এ পানি পরিবেশে ফেলা হয় তাহলে দূষিত হবে কৃষি জমিসহ জলাশয়ের পানি। সাধারণত এক কেজি টেক্সটাইল উৎপাদনে প্রায় ১২০ লিটার পরিষ্কার পানি প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এ ধরনের পোশাক-শিল্প থেকে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য বা দূষিত পানি অপরিশোধিত অবস্থায় প্রতিদিন কৃষি-জমি, নদ-নদী বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে। এ দূষিত পানিতে বিদ্যমান কঠিন পদার্থগুলো কৃষি-জমি ও জলাশয়ের তলদেশে গিয়ে সঞ্চিত হবে, ফলে মাটি তার উর্বরতা হারাবে এবং জলজ প্রাণির ক্ষতি সাধিত হবে। আবার যখন এই নদ-নদী বা জলাশয় থেকে কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া হবে তখন ফসল উৎপাদনও ব্যহত হবে। এছাড়াও পোশাক শিল্প থেকে নির্গত দূষিত পানি জলাশয়ের পানিকে ঘোলাটে করে ফেলার কারণে মাছের খাবার ফাইটোপ্লাংকটনের সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। দূষিত পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ একদিকে যেমন পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করবে তেমন উচ্চ পিএইচের মান জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে এবং ক্রেমিয়াম,অ্যানিলিন, সালফাইড জাতীয় পদার্থের আধিক্যের কারণে মাছ ও অন্যান্য অনুজীবের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে এ দূষিত পানি যখন মানব দেহে পৌঁছাবে তখন প্রাণঘাতী, স্নায়বিক রোগ, হৃদরোগ, পেটের পীড়াসহ নানা অসুস্থতা দেখা দেবে। সুতরাং একটি শিল্প-কারখানার নির্মাণ থেকে শুরু করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি পর্যায়েই প্রকৃতি ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ ক্ষতি শুধু প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ধীরে ধীরে তা মানব জাতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

তারপরও বিপুল জনসংখ্যার অসীম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অমানব সত্তাসমূহের সুরক্ষার কথা চিন্তা না করে প্রতিনিয়ত এরকম পরিবেশ ধ্বংসকারী হাজারো শিল্প-কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। লিওপোল্ডের অখণ্ডতা নীতির মর্মার্থ হলো মানুষের যে সকল কার্যকলাপ জীবজগতের অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য বিনষ্ট করে তা অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ বন-জঙ্গল ধ্বংস করে, জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে যত্রতত্র যেভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে তা অবশ্যই অন্যায়।

বিভিন্ন ডাইং কারখানার রাসায়নিকযুক্ত পানি গিয়ে সরাসরি পড়ছে নদীতে। নদীর পানির সঙ্গে মিশে বিনষ্ট হচ্ছে জলজ পরিবেশ। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর, পৃষ্ঠা, ১৮।

উল্লেখিত উদাহরণের আলোকে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার অমানব সত্তাসমূহের শোচনীয় অবস্থার একটা চিত্র বিশ্লেষণ করা যাক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রতি বছর অপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের যত্রতত্র গড়ে তোলা হচ্ছে অসংখ্য শিল্প-কারখানা। এইসব অপরিকল্পিত শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য আমাদের নদী, পানি, মাটি, বাতাস অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য, প্রাণ-প্রকৃতি এবং জনজীবনের জন্য অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ফুলজোর নদের পানি দূষিত হয়ে নদের বিভিন্ন অংশের নানা প্রজাতির মাছ, সাপ, ব্যাঙ, কুঁচিয়া, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুকসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি মরে যাচ্ছে। উক্ত উপজেলার ধানগড়া, রনতিথা, মহেশপুর ও চান্দাইকোনা এলাকার বিভিন্ন বয়সের মানুষ নিজেদের খাওয়ার জন্য এবং গৃহপালিত কুকুর-বিড়াল ও হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানোর জন্য মরা মাছ, শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করার কারণে মানুষসহ ঐসব এলাকার গৃহপালিত পশুরাও বিভিন্ন অসুস্থতাজনিত সমস্যায় ভুগছে। নদের পানির রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় যেসব মানুষ নদটিতে নিয়মিত গোসল করতেন, তারা ভয়ে এখন এই নদে নামতে চান না। গৃহবধুরা তাদের গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য আর পানি সংগ্রহ করেন না। উজানে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার দুটি শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য এই নদে ফেলার কারণে নদের পানি, পার্শ্ববর্তী চাষযোগ্য ভূমি, জীব-বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি ঐ এলাকার জনজীবন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু সিরাজগঞ্জ জেলা নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার অমানব সত্তাসমূহের বর্তমান অবস্থা এমনই। কারণ দেশে অবস্থিত শিল্প-কারখানাগুলোতে বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো তা করে না বা করতে চায় না।[৩৬] ইটিপি (Effluent Treatment Plant) হলো বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ স্থাপনা। শিল্প-কারখানার তরল বর্জ্য পদার্থকে যে প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করে সাধারণ পানির মতো করে পুনঃব্যবহারের উপযোগী করা হয়, যাতে পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে, তাকেই ইটিপি প্লান্ট বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন খরচ বাঁচিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা। আর এ কাজ করতে গিয়ে কারখানাগুলো দেশের জীব-বৈচিত্র্য, প্রাণ-প্রকৃতি ও অমানব সত্তাসমূহের চরম ক্ষতি করছে।

৩.৫ প্রকৃতি একটি সজীব সমগ্র

লিওপোল্ডের মতানুসারে প্রকৃতিকে একটি সজীব-সমগ্রের সাথে তুলনা করা যায়। যেমন, মানুষ হলো একটি সজীব-সমগ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়। মানব শরীরের কোনো একটি অংশে জটিলতা বা সমস্যা দেখা দিলে যেমন সমগ্র মানব শরীরে এর প্রভাব পড়ে, একইভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সত্তা বা উপাদানের সমন্বয় হলো প্রকৃতি। প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের সত্তাগুলো মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো এতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, কোনো একটি স্তরের কোনো একটি সত্তা যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য সকল স্তরের সত্তাসমূহের উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর। কারণ, মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন নিজস্ব কার্যকলাপ রয়েছে তেমন প্রাকৃতিক সত্তাগুলোও নিজস্ব কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঐক্য বজায় রাখে। নৈতিক দিক থেকে যেহেতু প্রকৃতির স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হয়, সেহেতু প্রকৃতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অমানব সত্তাও স্বতন্ত্রভাবে স্বতঃমূল্যের অধিকারী। যে মূল্যের নিজস্ব মূল্য রয়েছে বা নিজের জন্য চাওয়া হয় তাকে স্বতঃমূল্য বলে। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল বা শুভ হলো স্বতঃমূল্য। সত্য সত্য বলেই, সুন্দর সুন্দর বলেই এবং মঙ্গল মঙ্গল বলেই আমাদের কাম্য। সত্য ও সুন্দরের মতো মঙ্গল বা শুভও মানব জীবনের এক পরম আদর্শ এবং এদের সার্থক রূপায়ণেই মানুষের জীবন হতে পারে এক আদর্শ জীবন। এ বিবেচনায় বিভিন্ন প্রজাতির অমানব প্রাণি ও উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, হ্রদ-সমুদ্রসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক সত্তা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। প্রাকৃতিক অমানব সত্তাগুলোও স্বতন্ত্রভাবে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল সকল অমানব সত্তা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান সত্তা এবং এদের নৈতিক অধিকারও রয়েছে।

লিওপোল্ড অনুসারে সমগ্র ভূ–সম্প্রদায়কে আঙ্গিক সমগ্রের (Organic whole) সাথে তুলনা করা যায়। ম্যুর তাঁর *প্রিনসিপিয়া এথিকা* (*Principia Ethica*) গ্রন্থে বলেন, স্বতঃমূল্যের দিক থেকে ভালো বস্তু হচ্ছে আঙ্গিক ঐক্য। একটি আঙ্গিক ঐক্যের সমগ্র তার অংশের সমষ্টি থেকে অধিকতর হয়। ম্যুর আঙ্গিক ঐক্যকে মূল্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন, কারণ তিনি সমগ্র হিসেবে এর সংজ্ঞা দেন, যেখানে সমগ্রের মূল্য তার অংশের মূল্যের সমষ্টিতে কোনো নিয়মিত পরিমাণ বহন করে না। যেমন, মানব শরীর, সামজ ও রাষ্ট্রকে আঙ্গিক ঐক্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, কারণ এগুলো বিভিন্ন অংশের সমষ্টি বা সমন্বয়। প্রকৃতির জীবীয় ও অজীবীয় সত্তাগুলোর সমন্বয়ে সৃষ্ট আঙ্গিক ঐক্যকে প্রকৃতি বা ভূ–সম্প্রদায় বলে। নৈতিক দিক থেকে যেহেতু সমগ্রের স্বতঃমূল্য স্বীকার করা হয়, সেহেতু এর অংশগুলোকেও স্বতঃমূল্যে মূল্যায়ন করা উচিত। নৈতিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক অমানব সত্তাগুলোকে লিওপোল্ড সমগ্রবাদী (holistic) দৃষ্টিতেও মূল্যায়ন করেছেন, এজন্য বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত তাঁর মতবাদকে সমগ্র মতবাদ বা সামগ্রিক মতবাদ (holistic theory) হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়।

সমগ্রবাদ (holism) অনুসারে অংশগুলোর চেয়ে সমগ্রের অগ্রাধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়।[৩৭] অন্যদিকে নৈতিক সমগ্রবাদ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিবর্তে সমগ্রের স্বার্থকে রক্ষা করার উপর জোর দেয়। নৈতিক দিক থেকে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিওপোল্ড বাস্তুতন্ত্রকে কমিউনিটির সাথে অর্থাৎ সমগ্রের সাথে তুলনা করেন। কমিউনিটির সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়াও এক কমিউনিটির সাথে অন্য কমিউনিটির সাংস্কৃতিক, প্রথাগত ঐতিহ্য এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে

সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যে- কোনো কমিউনিটিতে সমগ্রের স্বার্থকে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়। প্রকৃতিতে মানব সম্প্রদায়ের মতো অমানব সত্তাও যেমন পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল তেমন কোনো কোনো সত্তার মাঝে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিদ্যমান। সামগ্রিকভাবে এ সকল সত্তার সমন্বয়ে বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকে থাকে।

৩.৬ বাস্তুতন্ত্রের সমগ্রতা সম্পর্কে কালিকট

লিওপোল্ড যেভাবে বাস্তুতন্ত্রকে আঙ্গিক ঐক্যের ব্যাখ্যার সাথে তুলনা করেছেন এমন একটি ব্যাখ্যা জে.বি. কালিকট তাঁর "Animal Liberation: A Triangular Affair" শীর্ষক প্রবন্ধে উপস্থাপন করেন। তিনি একে তৃতীয় স্তরের আঙ্গিক সমগ্র (third-order organic whole) হিসেবে অভিহিত করেন। কালিকট তাঁর এ প্রবন্ধে লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যাকে সমর্থন করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। কালিকট সাদৃশ্যানুমানের ভিত্তিতে ভূমি নৈতিকতার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করে লিওপোল্ড বর্ণিত ভূমির অখণ্ডতাকে মানব অখণ্ডতার সাথে তুলনা করেন। তাঁর মতে, বায়োটিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশগুলো (স্বতন্ত্র প্রাণি এবং উদ্ভিদ) অর্থনৈতিকভাবে একে অপরের উপর এমনভাবে নির্ভরশীল যেন পুরো ব্যবস্থাটি (system) এর নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। মানব সম্প্রদায়কে যেমন কৃষি, শিল্প, পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ভাগ করা যায়, তেমন বাস্তুশাস্ত্রের বিভিন্ন বায়োমকেও মরুভূমি, সাভানা, জলাভূমি, তুন্দ্রা, বনভূমি এবং আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা যায় ; বিভাজন থাকা সত্ত্বেও সব অংশগুলোই সামগ্রিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কালিকট বলেন, নৈতিক কর্তা হিসেবে আমাদের নিজেদের প্রতি যে কর্তব্যগুলো রয়েছে তা হলো- আত্ম-সংরক্ষণের কর্তব্য, যাকে আমাদের নিজস্ব আঙ্গিক (organic) অখণ্ডতা বজায় রাখার দায়িত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, ভূমি নৈতিকতাও যেহেতু একইভাবে অখন্ডতা রক্ষার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেহেতু জীব সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।[৩৮] সুতরাং বাস্তুতন্ত্রের সমগ্রতা বা অখন্ডতা সম্পর্কিত লিওপোল্ডের মতের সাথে কালিকট একাত্মতা প্রকাশ করেন।

৩.৭ সমালোচনা

ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধে বাস্তুতান্ত্রিক আলেচনা প্রসঙ্গে লিওপোল্ড যে অর্থে সমগ্রবাদের (holism) গুরুত্ব স্বীকার করেন, সে অর্থে অনেকেই লিওপোল্ডের সমগ্রবাদকে পরিবেশগত ফ্যাসিবাদ (environmental fascism) বলে সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে টম রিগান তাঁর *The Case for Animal Rights* গ্রন্থে বলেন, "যে মতকে পরিবেশ ফ্যাসিবাদ বলে আখ্যা দেয়া যায় সেখানে কীভাবে ব্যাক্তি অধিকার সম্বন্ধীয় ধারণা স্থান পাবে তা উপলব্ধি করা কঠিন"।[৩৯] তাঁর মতে অধিকারভিত্তিক পরিবেশগত নীতিবিদ্যার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে নৈতিক অধিকারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকটি প্রাকৃতিক সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়ে। লিওপোল্ডের বাস্তুতান্ত্রিক সমগ্রবাদী মতবাদের নিহিতার্থ হলো বায়োটিক সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা এবং সৌন্দর্যের নামে অর্থাৎ বায়োটিক সম্প্রদায়ের বৃহত্তর ভালোর জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেওয়া। অন্যদিকে লেখক Marti kheel নৈতিক সমগ্রবাদকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী

(totalitarian) বলে অভিহিত করেন এবং দার্শনিক Eric Katz দাবি করেন নৈতিক সমগ্রবাদ ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করে।[৪০]

জন পাসমোর তাঁর *Man's Responsibility for Nature*[৪১] গ্রন্থে যুক্তি দেন যে পরিবেশগত নৈতিকতার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি মনে করেন পরিবেশগত সমস্যাগুলো হলো সামাজিক সমস্যা যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক হিসেবে পাসমোর পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য নীতিবিদ্যার চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পরিবেশগত নৈতিকতার সম্ভাব্য অপব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এই ভেবে যে, পরিবেশগত নৈতিক শিক্ষা ভবিষ্যতে ধর্মীয় শিক্ষাতে পরিণত হতে পারে, যেভাবে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎখাত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত নৈতিক পদক্ষেপ আমাদের বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু দূষণের মতো পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিবিশেষের অবদান এতটাই ন্যূনতম যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত নৈতিক পদক্ষেপ কার্যত অর্থহীন।

লিওপোল্ডের অখন্ডতা নীতির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক অনুপপত্তির (naturalistic fallacy) অভিযোগ আনা যায়।[৪২] প্রাকৃতিক অনুপপত্তি অনুসারে মূল্য সম্পর্কিত অবধারণ কখনো ঘটনা বা তথ্য থেকে অনুসৃত হতে পারে না, কারণ তথ্যমূলক অবধারণ ও মূল্যায়নমূলক অবধারণ পরস্পর থেকে আলাদা ও পৃথক। যৌক্তিকভাবেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম আঠারো শতকে তাঁর *অ্যা ট্রিটিজ অব হিউম্যান ন্যাচার* (*A treatise of Human Nature)* গ্রন্থে প্রথম ঘটনা বা তথ্য থেকে মূল্যায়নমূলক অবধারণের অনুসৃতি প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৪৩] হিউম দাবি করেন যে, 'হয়' বা 'ঘটনা' (fact) এবং 'উচিত' (ought) দুটি পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয়। সাধারণভাবে 'হয়' দ্বারা বর্ণনামূলক বা ঘটনামূলক কোনো কিছুকে বুঝায়। হিউমের মতে, ঘটনামূলক অবধারণ ও মূল্যায়নমূলক অবধারণ পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় একটি থেকে অপরটি অনুসৃত হওয়া সম্ভব না। নীতিবিদ্যায় এ দুটি পদের (হয় ও উচিত) অর্থের স্বাতন্ত্র স্পষ্ট না হওয়ার কারণে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি অনুসৃত হয় বলে অনেক দার্শনিক মত প্রকাশ করে থাকেন। পরবর্তীতে (বিংশ শতাব্দীতে) জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুর 'হয়' ও 'ঔচিত্যের' মধ্যেকার পার্থক্যকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। ম্যুরের মতে 'হয়' প্রাকৃতিক গুণ। প্রাকৃতিক গুণ হলো এমন যা কালে অবস্থিত বস্তুসমূহের গুণবিশেষ এবং যে গুণগুলো নিজেরাও কালের মধ্যে অবস্থান করে। যেমন- লাল, সাদা, কালো, মিষ্টতা, লবনাক্ততা, জীবন উৎপাদনকারী অথবা সুখ উৎপাদনকারী ইত্যাদি। অন্যদিকে 'উচিত' হলো অপ্রাকৃতিক গুণ, এবং এ ধরনের গুণগুলো যেমন কালে অবস্থান করে না তেমন বস্তুসমূহের মধ্যেও অস্তিত্বশীল থাকে না। যেমন- ঔচিত্য, ভালোত্ব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যখনই মূল্য সম্পর্কিত অবধারণ তথ্যমূলক অবধারণ থেকে অনুসৃত হয় তখন যে অনুপপত্তি সংঘটিত হয় তাকে প্রাকৃতিক অনুপপত্তি বলে। জারডিন্স বলেন, লিওপোল্ডের বিখ্যাত নীতি বাক্যটি (জীব জগতের অখন্ডতা, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখে যা তা-ই ন্যায়, এর পক্ষান্তরে করা হবে অন্যায়) ঠিক এই ধরনের যুক্তির উদাহরণ বলে মনে হয়। কারণ লিওপোল্ড এখানে বাস্তুশাস্ত্রের তথ্য থেকে নীতিশাস্ত্রের মূল্যবোধে উপনীত হয়েছেন।[৪৪] ম্যুর অনুসারে বলা যায়, জীব জগতের অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব, ঐক্য ও সৌন্দর্য সংক্রান্ত বচন বা বাক্য হলো প্রাকৃতিক বাক্য (fact statement), অন্যদিকে ন্যায়ত্ব ও অন্যায়ত্ব সংক্রান্ত বাক্য হলো ঔচিত্যমূলক বাক্য (ought

statement)। কিন্তু লিওপোল্ড তাঁর অখণ্ডতার নীতিতে প্রাকৃতিক বা তথ্যমূলক অবধারণ থেকে ঔচিত্যমূলক বা মূল্যায়নমূলক অবধারণে উপনীত হওয়ায় এ নীতির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক অনুপপত্তির অভিযোগ আনা হয়।

জারডিন্স বলেন আমরা যদি লিওপোল্ড অনুসারে বায়োটিক সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক (right) এবং ভুলকে (wrong) সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে মনে হয় ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র অধিকারকে খর্ব করা হয়। কারণ লিওপোল্ড বায়োটিক সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা এবং সৌন্দর্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে প্রাণি শিকারকে উৎসাহিত করেন।[৪৫] তিনি প্রাণির মতো মানুষকেও কমিউনিটির একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে- বাস্তুতন্ত্রের অখণ্ডতা ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণের জন্য তাহলে কি মানুষ শিকার বা হত্যা করা অনুমোদনযোগ্য? অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কমিউনিটির অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ও বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিসত্তাকে বর্জন করার ইঙ্গিত রয়েছে লিওপোল্ডের সমগ্রবাদে।

লিওপোল্ডের সমগ্রবাদ সমালোচনা করে তাঁর মতবাদকে মানববিদ্বেষকেন্দ্রিক (miss-anthropocentric)[৪৬] বলে অভিহিত করা হয়। কারণ জীবীয় সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যকে লিওপোল্ড নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। এ অখণ্ডতা বিনষ্টকারী যে-কোনো প্রজাতির উদ্ভিদকে কর্তন করা, প্রাণিকে হত্যা করা, এমনকি মানুষকে হত্যার অনুমোদনের ইঙ্গিতও রয়েছে লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যায়। কোনো অঞ্চলের স্থায়িত্বের মানদণ্ডে সে অঞ্চলের স্থায়িত্ব বিনষ্টকারী মানুষ বা প্রাণিকে হত্যার অনুমোদন দেয় ভূমি নীতিবিদ্যা। যেমন- সাধারণভাবে যদি কোনো একটি অঞ্চলের স্থায়িত্ব একশ বছর হয়, তাহলে এ অঞ্চলের সকল মানুষকে হত্যা করা হলে স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের স্থায়িত্ব দ্বিগুণ হবে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে লিওপোল্ডের ভূমি নৈতিকতা সেই অঞ্চলের সকল মানুষকে হত্যা করার অনুমোদন দেয়। এজন্য লিওপোল্ডের সমগ্রবাদের বিরুদ্ধে মানববিদ্বেষকেন্দ্রিক অভিযোগ তোলা হয়।

লিওপোল্ড বর্ণিত সমগ্রবাদের এ ধরনের সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ লিওপোল্ড জীবীয় সম্প্রদায়ের 'অখণ্ডতাকে' তাঁর ভূমি নীতিবিদ্যার মানদণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলেও একমাত্র উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেননি। কোনো অঞ্চলের সকল মানুষকে হত্যা করলেই যে সে অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের অখণ্ডতা দীর্ঘদিন রক্ষা করা যাবে এ কথা বলা যায় না। তাঁর মতবাদে নীতিগতভাবে মানুষ ও পশু হত্যা অনুমোদনের ইঙ্গিত থাকলেও তিনি তাঁর আলোচনায় কোথাও সরাসরি মানুষ বা পশু হত্যাকে উৎসাহিত করেননি। তিনি শুধুমাত্র ব্যক্তি-মানুষ, এমনকি সামগ্রিকভাবেও মানুষের পরিবর্তে বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন এবং বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য নষ্ট করে এমন সব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এ কারণে তাঁর মতবাদের উপর মানুষ বা পশুহত্যার মতো গর্হিত কাজের দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।[৪৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা প্রচলিত নীতিবিদ্যার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। কারণ ভূমি নীতিবিদ্যা প্রচলিত নীতিবিদ্যার সংকীর্ণ পরিধিকে আরো বিস্তৃত করে পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সমগ্র অমানব সত্তাকে নীতিবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। বর্তমানে আমরা যে পরিবেশগত সংকটের মধ্যে বাস করছি সে সংকট থেকে আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে

লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে লিওপোল্ড সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলাদেশের অমানব সত্তাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, তারা ভালো নেই। লিওপোল্ডের মতো আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, অমানব সত্তাকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না গেলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে সমগ্র মানব জাতির উপর, তাহলে হয়তো আজ আমাদের বিলুপ্ত, বিপন্ন, মহাবিপন্ন, সংকটাপন্ন এবং প্রায় সংকটাপন্ন অমানব সত্তাসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন পড়তো না। তারপরও আশার কথা এই যে, সম্প্রতি সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায় এবং সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে অমানব সত্তাসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে লিওপোল্ডের অখণ্ডতার নীতিকেও যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের অভয়াশ্রমে পরিণত হবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নীতিবিদ্যার ইতিহাসে লিওপোল্ড যেহেতু প্রথম অমানব সত্তার নৈতিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদের নৈতিক মূল্য স্বীকার করেন, সেহেতু লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদকে প্যারাডাইম হিসেবে অভিহিত করা যায়।

তথ্যপঞ্জি

১. "Ethics is the normative science of the conduct of human beings living in societies- a science which Judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way". William Lillie, *An Introduction to Ethics*, 3rd edition, Mathuen & Co. Ltd., New York, 1955, pp. 1-2.

২. G.E. Moore, "The Conception of Intrinsic value", in *Philosophical Studies*, routledge, London, 1922, pp. 160-162. দেখুন, কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশ দর্শন মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪,পৃ. ৯১।

৩. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

৫. রাশিদা আখতার খানম, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১।

৬. রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

৭. Aldo Leopold, "The Land Ethic", in *A sand County Almanac and Sketches Here and There*, Oxford University Press, London, 1949, pp. 203-204. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩।

৮. J.R.D. Jardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, Wadsworth, Australia, 2001, p. 186. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২।

৯. রাশিদা আখতার খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১০. *প্রাগুক্ত*।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১২. *প্রাগুক্ত*।

১৩. *প্রাগুক্ত*।

১৪. নির্দিষ্ট একটি বাস্তুতন্ত্রে অবস্থিত বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহের ক্রম বা ধারাকে খাদ্য-শৃঙ্খল বলা হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলে সূর্য থেকে শক্তি গ্রহণ করে প্রাথমিক উৎপন্নকারী বা সবুজ উদ্ভিদ খাদ্যপুষ্টি উৎপন্ন করে, উদ্ভিদ থেকে সেই পুষ্টি ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো জীবের মধ্যে প্রবাহিত হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলে একটি জীব তার নিচের ধাপের জীবকে ভক্ষণ করে এবং সেই ভক্ষণকারীকেই আবার শৃঙ্খলের উপরে অবস্থিত জীব ভক্ষণ করে। বর্ণিত এ খাদ্য-শৃঙ্খলে উদ্ভিদকে তৃণভোজী (herbivores-ফড়িং, মাছ, গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, গন্ডার, হাতি ইত্যাদি) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, সেই তৃণভোজীকে আবার মাংসভোজী (carnivores-পাখি, বাঘ, সিংহ, মানুষ ইত্যাদি) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবার বিভিন্ন মাংসভোজী অন্য মাংসভোজীকে ভক্ষণ করে। উৎপন্নকারী তৃণভোজী ও মাংসভোজী মৃত হলে বিভিন্ন ক্ষুদ্রজীব ও অণুজীব (ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া) মৃত শরীর পচন ও গলনের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং উর্বর মাটিতে পরিণত করে। সেই মাটি থেকে পুষ্টিখনিজ গ্রহণ করে উদ্ভিদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে পুষ্টি গ্রহণের চক্র সৃষ্টি হয় এবং চক্রটি খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। দেখুন, অরুণ কুমার লাহিড়ী, *পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৩২।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৬. Aldo Leopold, *প্রাগুক্ত*, p. 215.

১৭. *প্রাগুক্ত*, p. 216.

১৮. Aldo Leopold, "The Land Ethic", in H. LaFollette, ed., *Ethics in Practice: An Anthology*, Blackwell, Oxford, 1997, p. 637.

১৯. ফিলিপ গাইন, সম্পাদিত, *বন, বনবাসীর জীবন সংগ্রাম*, সেড, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২১।

২০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ মে, ২০২৩, পৃ. ১৬।

২১. বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম হচ্ছে উদ্ভিদের জাদুঘর, যার অবস্থান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মিরপুরে। প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ এবং নতুন প্রজাতি নিয়ে কাজ করে। গাছ ও বীজ থেকে শুরু করে লতাগুল্ম ও সাধারণ ঘাসের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দেশের একমাত্র উদ্ভিদ জাদুঘর। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সিম্পোজিয়ামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি হারবেরিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব আনা হয়। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ 'বোটানিক্যাল সোসাইটি অব ইষ্ট পাকিস্তান' নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম হয় 'বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ'। এ প্রতিষ্ঠানটিই বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম নাম ধারণ করে ১৯৭৫ সালে ।

২২. *দৈনিক প্রথম আলো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

২৩. ১৯৬৩ সালে আইইউসিএন (আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ)-এর একটি সভায় সিআইটিইএস (বিপন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণি ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত সম্মেলন)-এর ধারণাটি প্রাথমিকভাবে পেশ করা হয়।

২৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জুন, ২০২৩, পৃ. ১৬।

২৫. *প্রাগুক্ত*, ৬ মে, ২০২৫, পৃ. ১৬।

২৬. *প্রাগুক্ত*।

২৭. *প্রাগুক্ত*।

২৮. *প্রাগুক্ত*, ১৪ জুন, ২০২৩, পৃ. ১৬।

২৯. *প্রাগুক্ত*।

৩০. *প্রাগুক্ত*।

৩১. *প্রাগুক্ত*, ২৮ জুন, ২০২৩, পৃ. ৮।

৩২. "It is inconceivable to me that an ethical relation to land can exist without love, respect, and admiration for land, and a high regard for its value. By value, I of course mean something far broader than mere economic value; I mean value in the philosphical sense". Leopold, *প্রাগুক্ত*, p. 223.

৩৩. Leopold, *প্রাগুক্ত*, p. 201.

৩৪. Leopold, *প্রাগুক্ত*, p. 203.

৩৫. "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise". Aldo Leopold, *প্রাগুক্ত*, pp. 224-225.

৩৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ মে, ২০২৩, পৃ. ৬।

৩৭. Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy,* Oxford Universituy Press, London, 1996, p. 177.

৩৮. Robert Eliot,(ed.), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, London, 1995, p. 40.

৩৯. J. R. D. Jardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, Wadsworth, Australia, 2012, p. 189.

৪০. *প্রাগুক্ত*।

৪১. Eugene C. Hargrove, *Foundation of Environmental Ethics*, Prentice Hall, New Jersy, 1989, p. 206.

৪২. J. R. D. Jardins, *প্রাগুক্ত*, p.186.

৪৩. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, *সমকালীন নীতিবিদ্যা*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

৪৪. J. R. D. Jardins, *প্রাগুক্ত*, p. 186.

৪৫. J. R. D. Jardins, *প্রাগুক্ত*, p. 189.

৪৬. Louis P. Pojaman, *Global Environmental Ethics,* Mayfield Publishing Co., California, 2000, p. 161. দেখুন, কালীপ্রসন্ন দাস, পরিবেশ দর্শন মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৪৮।

৪৭. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন

পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক দর্শনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আমাদের চারপাশে অস্তিত্বশীল অসংখ্য উচ্চ ও নিম্ন প্রজাতির প্রাণি, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা প্রভৃতি অমানব সত্তাসমূহের মূল্য এবং এদের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নৈতিক আলোচনা করা হয় পরিবেশ নীতিবিদ্যায়। এছাড়াও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহকে ব্যবহার করে বর্তমানে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অমানব সত্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ (conservation), টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ও পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করায় পরিবেশ নীতিবিদ্যায় বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। যেমন, ভূমি নীতিবিদ্যা (The Land Ethics), নিবিড় বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology), সামাজিক বাস্তুবিদ্যা (Social Ecology), পরিবেশ-নারীবাদ (Eco-Feminism) ইত্যাদি । তবে এ সকল মতবাদের মধ্যে লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা শীর্ষক সমগ্রবাদী মতবাদের 'অখণ্ডতার নীতি' বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তিনি এ নীতির মাধ্যমে প্রকৃতির সকল অমানব সত্তার গুরুত্ব ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন যা প্রকারান্তরে টেকসই উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। কারণ যথার্থ অর্থে উন্নয়ন বলতে টেকসই উন্নয়নকেই বোঝানো হয়, যা প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের উপর অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের সাথে পরিবেশ ও নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪.১ উন্নয়ন

বর্তমান সময়ে উন্নয়ন বলতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝায় না, বরং উন্নয়নের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক সনাতনী ধারণার বাইরে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জেন্ডার, পরিবেশ ও প্রতিবেশের মান বৃদ্ধি এখন উন্নয়নের বৃহত্তর পরিসরের অন্তর্গত বিষয়। সে নিরিখে উন্নয়ন শব্দটি বহুমাত্রিক এবং আপেক্ষিকও বটে। সামগ্রিক উন্নয়ন ইস্যুতে পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। সব ধরনের উন্নয়নকেই আর উন্নয়ন বলা যাচ্ছে না, যদি না তা পরিবেশবান্ধব হয়। বৈশ্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি এখন আর স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নকে পুরোপুরি নিরূপণ করতে পারছে না, বরং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করেও এখন উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর এখানেই পরিবেশের সাথে উন্নয়ন, উন্নয়ন পরবর্তী প্রেক্ষাপট এবং টেকসই উন্নয়নের ধারণার যোগসূত্র। যেখানে পরিবেশ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং একই সাথে উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারক।[১]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'উন্নয়ন' শব্দটি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২] সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে সাথে এ শব্দটির অর্থেরও ব্যাপক

পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে উন্নয়ন বলতে কোনো সমাজের বা রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট অবস্থাকে এবং এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাকে বোঝানো হয়। জাতিসংঘ প্রদত্ত ১৯৮৬ সালের সংজ্ঞানুযায়ী, 'উন্নয়ন' হলো একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য হলো উন্নয়নে সক্রিয়, স্বাধীন এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমগ্র জনসংখ্যার এবং সকল ব্যক্তির কল্যাণ এবং এর ফলে প্রাপ্ত সুবিধার ন্যায্য বন্টনের ভিত্তিতে নিরন্তর উৎকর্ষসাধন করা।[৩]

জাতিসংঘের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, উন্নয়ন বলতে কোনো একক বিষয়কে বোঝানো হয় না, বরং কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। উন্নয়নের সুফল প্রত্যাশী সকলকেই তাদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে ও অর্থপূর্ণ উপায়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে উন্নয়নের সুফল সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করতে হবে।

'উন্নয়ন' একটি বিতর্কযোগ্য (Contestable) ধারণা। এজন্য এর সংজ্ঞা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণভাবে 'উন্নয়ন' শব্দটির দুই ধরনের অর্থ প্রচলিত রয়েছে: (১) শব্দগত বা মৌলিক অর্থ এবং (২) প্রায়োগিক অর্থ। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়নের সংজ্ঞা 'উন্নয়ন' শব্দটির শব্দগত বা মৌলিক অর্থ নির্দেশ করে। প্রায়োগিক অর্থে 'উন্নয়ন' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গেলে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন, উন্নয়নের মানদণ্ড কী হবে? কীভাবে অংশগ্রহণ করলে তা সক্রিয়, স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে এবং অর্থপূর্ণ উপায়ে অংশগ্রহণ বলে বিবেচিত হবে? কোন বন্টনকে ন্যায্য বন্টন বলা যাবে? সকলকে একই পরিমাণে, নাকি যোগ্যতার ভিত্তিতে, নাকি প্রয়োজনের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে? এসব প্রায়োগিক প্রশ্নে 'গণতন্ত্র' 'স্বাধিকার', 'সামাজিক-ন্যায়বিচার' প্রভৃতি রাজনৈতিক ধারণার মতো উন্নয়নের ধারণাও বিতর্কযোগ্য হয়ে ওঠে।[৪]

উন্নয়নের ধারণা নিয়ে এরূপ বির্তকের কারণে ১৯৭০ এর দশকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে উন্নয়নের পরিধি (limit to development) নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয়। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত শর্তসমূহ রক্ষা করে একটি উৎকর্ষসাধন প্রক্রিয়ার ফলাফলের সীমা বা পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে আমরা তাকে উন্নয়ন বলবো, এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

৪.২ টেকসই উন্নয়ন

সাধারণভাবে উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যকার বিভেদ বা অনৈক্য দূর করে সমন্বয় সাধনের জন্য 'টেকসইযোগ্যতা' (sustainability) শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত এটি টেকসই বনায়ন, মৎস্য সম্পদ এবং ভূগর্ভস্থ পানির ধারণা থেকে এসেছে। অর্থাৎ টেকসইযোগ্যতার ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত গুণমান এবং সামাজিক ন্যায্যতার মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করে। এই ধারণাটি ১৯৭২ সালে বিকশিত হয়েছে, যখন থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জীবনযাত্রার মান এবং পরিবেশগত মানের মধ্যে সংযোগ

সাধনের চেষ্টা করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন হলো পরিবর্তনের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যেখানে সম্পদের শোষণ, বিনিয়োগের দিকনির্দেশনা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভিমুখীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। টেকসই উন্নয়নের তিনটি মাত্রা রয়েছেঃ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক। এগুলোকে একত্রে 'ট্রিপল বটম লাইন' হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এবং যে কোনো একটি নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রোগ্রাম বা প্রকল্পের সাফল্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। একটি টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপাদানকে সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়।[৫]

টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হচ্ছে। সুইডেনের স্টকহোমে মানব পরিবেশের উপর ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সম্মেলন এই বিবর্তনে অবদান রেখেছিল যে, 'মানব পরিবেশের সুরক্ষা' উন্নয়নের এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সম্মেলনের ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক পরিবেশগত সহযোগিতা প্রচারের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের দেশগুলো জাতীয়ভাবে নিজস্ব পরিবেশগত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নত করার কাজ শুরু করে। যদিও ১৯৭০ সালের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর দেশের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৬]

১৯৮৭ সালে নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্রো হার্লেম ব্রুন্টল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে World Commission on Environment and Development (WCED) 'Our Common Future' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি 'Brundtland Report' নামেও পরিচিত। এই প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, পৃথকভাবে পরিবেশগত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যথেষ্ট নয়, কারণ পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমস্ত উন্নয়ন নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ 'Our Common Future' প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পরিবেশগত আলোচনায় টেকসই উন্নয়নের ধারণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। টেকসই উন্নয়নের বিবর্তনের পরবর্তী মাইলফলকটি রিও ডি জেনেরিওতে ১৯৯২ সালের United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) নামক সম্মেলনে ঘটেছিল, যা Earth Summit বা ধরিত্রী সম্মেলন নামে পরিচিত। ধরিত্রী সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ ও উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দেয়া। জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে (UNCED) Agenda-21 এর অনুমোদন দেয়া হয়। UNCED এবং Agenda-21 উভয়ই একটি চিন্তাধারা এবং পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মানব ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মের জন্য পরিচালিত একটি প্রোগ্রাম, যা পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত রিও ঘোষণা এবং বননীতির বিবৃতিকেও সমর্থন করে।[৭]

‘টেকসই উন্নয়ন’ শব্দগুচ্ছ ১৯৮৭ সালে ‘Our Common Future’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর প্রাধান্য লাভ করে এবং এ ধারণাটিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ১৯৮৭ সালে ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা বহুল ব্যবহৃত সংজ্ঞা। এতে বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের ক্ষমতার সাথে আপোস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে।[৮] এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশন টেকসই উন্নয়নের পরিধিকে বিস্তৃত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নকেও এর অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দেয়। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হয় এবং একই কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রযোজ্য। এই সংজ্ঞাটির মাধ্যমে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় না, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপরও জোর দেয়া হয়।

‘টেকসই উন্নয়ন’ ধারণাটির পরিধির মধ্যে যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ভবিষ্যতের কতো প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করলে সেই উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলা যাবে? আবার বর্তমানে গৃহীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিধি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন বিতর্কেরও সৃষ্টি করে, কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমানে অস্তিত্বশীল না হলেও তাদের সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে WCED প্রদত্ত উল্লেখিত সংজ্ঞায়। টেকসই উন্নয়ন ধারণা ও সংজ্ঞায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তার উপর নির্ভর করে এর সংজ্ঞা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে International Union for Conservation of Nature (IUCN) টেকসই উন্নয়নের ধারণার অধিকতর সংস্কার সাধন করে।[৯] ১৯৯১ সালে IUCN প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়, সমর্থনকারী বাস্তুতন্ত্রের ধারণক্ষমতার মধ্যে বসবাস করার সময় জীবনমানের উৎকর্ষসাধন করাই হলো টেকসই উন্নয়ন।[১০] এই সংজ্ঞাটি পূর্বে উল্লেখিত WCED প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন। কারণ এই সংজ্ঞায় বাস্তুতন্ত্রকে, সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে উন্নত জীবনমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই সংজ্ঞাটি টেকসই উন্নয়নের পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্থানান্তরকে নির্দেশ করে।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়ংকর পরিবেশ বিপর্যের সম্মুখীন। এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ না পেলে কোনোভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে না। পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন এবং বাস্তুতন্ত্রের ধারণক্ষমতার স্থায়িত্বের উপর জোর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের ভারসাম্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন উভয়ই বাস্তুতন্ত্রের ধারণক্ষমতার স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। এজন্য WCED প্রদত্ত ১৯৮৭ সালের সংজ্ঞায় ‘টেকসই’ শব্দটির পরিধি বিস্তৃত করে ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার IUCN গৃহীত ১৯৯১ সালের সংজ্ঞায় এই পরিধির সীমা আরও বিস্তৃত করে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

WCED এবং IUCN প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা দুটি বহুলভাবে প্রচলিত এবং আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী পর্যায় কর্তৃক স্বীকৃত হলেও দার্শনিকবৃন্দ এই সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ উভয় সংজ্ঞার কোনোটিতেই ন্যায়বিচার (justice) এবং সমতার (equity) ধারণার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু সমর্থনকারী বাস্তুতন্ত্রের সীমার মধ্যে বসবাস করার সময় আমরা যদি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে বা সমতার ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহকে ব্যবহার করতে না পারি তাহলে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সকলের জন্য একটি উন্নতমানের জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব না, অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব না। বর্তমানে গৃহীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল যদি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকল সদস্যের মধ্যে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করা যায় তাহলে সেই উন্নয়নকে যথার্থ অর্থে টেকসই উন্নয়ন বলে বিবেচনা করা যাবে। সুতরাং ন্যায়বিচার ও সমতা হলো টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। IUCN প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞার সংস্কার সাধন করে ন্যায়বিচার ও সমতার ধারণাকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে দার্শনিকবৃন্দ টেকসই উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা দেন। এই সংজ্ঞায় বলা হয়, "ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে, সমর্থনকারী বাস্তুতন্ত্রের সীমার মধ্যে বসবাস করার সময়, এখন এবং ভবিষ্যতের সবার জন্য একটি উন্নতমানের জীবন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করাই হলো টেকসই উন্নয়ন।"[১১]

টেকসই উন্নয়নের এই সংজ্ঞায় WCED এবং IUCN প্রদত্ত সংজ্ঞার সবগুলো উপাদানকে সমুন্নত রেখে ন্যায়বিচার ও সমতার ধারণাকে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী (WCED ও IUCN প্রদত্ত) সংজ্ঞা দুটির চেয়ে আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। উন্নয়নকে টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এই সংজ্ঞায় কিছু শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে- ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি অনুসরণ করা, সমর্থনকারী বাস্তুতন্ত্রের সীমার মধ্যে বাস করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু পরিমাণে উন্নত জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধান করা। এই শর্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যখন কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতি অনুসরণ করা হবে তখন বাস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যও এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং তখন এ উন্নয়ন হবে টেকসই উন্নয়ন।

৪.৩ সবল ও দুর্বল টেকসই উন্নয়ন

বর্তমান শতাব্দীতে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক সম্পদ বা প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ উন্নয়ন প্রকল্পকে টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে প্রাকৃতিক সম্পদ বা মূলধন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা থাকা আবশ্যক। এজন্য টেকসই উন্নয়নের ধারণা মানুষের জীবনযাপন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করে

থাকে। সাধারণভাবে দেখা যায়, দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বেঁচে থাকার জন্য কিছু প্রাকৃতিক উপাদান বা সত্তা (বিশুদ্ধ পানি, স্থলভূমি, অক্সিজেন প্রভৃতিসহ অনেক কিছু) আমাদের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এসব সম্পদ আমাদের সীমাহীন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মানব জাতির মাত্রাতিরিক্ত ভোগবাদী জীবনযাপন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি করছে তেমন অধিক পরিমাণে বর্জ্য উৎপাদনেও ভূমিকা রাখছে। মানবসৃষ্ট এরূপ কর্মকাণ্ড অবশ্যই প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ। টেকসই উন্নয়নের ধারণা প্রাকৃতিক সম্পদের উচ্চমাত্রার ব্যবহার ও বর্জ্য নিঃসরণের পরিমাণ সীমিত করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ প্রসঙ্গে টেকসই উন্নয়নের আলোচনায় দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, (১) সবল টেকসই উন্নয়ন (Strong sustainability) এবং (২) দুর্বল টেকসই উন্নয়ন (Weak sustainability)[১২]।

সবল টেকসই উন্নয়ন প্রাকৃতিক মূলধন সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এই উন্নয়ন প্রকৃতিকে মূলধন এবং শিল্পজাত পণ্যকে আয় হিসেবে গণ্য করে। সবল টেকসই উন্নয়ন অনুসারে নবায়ন-অযোগ্য সম্পদ এত দ্রুত ধ্বংস করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক মূলধন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সবল টেকসই উন্নয়নের সমর্থনকারীরা মনে করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন কিছু নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করে যা প্রযুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় না।[১৩] অর্থাৎ সবল টেকসই উন্নয়ন নবায়ন-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেয় এবং শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বা আয়ের উপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহ প্রদান করে।

অন্যদিকে, দুর্বল টেকসই উন্নয়ন প্রাকৃতিক মূলধনকে মানব নির্মিত মূলধনের দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য মনে করে। যন্ত্র ও প্রযুক্তি ইত্যাদি হলো মানবসৃষ্ট মূলধন। কারণ, যন্ত্র ও প্রযুক্তি দ্বারা শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। দুর্বল টেকসই উন্নয়ন অনুসারে, প্রাকৃতিক মূলধনকে ততক্ষণ পর্যন্তই ব্যবহার করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত একে মানবসৃষ্ট মূলধন অর্থাৎ যন্ত্র-প্রযুক্তি ইত্যাদি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। এই উন্নয়ন অনুসারে, মানবসৃষ্ট মূলধনকে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের স্থলবর্তী করা গেলে এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে তা টেকসই সম্পদ বা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে।[১৪]

সবল ও দুর্বল টেকসই উন্নয়নের উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সবল টেকসই উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদকে মূলধনের মতো সংরক্ষণ করার পরামর্শ দিলেও প্রতিস্থাপনযোগ্যতার অজুহাত দিয়ে দুর্বল টেকসই উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। কিন্তু আমরা জানি যে, কিছু প্রাকৃতিক বস্তু ও সেবাকে শিল্পে উৎপাদন করে বৈশ্বিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না। যেমন: কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হলে যে তীব্র পানিসংকট দেখা দেয় তা শিল্পে উৎপাদিত পানি দ্বারা সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে পূরণ করা সম্ভব না। এ ধরনের বিষয়গুলো দুর্বল টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত না হওয়ায় সবল টেকসই উন্নয়নের ধারণা অধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য।

৪.৪ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) টেকসই বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন, সমন্বিত ও রূপান্তরমুখী দর্শন। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। সমগ্র বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্বশান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরুদায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়" (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত ২০৩০ এজেন্ডার উদ্বোধনী ঘোষণায় বিশ্বনেতারা বলেন, 'আমরা যেহেতু একত্রে এই মহান যাত্রায় শামিল হয়েছি, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এ অভিযাত্রায় কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না। ব্যক্তিমানুষের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিসহ আমরা চাই সবার জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সফল রূপায়ন- সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল মানুষের জন্য এবং সমাজের প্রতিটি অংশের জন্য। যে সবার পেছনে রয়েছে, তার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে'।[১৫] ২০৩০ এজেন্ডায় ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDG) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সব মিলে এমন লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা ১৬৯টি, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৬] অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো সর্বজনীন এবং এগুলো অর্জনের জন্য সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকার, ব্যক্তিখাত, সুশীল সমাজ, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডায় গৃহীত ১৭টি অভীষ্ট[১৭] হলো-

১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।

২. ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।

৩. সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

৪. সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

৫. জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

৬. সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৭. সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

৮. সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৯. অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ।

১০. অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।

১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।

১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরণ নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

১৫. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন্য ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

১৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

উল্লেখিত ১৭টি অভীষ্ট থেকে বলা যায়, বর্তমানে উন্নয়নের ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ বর্তমানে উন্নয়নের প্রচলিত তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক ধারণা ছাড়াও দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার, টেকসই স্যানিটেশন, টেকসই জ্বালানি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, টেকসই শিল্পায়ন, টেকসই নগর ও জনবসতি স্থাপন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ এবং পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহকেও এখন উন্নয়নের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে উন্নয়ন শব্দটি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমগ্র পৃথিবী আজ যে পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকিতে রয়েছে, এজন্য সার্বিক উন্নয়ন ইস্যুতে পরিবেশ ও পরিবেশের অমানব সত্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাটি সহনীয় মাত্রায় অমানব সত্তার ব্যবহারকে নির্দেশ করে। কারণ আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ অনবায়নযোগ্য সম্পদ। বর্তমান প্রজন্ম যদি অমানব সত্তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভোগবাদী চিন্তা পরিহার করতে না পারে তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব অমানব সত্তার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য বণ্টন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত নিশ্চিত করতে হলে এর

পূর্বশর্ত হিসেবে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতার কারণে পরিবেশগত বা অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হলে সেখানে কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে না।[১৮] তাই দার্শনিকদের মতে, কোনো উন্নয়ন তখনই টেকসই হবে যখন 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এর ভিত্তি হবে এবং পরিবেশগত বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা' হবে এর লক্ষণ। অন্যকথায়, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিবেশগত বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলেই উন্নয়ন টেকসই হবে। সুতরাং যথার্থ অর্থে টেকসই উন্নয়ন সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজেই সম্ভব।[১৯]

৪.৫ পরিবেশগত ন্যায়বিচার

'ন্যায়বিচার' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যেমন, আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভৃতি অর্থে ন্যায়বিচার শব্দটিকে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার বলতে সাধারণত পরিবেশগত ন্যায়বিচারকেই বোঝানো হয়। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সামাজিক ন্যায়বিচার পরিবেশগত ন্যায়বিচারের পূর্বশর্ত। তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের আলোচনা সম্ভব নয়।[২০] কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচার আবার নানাবিধ জটিল ধারণাকে সম্পৃক্ত করে যার বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে সাধারণ অর্থে ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝানো হয় যেখানে সামাজিক প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ পরিবেশগত বিবেচনার সাথে সম্পূরক হিসেবে যুক্ত থাকে।[২১] অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে পরিবেশগত ন্যায়বিচার আবশ্যকিভাবে যুক্ত।

টেকসই উন্নয়ন ধারণার সাথে পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান, কারণ পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো উন্নয়নই টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। দার্শনিকবৃন্দ প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমর্থনকারী বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বাস করে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতি অনুসরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধাগুলোও জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং স্থান-কাল ও পাত্রভেদে সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। কিন্তু যারা পরিবেশগত দিক থেকে একটু হলেও সচেতন, তারা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে তাহলে দেখা যায় যে, পরিবেশগত সুবিধা-অসুবিধাগুলো পৃথিবীর সকল দেশের সকল স্তরের নাগরিকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় না। সাধারণত ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে পৃথিবীর কিছু দেশ ও দেশের নাগরিকেরা বেশি মাত্রায় পরিবেশগত সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করে থাকে। এ বিষয়টি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধনীরা দরিদ্রদের চেয়ে, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে, পুরুষ মহিলাদের চেয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের চেয়ে, শারীরিকভাবে সক্ষম মানুষ প্রতিবন্ধীদের চেয়ে বেশি পরিবেশগত সুবিধা ভোগ করছে।[২২] অন্যদিকে পরিবেশগতভাবে সবচেয়ে খারাপ সমস্যাগুলো প্রায়শই দরিদ্র এবং জাতিগত বা সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘুদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ

অধিকাংশ শিল্পকারখানাগুলো এরূপ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থাপন করা হয়ে থাকে, ফলে শিল্পকারখানাগুলোর বিভিন্ন দূষণমূলক কার্যক্রম দ্বারা এসব অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু স্বাস্থ্য-ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পকারখানা (মাঝে মাঝে সরকারের যোগসাজশে) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়, যেখানে বসবাসরত সম্প্রদায়ের মানুষগুলো দরিদ্র, ক্ষমতাহীন বা চাকরির জন্য মরিয়া থাকে, এবং এ সকল কারণে অনুমান করা হয় যে, এ এলাকাগুলোতে স্থানীয় বিরোধ কম কার্যকর হবে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশসমূহের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের সুবিধার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনের আয়োজকরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করেন, মত বিনিময় করেন এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনের (Environmental Justice Movement) জন্ম হয়।[২৩]

নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে (civil rights movement) মডেল হিসেবে ধরে শ্রেণী, জাতি এবং বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে দূষণের বিষয়টির উপর নির্ভর করে পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলন বিকশিত হয়। পরিবেশগত ন্যায়বিচারের ধারণা অনুসারে, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ সকলের মধ্যে একই নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে। অন্যকথায়, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই নীতি প্রযোজ্য হবে।[২৪] এ আন্দোলন মনে করে যে, ক্ষমতাহীন ব্যক্তিরা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আঘাত, অসুস্থতা এবং শিল্পের দ্বারা অন্যায় বৈষম্যের স্বীকার হয় যা প্রধানত ধনী শেতাঙ্গদের উপকার করে যারা ধোঁয়া ও বর্জ্যের পাইপ থেকে দূরে থাকে। অনেক সময় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- এমন আয়োজনে দোষ কী? কারণ যারা পরিবেশগত ন্যায়বিচার থেকে সুবিধাবঞ্চিত তারা-তো সংখ্যালঘু। পরিণতিবাদী যুক্তির (consequentialist reasoning) অনুসারীবৃন্দ (যারা ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে প্রশ্রয় দেয় এবং শুধু সুবিধা এবং অসুবিধার বণ্টনকে অবহেলা করে) উক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করে। আশ্চর্যজনকভাবে, দূষণকারী শিল্পগুলোও ফলস্বরূপ যুক্তি দেখায়। দূষণে স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলো মূল্যায়নের পরিবর্তে তারা যুক্তি দেয় যে, সামগ্রিকভাবে সমাজের সুবিধাগুলো (সম্পদ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে) মহান।[২৫] অর্থাৎ ধনী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় দূরবর্তী দরিদ্র অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে থাকে এবং কলকারখানার বিভিন্ন দূষণমূলক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ চরম স্বাস্থ্য-ঝুঁকির স্বীকার হলেও এসব কলকারখানার প্রতিষ্ঠাতারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ও জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্টের বিষয়টি উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা সম্পদ অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রলোভন দেখিয়ে সামগ্রিক কল্যাণের অজুহাত দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য (অর্থ উপার্জন) সাধন করে থাকে।

পরিবেশগত ন্যায়বিচারের প্রবক্তারা পরিণতিবাদী যুক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে তারা এই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়। কলকারখানার পার্শ্ববর্তী এলাকার অখণ্ডতা হারানো অথবা এসব বিষাক্ত স্থানের নিকটবর্তী সম্পত্তির মান হ্রাস প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয়ের কারণে অনেক সময় স্বাস্থ্যের উপর কারখানার প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণাও সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। তবে

সাধারণভাবে, এ আন্দোলনের প্রবক্তারা পরিণতিমুক্ত নীতির (Deontological rules) ভিত্তিতে মামলা করে থাকে। কারণ বিষয়টি সমাধান বহির্ভূত সমস্যা, খরচ এবং সুবিধার নয় বরং ন্যায়বিচারের। এভাবে প্রায়শই তারা আইন-আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক রায়ের আকারে পরিণতিমুক্ত নীতিগুলোর আইনি প্রয়োগ করে থাকে।[২৬] পরিণতিমুক্ত নীতিবিদ্যা অনুসারে, কোনো কাজের ভালোত্ব বা মন্দত্ব ফল উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না, কাজের পিছনে যে অভিপ্রায় থাকে তা দিয়েই কাজের মূল্যায়ন করা হয়।[২৭] যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি আসলের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা (সুদ) প্রত্যাশা করে বিপদগ্রস্থ বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে উপকার করতে চায় তাহলে ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে সৎ বা ভালো বলে বিবেচনা করা যায় না। একইভাবে দূষণকারী শিল্পগুলো সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার অসহায় মানুষের সম্পদ অর্জন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে মহান বলে অভিহিত করলেও তাদের উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলোর মধ্যে একটি হলো পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (Environmental Protection Agency)।[২৮] পরিবেশগত ন্যায়বিচারের বিষয়গুলোর জন্য এই ধরনের রায়গুলো প্রায়শই পরিণতিমুক্ত নৈতিক তত্ত্ব দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (EPA) অনুসারে, পরিবেশগত ন্যায়বিচার হলো জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎপত্তি বা আয় নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায্য আচরণ এবং পরিবেশগত আইন, প্রবিধান এবং নীতির উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির জন্য পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে, যখন প্রত্যেকে পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে একই মাত্রার সুরক্ষা উপভোগ করবে এবং একটি সুস্থ পরিবেশে বাস করার জন্য, শেখার জন্য এবং কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমান সুযোগ পাবে (EPA, 2013)।[২৯]

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার উল্লেখিত বিবৃতিতে দুটি সাধারণ নৈতিক নিয়মের ইঙ্গিত রয়েছে:[৩০]

১. জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎপত্তি বা আয় নির্বিশেষে সকল মানুষের পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে একই মাত্রার সুরক্ষা উপভোগ করা উচিত।
২. জাতি, বর্ণ, জাতীয় উৎপত্তি বা আয় নির্বিশেষে সকল মানুষের পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় (পরিবেশগত আইন, প্রবিধান এবং নীতির উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ) সমান সুযোগ থাকা উচিত।

কান্টের শর্তহীন আদেশের (যে কর্মনীতিকে তুমি বিশ্বজনীন আইনে রূপ দিতে প্রস্তুত; শুধু সেই কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করো)[৩১] মাধ্যমে উল্লেখিত নীতি দুটির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়। শর্তহীন আদেশ যদিও সংখ্যায় এক, তবে তিনটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আদেশটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে। প্রথম রূপটি হচ্ছে- "এমন নিয়মানুসারে কাজ কর যে, তোমার নিয়মের মাধ্যমে তোমার কর্ম সিদ্ধান্তটি বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক আইনে পর্যবসিত হতে পারে"।[৩২] এ নিয়মানুসারে কোনো ব্যক্তির কাজ তার ইচ্ছার মাধ্যমে একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত হবে। অর্থাৎ কান্টের মতে শর্তহীন আদেশ হলো একটি নৈতিক নিয়ম বা আইন যা সার্বভৌম বা

সার্বিক।[৩৩] শর্তহীন আদেশের মতো পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থাও পরিবেশগত সুবিধা-অসুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে সার্বিককে গুরুত্ব দেয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হলো মানবকেন্দ্রিক। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং পরিবেশকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর উল্লেখিত বিবৃতিতে শুধু মানুষের পরিবেশগত অধিকারের কথাই বলা হয়েছে, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহের অধিকারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি।

পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলন দূষণ-সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশী বা সম্প্রদায়ের তৃণমূল প্রচেষ্টা হিসেবে শুরু হলেও এটি দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা গ্রহণ করে। এ আন্দোলনের ফলে ব্যাপকভাবে দূষণকারী শিল্পগুলো মূলত ধনী দেশগুলো থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, বিশেষ করে যে দেশসমূহ দৃঢ় পরিবেশগত বিধি প্রণয়ন করেছে, এবং এমন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে যেখানে মানুষ কাজ পেতে মরিয়া এবং শ্রমও সস্তা।[৩৪] এই ধরনের স্থানগুলোর মধ্যে রিও গ্র্যান্ডের ঠিক দক্ষিণে মেক্সিকো অঞ্চলের মধ্যে মাকিলাডোরা[৩৫] (উৎপাদন বা রপ্তানিমূলক কারখানা যা সস্তা শ্রম, কম কর এবং শিথিল পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বারা আকৃষ্ট) পানি, বায়ু এবং ভূমি দূষিত করে। কারণ মাকিলাডোরা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার কারণে তারা কৌশলে কিছু আইনি এবং নৈতিক বিধিনিষেধ এড়াতে পারে।[৩৬] এ হলো পরিবেশগত অন্যায্যতার সুস্পষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের কারখানার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনের প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার লাভ করে।

বাংলাদেশে পরিবেশগত অন্যায্যতার বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা বিভাগের, বাগেরহাট জেলার, রামপাল উপজেলার যে স্থানটিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে সেখান থেকে সুন্দরবনের বাফারজোনের দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। যদিও পরিবেশবাদীরা দাবী করেন এই দূরত্ব আরও কম- ৯ থেকে ১৩ কিলোমিটারের মধ্যে। এতো অল্প দূরত্বে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সুন্দরবনের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে বলে শুরু থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন। জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ সালের অক্টোবরে এই প্রকল্পের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের বিষয়ে ত্রিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের মূলত চার ধরনের ক্ষতির আশঙ্কার কথা তুলে ধরা হয়।[৩৭]

১. রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে কয়লা পুড়িয়ে। এই কয়লা পোড়ানোর পর সেখান থেকে নির্গত কয়লার ছাইকে সুন্দরবনের পরিবেশের জন্য এক নম্বর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এই প্রকল্পে।
২. বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত বর্জ্য এবং পানিকে দ্বিতীয় হুমকি গণ্য করছে ইউনেস্কো।
৩. এই প্রকল্পকে ঘিরে সুন্দরবন এলাকায় যেভাবে জাহাজ চলাচল বাড়বে এবং ড্রেজিং করার দরকার হবে, সেটিও সুন্দরবনের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

৪. আর সবশেষে বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ঘিরে ঐ অঞ্চলের সার্বিক শিল্পায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুন্দরবনের পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে মনে করে ইউনেস্কো।

ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার এবং ইন্টারন্যাশনাল কনজার্ভেশন ইউনিয়ন (আইইউসিএন)-এর তিনজন বিশেষজ্ঞ সরেজমিনে ঘুরে দেখে এবং বিভিন্ন পক্ষের সাথে কথা বলে এই রিপোর্টটি তৈরি করেন।

প্রকল্পটি পুরোদমে চালু হলে বা মোট ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার টন কয়লা পোড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সে হিসেবে প্রতি বছর পঞ্চাশ লাখ টনের বেশি কয়লা পোড়ানো হতে পারে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অন্যান্য যে-কোনো ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে। এছাড়া বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম, সীসা, ছাই ইত্যাদি গ্যাস ও ভারী ধাতু পরিবেশে নির্গমনের ফলে সুন্দরবন ও আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিবেশ দূষণের কবলে পড়বে। ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতে এসিড-বৃষ্টি অবধারিত, সেই সাথে বিষাক্ত বাতাস ও রাসায়নিক সুন্দরবনের বনাঞ্চল, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের জন্য বিপজ্জনক। এমনকি দীর্ঘমেয়াদে সুন্দরবনের টিকে থাকাও আশংকাজনক হতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া যেসব দেশে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার আশপাশের মানুষ ও জনপদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও নিউরোডিজেনারিটিভ স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে।[৩৮]

রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এতে করে প্রথমে খুলনা ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং পরবর্তীতে চাহিদা সাপেক্ষে সারাদেশে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।[৩৯] বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিঃসন্দেহে এটা একটা খুশির খবর। কারণ এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনপদের অধিবাসীদের বিদ্যুতের চাহিদা যেমন পূরণ হবে তেমন কর্মসংস্থান ও সম্পদ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ বা জীব-বৈচিত্র্য যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার এবং ভবিষ্যতে যেভাবে মানুষের দীর্ঘমেয়াদে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাতে করে অত্র এলাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সুস্পষ্ট পরিবেশগত অন্যায্যতার দৃষ্টান্ত। যদিও রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারপক্ষ বলছে, এটিতে ‘সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি’ ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পোড়ানো কয়লা থেকে উদ্ভূত বিষাক্ত গ্যাস ও ছাইসমূহ বাতাসে ছড়ানোর আগেই বহুলাংশে আটকে দেয়া সম্ভব। সাধারণভাবে সুন্দরবন এলাকায় বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫৩ মাইক্রোগ্রাম; যা কিনা আবাসিক ও গ্রাম্য অঞ্চলের বাতাসে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে কম (ইআইএ চূড়ান্ত রিপোর্ট, ২০১৩)। আর এখানেই পরিবেশবিদদের সুনির্দিষ্ট বিরোধিতা যে সুন্দরবন তো আবাসিক বা গ্রাম্য অঞ্চল নয়, বরং এটি অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র্যে ভরপুর পরিবেশ স্পর্শকাতর একটি এলাকা। তাই সুন্দরবনের জন্য আবাসিক ও গ্রাম্য এলাকার গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ গ্যাস মাত্রা গ্রহণ করা

নেহাতই দায়িত্বহীনতার পরিচয় অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বহুলাংশে কমিয়ে আনার যে ব্যবস্থাপনা, তা একটি সাধারণ এলাকার জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে; কিন্তু তা সুন্দরবনের মতো পরিবেশ স্পর্শকতার এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়।[৪০]

এবার দেখা যাক, তরল প্রকৃতির দূষকগুলোর সমস্যা। তরল প্রকৃতির দূষকের একটি উৎস আধুনিক ক্লিন কোল টেকনোলজি প্রয়োগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। সহজভাবে বলতে গেলে, কয়লা পোড়ানোর পর দূষিত বাতাস ও ছাইসমূহকে আটকে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যে পানি ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তার বর্জ্য (ওয়েষ্ট ওয়াটার) অন্য এক বিষাক্ত তরল দূষক হিসেবে তৈরি হয়। আর এই তরল দূষক নিয়ে যত বিপত্তি। অর্থাৎ রামপালে সুপারক্রিট্রিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করে বায়ুদূষকগুলো আটকে দেওয়ার যে দাবি করা হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে অন্য এক তরল দূষকের জন্ম দেবে। আর তা কেবল এখানেই নয়, বরং এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী ক্লিন কোল টেকনোলজিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যেমন, নিউ জার্সির একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে উন্নততর প্রযুক্তির (স্ক্রাবার) মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাস ও ছাই আবদ্ধ করার ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে পাশের লোকালয়ের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, এ প্রযুক্তিতে যে পানি ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ফেলতে হচ্ছে পাশের নদ-নদীতে, যা কেবল নদ-নদীর পানিকেই দূষিত করেনি, বরং ভূগর্ভস্থ খাওয়ার পানিকেও দূষিত করে তুলেছে। সেখানকার ভুক্তভোগী একজন বাসিন্দা বলেছেন, 'আমাদের বিষাক্ত বাতাসের পরিবর্তে এখন বিষাক্ত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে মাত্র।' ওই রিপোর্টে চার্লস ডুহিগ লিখেছেন: যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী বহু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বায়ুদূষণ কমানোর জন্য উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষণ কমেছে বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে পানি বা তরল দূষণের জন্ম দিয়েছে। আর এই দূষিত পানিকে ট্রিটমেন্ট করে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায় না।[৪১]

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পশুর নদ থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করা হবে আর ব্যবহারের পর যে পরিমাণ পানি আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হবে, তার পরিমাণ ঘন্টায় পাঁচ হাজার ১৫০ ঘনমিটার (ইআইএ চূড়ান্ত রিপোর্ট, ২০১৩)। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে দূষিত বায়ু ও ছাই আটক করার কাজে ব্যবহৃত স্ক্রাবার থেকে বের হওয়া দূষিত পানি। এই দূষিত পানি পশুর নদে পড়ে সোজা গিয়ে ঢুকবে সুন্দরবনের ভিতর। অন্য দূষক বিষাক্ত ধাতব পদার্থসংবলিত ছাই একটি কঠিন পদার্থ, যা বাতাসে নির্গত হওয়ার আগে তাকে বহুলাংশে আটকে রেখে জমা করা হবে। কিন্তু বাতাস থেকে আলাদা করে মাটিতে রাখলে তা যথেষ্ট দূষণ ঘটাতে পারে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রায় এক হাজার ৪০০ একর এলাকা ভরাট করার জন্য এ ছাই ব্যবহার করা হতে পারে (ইআইএ চূড়ান্ত রিপোর্ট, ২০১৩)। বিদ্যুৎকেন্দ্রের নকশা অনুযায়ী পশুর নদের তীরে অর্থাৎ বিদুৎকেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে ছাই ফেলে দেওয়ার পুকুর (অ্যাশ ডিসপোজাল পন্ড) ও তার পাশে কয়লা স্তূপাকারে জমা রাখার স্থান (লোকাল স্টকইয়ার্ড) উভয়েই নদের পানিকে দূষিত করার সম্ভাব্য উপাদান। এখান থেকে কয়লা ও ছাই যথার্থ ব্যবস্থাপনার অভাবে সংলগ্ন পশুর নদের পানিকে দূষিত করবে, যা কেবল অল্প দূরত্ব পেরিয়ে সরাসরি সুন্দরবনে গিয়ে পৌঁছাবে।[৪২]

রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন পরিবেশগত অন্যায্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ এ বিদ্যুৎকেন্দ্র সংলগ্ন সুন্দরবন বিশ্বনন্দিত অমূল্য বনাঞ্চল, যা কিনা বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর আইলা, রোয়ানু, বুলবুল, আমফান এবং সর্বশেষ রেমালের গতি এবং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কমিয়ে দিয়ে এ বনাঞ্চল যেভাবে আমাদের জীবন এবং সম্পদ বাঁচিয়ে দিচ্ছে তা কল্পনাতীত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ রক্ষার পাশাপাশি সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকার জীবিকার একটা বড় উৎস। কিন্তু সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যেভাবে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হচ্ছে তাতে করে বর্তমান প্রজন্ম সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হলেও ভবিষ্যত প্রজন্ম যে এ থেকে বঞ্চিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এজন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে যখন কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, তখন গৃহীত প্রকল্প দ্বারা মানুষ বা প্রকৃতি কোনোভাবেই যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে পারলেই বর্তমানে গৃহীত যে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে। সুতরাং পরিবেশগত ন্যায়বিচার আন্দোলনের পরিধির বিস্তৃতি ঘটিয়ে বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি প্রকৃতি, জীব-বৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৪.৬ টেকসই উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব

যে কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে যখন কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তখন পরিবেশ ও পরিবেশের আমানব সত্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করা উচিত। কারণ ইতিমধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, প্রকৃতি এবং অমানব সত্তাসমূহের ক্ষতি সাধন করে কোনো উন্নয়ন সম্ভব না; আর যদি সম্ভবও হয় তাকে কখনোই টেকসই উন্নয়ন বলা যাবে না। টেকসই উন্নয়নের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। যেমন, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা ফুলে-ফলে-ফসলে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দিয়েছে বলেই আজও আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি এবং আমাদের সীমাহীন চাহিদার যোগান পেয়ে থাকি মাতৃস্বরূপ এই ধরিত্রীর কাছ থেকে। এদিক থেকে বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি বাসযোগ্য এবং সুস্থ পৃথিবী উপহার দেয়ার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের মানুষের উপর বর্তায়। যেদিন থেকে প্রকৃতি এবং অমানব সত্তাসমূহের (জীবীয় এবং অজীবীয়) আলোচনা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বলাভ করেছে, সেদিন থেকেই একটি প্রশ্ন বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্নটি হলো-আমরা কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারবো? এ প্রশ্নটি অনেকের মনে হাস্যরসের জন্ম দিতে পারে, কারণ, আমরা আমাদের অনাগত প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে একদিকে যেমন একরের পর একর জমি বা প্লট, একাধিক ফ্ল্যাট ক্রয় করছি তেমন অন্যদিকে ব্যাংক হিসাব বৃদ্ধি করছি। তাহলে অনাগত প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী রেখে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে কেন? আসলে পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্টরা সুন্দর পৃথিবী বলতে প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যে ভরপুর কোন পৃথিবীকে বোঝাননি। কারণ এরকম পৃথিবীর অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব না।

সকল ধরনের দূষণমুক্ত, পরিবেশবান্ধব এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি সুস্থ পৃথিবী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া বর্তমানে আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেদিন থেকে দর্শনে পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে দার্শনিকেরাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছেন। ফিনবার্গ এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতের অ-জাত (unborn) প্রজন্মের অধিকার ও স্বার্থ নিয়ে ১৯৭৪ সালে আলোচনার সূত্রপাত করেন "The Rights of Animals and Unborn Generation" প্রবন্ধে।[৪৩] তিনি দাবী করেন যে, পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যে ধরিত্রীকে আমরা পেয়েছি তাকে বিনষ্ট করার সকল শক্তি আমাদের আছে অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি, নদী, সমুদ্র, বনাঞ্চল সবকিছুই আমরা নানা দূষণে পূর্ণ করে বিষময় করে তুলতে পারি। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধাচারণ করবেন নিশ্চিতভাবেই। ফিনবার্গ মনে করেন অধিকাংশ চিন্তাবিদই এমন ধারণা পোষণ করেন যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে আমাদের কর্তব্য রয়েছে, তাদের জন্য একটি দূষণমুক্ত পৃথিবী রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা আমাদের আছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অস্তিত্বশীল না হলেও তাদের জন্য বর্তমান প্রজন্ম প্রতিনিধি, মুখপাত্র, তত্ত্বাবধায়ক অথবা বাহক (Proxy, Spokesman, custodian, Trustee) হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারে। ফিনবার্গের মতে এই প্রতিনিধিত্ব যারা করবেন তাদেরকে ভবিষ্যতের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রকৃত মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করা যায়।[৪৪]

সাধারণভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব ভবিষ্যতের জন্য আমরা যে উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি তার সাথে সম্পর্কিত। গত কয়েক বছরে দার্শনিকেরা ভবিষ্যৎ সমাজ এবং মানবিক কার্যকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে (পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি) সমসাময়িক নীতিগুলোর গুরুতর প্রভাব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দূষণ, পারমানবিক বর্জ্য উৎপাদন করি এবং আমরা অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে ফেলছি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সম্পদের সাথে অর্থনৈতিক দায়ও বণ্টন করি, এবং তা শুধু বর্তমান মানুষের মধ্যে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের মধ্যে। এটি স্বীকার করা হচ্ছে যে, সম্পদ বিতরণ, নীতি প্রণয়ন এবং অনুরূপ বিষয়গুলোতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যও আমাদের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় নৈতিক সমস্যাও দেখা দেয়; যেমন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি কী? আবার কখনো কখনো বর্তমান কল্যাণনীতিগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাধ্যবাধকতার বিপরীত হতে পারে।[৪৫] অর্থাৎ ভবিষ্যতে বসবাসকারীদের বিবেচনায় বর্তমানে দায়িত্ব পালনে আমরা কতটুকু বাধ্য?-এ বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ ও দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে দুই ধরনের দার্শনিক মত (পক্ষে ও বিপক্ষে) প্রচলিত রয়েছে। যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে না তারা তাদের পক্ষে প্রধানত তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন।[৪৬]

১. অজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি (argument form ignorance);

২. সুবিধাভোগীদের অনুপস্থিতিপ্রসূত যুক্তি (argument from disappearing beneficiaries); এবং

৩. কালিক দূরত্বপ্রসূত যুক্তি (argument from temporal location)।

অন্যদিকে যে সকল দার্শনিক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেন তারাও তাদের মতবাদের পক্ষে তিন ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করেন।[৪৭]

১. উপযোগবাদী যুক্তি (Utilitarian argument);

২. অধিকার বিষয়ক যুক্তি (rights-based argument); এবং

৩. যত্ন সংক্রান্ত যুক্তি (Care arguments)।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কিত উল্লেখিত দার্শনিক যুক্তিসমূহ (পক্ষে ও বিপক্ষে) দার্শনিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু বর্তমান গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমি এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকবো। কিন্তু টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ, প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা যে উন্নয়ন প্রকল্পই গ্রহণ করি না কেন, সে উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই হবে না। এজন্য পরিবেশ দর্শনও এর উৎপত্তির প্রথম থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছে।

আমরা জানি যে, পরিবেশের প্রতি মানুষের অন্যায্য আচরণ বর্তমান পরিবেশগত সংকটের অন্যতম কারণ। অর্থাৎ, আমরা যেন পরিবেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকি। সংকীর্ণ অর্থে এই ফলাফল কেবল বর্তমান প্রজন্মের অভ্যন্তরেই ন্যায্যতার কথা বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে তা আন্তঃপ্রজন্মগত ন্যায্যতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, আমাদের নিজেদেরকে এই গ্রহের একমাত্র বা সর্বশেষ প্রজন্ম বলে মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তা অ-নৈতিকও বটে। আমরাই সর্বশেষ প্রজন্ম না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়। এই উপলব্ধি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশগত নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বশীলতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৪৮]

১৯৯৭ সালের ২১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে UNESCO-এর সাধারণ সম্মেলনের ২৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের পূর্বেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়।[৪৯] ১৯৯৭ সালের ১২ নভেম্বর অর্থাৎ সম্মেলনের শেষ দিনে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও স্বার্থ, পছন্দের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় এবং তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবন, পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য, মানব জাতির সাধারণ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিক্ষা, শান্তি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ঘোষণা করা হয়। সবগুলো অনুচ্ছেদের মধ্যে চারটি অনুচ্ছেদে বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ,

প্রাকৃতিক সম্পদ, বাস্তুতন্ত্র ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক। এই চারটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:[৫০]

অনুচ্ছেদ ১: বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন ও স্বার্থ যাতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ৪: বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হলো, পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমন অধিকার অর্পণ করা যা মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা কোনোদিন অপরিবর্তনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অস্থায়ীভাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী প্রতিটি প্রজন্মকে প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গতভাবে যত্ন নেয়া উচিত এবং এটা নিশ্চিত করা উচিত যে, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিকারক পরিবর্তনের দ্বারা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কোনো ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পৃথিবীতে জীবনের ক্ষতি করবে না।

অনুচ্ছেদ ৫.১: ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের সমৃদ্ধি থেকে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান প্রজন্ম টেকসই উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করবে, এবং জীবনের শর্তসমূহ, বিশেষ করে পরিবেশের গুণগত মান এবং অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ৩. বর্তমান প্রজন্মের উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানব জীবন টিকিয়ে রাখার এবং এর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।

অনুচ্ছেদ ৬ : মানব জিনোম (genome), মানব ব্যক্তির মর্যাদা এবং মানবাধিকারের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করতে হবে এবং অবশ্যই জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। মানব ও অন্যান্য প্রজাতির সংরক্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে কোনোভাবেই আপোস করা উচিত না।

UNESCO-এর সাধারণ সম্মেলনের উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন নেয়া, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা, পরিবেশের গুণগত মান ও অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ শর্তগুলো পূরণ করার নৈতিক দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের উপর বর্তায় এবং বর্তমান প্রজন্ম যেন এমন কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ না করে যাতে মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির (অমানব সত্তাসমূহ) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এ বিষয়টিও ২৯তম অধিবেশনে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে যখন কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তখন তা থেকে বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুফল ভোগ করতে পারবে। ইউনেস্কো ঘোষিত এই অনুচ্ছেদগুলোর তাৎপর্য এবং প্রয়োগের বাস্তবতা উপলব্ধি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন নীতি নির্ধারক দেশসমূহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই পৃথিবী বিনির্মাণে বর্তমান প্রজন্মের গৃহীত এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

৪.৭ বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট

নীতিগত দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব পালনের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট ধারণার (The idea of the ecological foot prints) মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট দ্বারা বাস্তুবিদ্যাগত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর উপর মানুষের চাহিদা বা চাপের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মৌলিক বস্তুগত সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলের প্রয়োজন পড়ে। এরূপ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলের উপর কোনো জনসমষ্টির চাপ বা চাহিদার মাত্রাকে বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট বলা হয়।[৫১]

প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সম্পদ উৎপাদন ও ভোগের জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলের (স্থলজ ও জলজ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল) প্রয়োজন পড়ে আবার ঐ জনগোষ্ঠী ভোগের মাধ্যমে যে বর্জ্য উৎপাদন করে সেগুলো আত্তীকরণের জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি অঞ্চলের (বাস্তুতান্ত্রিক) প্রয়োজন। তবে উল্লেখ্য যে, একটি জনগোষ্ঠী যে শহর, গ্রাম বা এলাকায় বসবাস করে সেই জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল যে ঐ শহর বা গ্রামেই হতে হবে এমন নয়। যেমন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এলিফ্যান্ট রোডের জনগোষ্ঠী স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল ব্যবহার করে সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ করলেও তাদের বর্জ্য আত্তীকরণের জন্য সাভার, গাজীপুর এবং বুড়িগঙ্গা নদীর বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল ব্যবহার করছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় (জাতীয় বা আন্তর্জাতিক) থাকতে পারে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস্তুবিদ্যাগত পদচিহ্ন বলতে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় অবস্থিত স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রসমূহ দ্বারা গঠিত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়।

সাধারণভাবে মাথাপিছু আনুমানিক গড় বাস্তুবিদ্যক- ফুটপ্রিন্ট ২.৮ হেক্টর, কিন্তু ইতিমধ্যে বর্তমান মানব জনসংখ্যার প্রায় ১৭ মিলিয়ন হেক্টরের মোট বাস্তুবিদ্যক ফুটপ্রিন্ট রয়েছে। এই মোট বাস্তুবিদ্যক ফুটপ্রিন্টের অধিকাংশই দখল করে আছে পৃথিবীর ধনী দেশসমূহ। কারণ আমেরিকা, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপীয় ধনী দেশসমূহের বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসব দেশের প্রত্যেক অধিবাসী তাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রার জন্য ৫ থেকে ১০ হেক্টর স্থলজ/জলজ বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট দখল করে আছে। অথচ পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহের অধিবাসীরা গড়ে প্রত্যেকে ১ হেক্টরেরও কম বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্ট ব্যবহার করে। এমনকি চীনের মতো দেশেরও মাথাপিছু বাস্তুবিদ্যাগত ফুটপ্রিন্টের পরিমাণ ১.২ হেক্টর।[৫২] কারণ, বিশ্বের ধনী দেশগুলো বৈশ্বিক পরিবেশগত পরিসরে তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশি অংশ ভোগ করছে। পক্ষান্তরে দরিদ্র দেশগুলো ন্যায্য প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে উপস্থাপিত রেখাচিত্রে এই প্রমাণ সুস্পষ্ট।[৫৩]

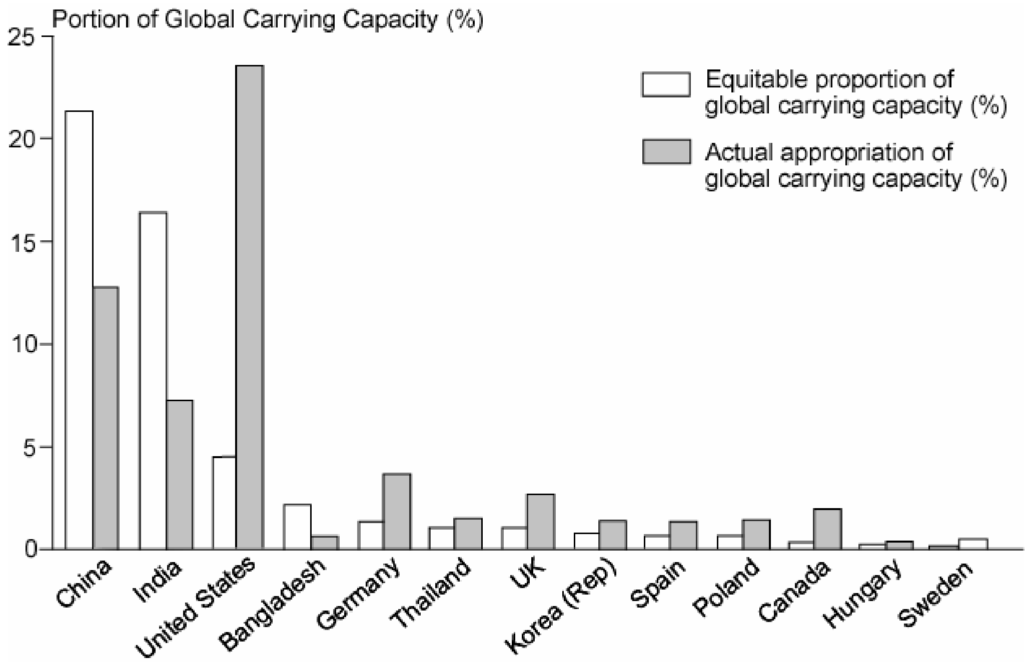

Equitable (population-based) is actual appropriations of global carrying capacity by selected countries

এই রেখাচিত্রে পৃথিবীর মোট উৎপাদনশীল জলজ/স্থলজ এলাকার অনুপাত হিসাবে প্রতিটি দেশের বাস্তুবিদ্যক ফুটপ্রিন্ট দেখানো হয়েছে। এই তুলনাটি প্রকাশ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পশ্চিম ইউরোপের মতো ধনী ও বাজার অর্থনীতির ধারক দেশসমূহ পৃথিবীর উৎপাদনশীল ভূমি/জলের প্রাপ্য অংশের তুলনায় দুই থেকে পাঁচ শতাংশ বেশি ব্যবহার করছে। অন্যদিকে, ভারত, বাংলাদেশ এবং এমনকি চীনের মতো দেশগুলি তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে ন্যায্য বরাদ্দের তুলনায় একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র ব্যবহার করছে। এই রেখাচিত্রটি ১৯৭৭ সালের জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর মোট উৎপাদনশীল স্থলভূমি ও জলভূমি এলাকার পরিসংখ্যান অনুসারে নির্মিত হয়েছে।[৫৪] অর্থাৎ আশির দশকের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তৈরি ও রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে, পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা ভোগের দিক থেকে ধনী দেশগুলো স্বল্পন্নোত ও দরিদ্র দেশসমূহের উপর অবৈধ দখলদারিত্ব বিস্তার করে আসছে এবং এ ধারা এখনোও অব্যাহত আছে। যদি বর্তমান বিশ্বের বাস্তুবিদ্যক ফুটপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায়, বৈশ্বিক অর্থনীতি ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক বাস্তুবিদ্যাগত সীমা অতিক্রম করেছে। কারণ, পৃথিবীতে প্রায় ৯০০ কোটি হেক্টর উৎপাদনশীল ফসলি জমি, চারণভূমি এবং বন এবং সম্ভবত ৩০০ কোটি হেক্টরের সমতুল্য অ-গভীর মহাসাগরীয় অঞ্চল ব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বমোট ১,২০০ কোটি হেক্টর স্থলভূমি ও জলভূমি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী।[৫৫] এ তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পৃথিবীর মানব বহন ক্ষমতার চেয়ে আমরা শতকরা ৪০ ভাগ বেশি ছাড়িয়ে গেছি। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে, পৃথিবীর পরিবেশগত ধারণক্ষমতার বাইরে কীভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বসবাস করতে পারে? এর উত্তরে সহজভাবে বলা যায়, জীবনের জন্য অপরিহার্য বাস্তুতন্ত্রকে নিঃস্ব করে এবং অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করে। তবে এভাবে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্যই সম্ভব। এভাবে 'পুঁজির অবসান' (Capital Liquidation)

স্থায়ীভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বহনক্ষমতাকে হ্রাস করছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ফেলে দিচ্ছে। ওজোনস্তর ক্ষয়ে যাওয়া, বায়ুমণ্ডল এবং জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূমির অবক্ষয়, মৎস সম্পদের বিলুপ্তি, জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতি প্রভৃতি হলো পৃথিবীর পরিবেশগত ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ।[৫৬]

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, বিগত কয়েক শতক ধরেই পৃথিবী তার পরিবেশগত ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যা বহন করে চলেছে। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা যদি তাদের অসীম চাহিদা মেটানোর জন্য সীমাহীনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুব শীঘ্রই প্রাকৃতিক সম্পদশূন্য এক পৃথিবীর মুখোমুখি হবে। কারণ জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্প-কারখানা থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ, ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধন, নিউক্লিয়ার বর্জ্যে পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যার সবগুলোকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা যায়। এসব সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার যা টেকসই উন্নয়নের জন্যও বড় অন্তরায়। মানবজাতি যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ ও অপচয় করছে, সেই মাত্রা পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস ব্যতীত আন্তঃপ্রজন্মগত ন্যায্যতা রক্ষা সম্ভব নয়।[৫৭] সুতরাং আন্তঃপ্রজন্মগত ন্যায্যতা রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতীত বর্তমানে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

৪.৮ বাংলাদেশ ও টেকসই উন্নয়ন

বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পূর্বে এ পরিষদ হতে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সালে শেষ হওয়া জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশকে রোল মডেল বলেও অভিহিত করা যায়। কারণ গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্বস্বীকৃত।[৫৮] বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতার ধারাবাহিকতায় সাধারণ পরিষদ ২০৩০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধি, সততা ও সুবিচারের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী একটি টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য নতুন এজেন্ডা গ্রহণ করে যা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' নামে পরিচিত। জাতিসংঘ তার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পনেরো বছর মেয়াদে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাকে একত্রে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' নামে অভিহিত করা হয়। ২০১৬ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টম্বর তিনদিনব্যাপী জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয়েছে যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে (এমডিজি) প্রতিস্থাপন করে। যে-কোনো দেশের

প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে সে দেশের সরকার, ব্যক্তিখাত, বেসরকারি খাতসহ সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। বিগত বছরগুলোতেও দেশে এসডিজির বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে। যে উদ্যোগে পাঁচটি 'পি' অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো-পিপল (জনসমষ্টি), প্রোসপারিটি (সমৃদ্ধি), পিস (শান্তি), পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব) ও প্ল্যানেট (ধরিত্রী)।[৫৯] এই সমগ্র বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন কাঠামোকে নির্দেশ করে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে সম্পদ সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপ, প্রযুক্তি জোরদার করা, সক্ষমতা গড়ে তোলা, বাণিজ্য নির্বিঘ্ন করা ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সঙ্গতি বিধান। পদ্ধতিগত সংগতি বিধানের মধ্যে রয়েছে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন, উপাত্ত ও বহু-অংশীজন অংশীদারিত্ব এবং পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) ও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সন্নিবেশ ঘটানো; বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রয়োগ।[৬০]

৪.৯ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের জন্য যে ১৭টি অভীষ্ট বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো দেশের সরকারের পক্ষে এককভাবে এ বিশাল উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব না। এ অভীষ্ট অর্জনে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সমন্বয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন; মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি [Annual Performance Agreement (APA)] -তে এসডিজির সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলোর প্রতিফলন, নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তাদের সহায়তাকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ চিহ্নিতকরণ; নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় পরিকল্পনা (National Action Plan-NAP) প্রস্তুতকরণ; প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি চিহ্নিত করে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ; এসডিজির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) কাঠামো নির্দিষ্টকরণ এবং এসডিজির অর্থায়ন

কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে ‘সমগ্র সমাজ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে।[৬১]

দেশের সর্বস্তরের মানুষ যেন বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্ব-স্ব অবদান রাখতে পারে সেদিকে বাংলাদেশ অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। শুধু তাই নয়, এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব পরামর্শ সভায় বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পেশাজীবী, শ্রমিক সংঘ, নারী সংঘ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে থাকেন। এসব পরামর্শ সভার প্রধান উদ্দেশ্য এসডিজি অর্জনে সকল অংশীজনের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা, আগ্রহ ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি করা। যেমন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে রাজধানীর কাওরান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ‘এসডিজি ১২: অনলাইনে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ইউএনডিপি (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি), ইউএন এনভায়রনমেন্ট ও প্রথম আলো। এসডিজির ১২ নম্বর অভীষ্ট হচ্ছে-‘পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা।’ বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইন সেবাভিত্তিক বাজার বড় হচ্ছে। এর সঙ্গে বড় হচ্ছে ভোক্তাশ্রেণী। অনলাইনভিত্তিক সেবার ক্ষেত্রে ফরমাশ অনুযায়ী গন্তব্যে খাবার পৌঁছে দেওয়া (ফুড ডেলিভারি) বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু এতে পলিথিন বা প্লাস্টিকের ব্যবহার হয় প্রচুর। বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও পরিবেশসচেতন ভোক্তা তৈরিতে নজর দিতে হবে।[৬২]

১১ জুন ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমের যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘের সহযোগিতা কাঠামো (ইউএনএসডিসিএফ) ২০২২-২০২৬ এর যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। প্রথম জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা ২০২২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অভীষ্ট অর্জন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে মাঝে মাঝেই আলোচনা সভা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনা সভা ও সেমিনারের আলোচ্য বিষয়বস্তু, সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপ ও সফলতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এমন অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম যেন জবাবদিহিমূলক হয় এবং সার্বিকভাবে মানুষ ও পৃথিবীর কল্যাণ বয়ে আনে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৪.১০ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি অনুসরণ

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে যে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি, দলিল ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নকালে বাংলাদেশ সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (whole of society) পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডাঃ জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রস্তাব' প্রস্তুতকালে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিলো।[৬৩] এসডিজি বাস্তবায়নে সমগ্র সমাজ পদ্ধতিতে অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের গুরুত্বকেও বিবেচনায় রেখে এ পর্যন্ত 'এসডিজি অর্জনে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা' শীর্ষক তিনটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৬৪] এসব সভায় সরকার ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থার প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়ে থাকে। এ ধরনের সভার আয়োজন দেশের টেকসই উন্নয়নে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে যেমন উৎসাহিত করে তেমন দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যক্তিখাতের গুরুত্বকেও তুলে ধরে। এসডিজির অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ যেভাবে ব্যক্তিখাত, গণমাধ্যম ও অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণের কৌশল অবলম্বন করেছে তাতে বলা যায় এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে, যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

২০৩০ এজেন্ডার উদ্বোধনীর দিনে সংশ্লিষ্ট দেশের নেতারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সুফল সবার আগে পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ নেতারা স্বীকার করেন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সফল বাস্তবায়ন করতে হলে জাতিসংঘের অর্ন্তভুক্ত সকল দেশের সকল জাতির সকল ব্যক্তির আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি দান প্রয়োজন।[৬৫] সাধারণত দেখা যায়, উন্নয়ন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সুফল ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বলতে বিশ্বনেতারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। কারণ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সাধারণ সমস্যা হলো দারিদ্র্য, এখনো অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বিশ্বনেতাদের উদ্দেশ্য হলো, যারা আপেক্ষিক ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত করে সাফল্য অর্জনকারী মানুষের পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। অন্যদিকে মোট আয়ের ৩৮ শতাংশ রয়েছে মাত্র ১০ শতাংশের দখলে। এছাড়া কিছু এলাকা, যেমনঃ দেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকা, দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা, হাওর অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা পিছিয়ে রয়েছে। এর বাইরে দেশে বেশকিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চা-শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, যৌনকর্মী, পরিবেশগত শরনার্থী, প্রথাগত জেলে সম্প্রদায়, কাঠখোদাই মিস্ত্রি (ছুতার সম্প্রদায়), চরমভাবে অসুস্থ দরিদ্র মানুষ, গ্রামীণ চরম দরিদ্র মানুষ; বিশেষ করে বয়স্ক নারী, গৃহহীন বেকার ও তাদের পরিবার, শারীরিক ও

মানসিক প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র নারী।[৬৬] এসব জনগোষ্ঠী ও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার মূলে সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রমাণ রয়েছে। এসব জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) জন্য কতিপয় এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনার নীতি কাঠামোতে চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (১) আয়বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; (২) শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যখাতে বৈষম্য কমানো; (৩) সামাজিক জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ; এবং (৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।[৬৭] বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হলো, 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না'- নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কারণ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ব্যতীত যেমন বৈষম্য রোধ করা সম্ভব না তেমন সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কোনটাই অর্জন করা সম্ভব না।

৪.১১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় LNOB (Leave No One Behind) বিষয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য ছয়টি নির্দিষ্ট কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে:[৬৮]

কর্মসূচি ১: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কৌশলগতভাবে এলএনওবি তহবিল সংযুক্ত করা এবং এসব জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উপাত্তভান্ডার তৈরির নিমিত্ত সমন্বিত কৌশল গ্রহণ;

কর্মসূচি ২: কোনো নির্দিষ্ট এলাকা ও সম্প্রদায়ের প্রান্তিক পর্যায়ে পতিত হওয়া ঠেকাতে নির্দিষ্ট কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;

কর্মসূচি ৩: পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উপার্জন ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রাপ্যতা বাড়াতে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

কর্মসূচি ৪: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির ব্যবস্থা করা;

কর্মসূচি ৫: সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থ-রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো; এবং

কর্মসূচি ৬: সকল জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলপত্রে পিছিয়ে পড়া এলাকা ও জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ গুরুত্ব নিশ্চিতকরণ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত উল্লেখিত ছয়টি কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার এ পরিকল্পনা (২০২১-২৫) বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণই শুধু চিহ্নিত করেনি, বরং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। সরকারের জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত বেশকিছু বিষয়ের সাথে এ কর্মসূচিগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত;

যেমন: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়বৈষম্য কমানো, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথাযথ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী ও এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।[৬৯] এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়, তাহলো এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা আসলে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এজন্য এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সদা তৎপর থাকে সে বিষয়ে জাতীয় পর্যায় থেকে চাপ ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।

এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ যেমন নিশ্চিত করতে হবে তেমন স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য জাতীয় পর্যায় থেকে যথাযথ আর্থিক ও আইনি সহযোগিতাও প্রদান করতে হবে। এছাড়া যতদিন পর্যন্ত এলএনওবি নীতি বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করা না যায় ততদিন পর্যন্ত এ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার ও পরামর্শ সভার আয়োজন করতে হবে। অবশ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয়দের উদ্যোগে প্রতিটি গ্রামে চলছে গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভা। এসব সভায় কমিটির সদস্যরা সংশ্লিষ্ট গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে একটি মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কমিটির সদস্যরা নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে আবার কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতাও নিয়ে থাকে। এভাবে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ, গ্রামবাসী ও ইউনিয় পরিষদের মধ্যে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলএনওবি নীতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের[৭০] উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। যথা:

(১) স্থানীয় কর্মকৌশল ও নীতি/কর্মসূচিতে এলএনওবি দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ;
(২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত এলএনওবি অগ্রগতির বিশ্লেষণে কাজে লাগানো;
(৩) তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সক্ষমতা বাড়ানো এবং এলএনওবি বাস্তবায়নে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থানীয় সরকারকে সহায়তা প্রদান; এবং
(৪) এলএনওবি বাস্তবায়নকারী সকল অংশীজন ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

এলএনওবি নীতি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ নীতি সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে এমন অনেক এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান আছে যারা তৃণমূল জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে অনেক আগে থেকেই সরকারের কার্যকর সহায়ক হিসেবে কাজ করে আসছে। সার্বিক সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, নারীর অগ্রগতিতে সরকারের পাশাপাশি এসব এনজিওর ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেমন, বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান

কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নেও সহায়তা করে যাচ্ছে। সংস্থাটি এ পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৩০ লাখ মানুষের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করেছে। দেশব্যাপী ৫ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং তিন কোটি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সরবরাহ করেছে।[৭১] বাংলাদেশে ব্র্যাকের মতো আরোও অনেক বেসরকারি সংস্থা রয়েছে, যেগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অসুবিধাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি যে অবদান রেখে চলেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। সুতরাং এলএনওবির অভীষ্ট অর্জনে স্থানীয় সরকার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এলএনওবি নীতি কাঠামোর সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত সরকারের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্ট বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প গ্রহণ করছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। গত কয়েক বছর ধরে সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত বিপর্যয়ের যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার সময় এসেছে; সেটা হলো- টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ। কারণ পরিবেশের অবক্ষয় রোধ না করে যত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হোক না কেন সে উন্নয়ন কখনোই দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই হবে না। পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদী-নালা, আবহাওয়া-জলবায়ু প্রভৃতি অমানব সত্তাসমূহের সমন্বিত অবস্থাকে বোঝানো হয়। পরিবেশের অন্তর্গত এ সকল অমানব সত্তার প্রতিটি সত্তা স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ অধ্যায়ে উল্লেখিত সবগুলো সত্তা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা সম্ভব না। যেহেতু গবেষণা কার্যক্রমটি লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যার অখণ্ডতার নীতি'র আলোকে পরিচালিত হচ্ছে সেহেতু এ পর্যায়ে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব আলোচনা করা হবে। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বনভূমি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৪.১২ বাংলাদেশের স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক আলোচনা পরিবেশবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে দর্শনে পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। লিওপোল্ড সর্বপ্রথম তাঁর 'ভূমি নীতিবিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা করেন। বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যাবতীয় সত্তার (জীবীয় ও অজীবীয়) সমন্বিত অবস্থাকে তিনি ব্যাপক অর্থে 'ভূমি' নামে অভিহিত করেন। এ প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, ভূমির উপর বেড়ে ওঠা যাবতীয় সত্তার মধ্যে বনভূমির প্রতি মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করার দিকেই লিওপোল্ড অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ বনভূমি বলতে শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সমাহারকে বোঝায় না, বরং ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি, বিভিন্ন প্রজাতির অমানব প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহ, জীব-বৈচিত্র, খাদ্য-শৃঙ্খল এবং জলবায়ুর সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট

বনভূমি বা বনাঞ্চল। একটি দেশের ভৌগলিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বনভূমি হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানব সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বনভূমি মানুষের নানাবিধ চাহিদার নির্দিষ্ট যোগান দিয়ে আসছে; যেমন, মানুষ ও বিভিন্ন অমানব প্রাণিকে আশ্রয় প্রদান, বিভিন্ন বনজ সম্পদ সরবরাহ যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, জীব-বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা এবং যুগ যুগ ধরে শক্তিশালী সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে আসছে এই বনভূমি। এতো সুফল পাওয়ার পরেও মানুষের অর্থনৈতিক ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বনভূমির ক্রমশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য বনভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি করে লিওপোল্ড যেমন বনভূমি সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন তেমন টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অভীষ্টে বলা হয়েছে-'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা দান, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ'।[৭২] সুতরাং বলা যায়, এই অভীষ্টে বনভূমিসহ স্থলজ সকল অমানব সত্তার সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫-তে যে লক্ষ্য প্রণীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন টেকসই জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যাবে তেমন অন্যদিকে এ জীবনযাত্রা প্রজান্মান্তরে অব্যাহত থাকবে। স্থলজ ও অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের নানা ধরনের জীবের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ সামগ্রিকভাবে এসব প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো টেকসই জীবনযাত্রার পাশাপাশি ভূমিভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের সুফল নিশ্চিত করা, যে সুফল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই প্রজন্ম উপভোগ করতে পারবে। এ অভীষ্টে যে সকল বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে টেকসই উপায়ে বন ব্যবস্থাপনা, ভূমি ও প্রাকৃতিক বস্তুগত উপাদানসমূহের অবক্ষয় রোধ করা ও সংরক্ষণ করা, মরুকরণ সফলভাবে মোকাবিলা করা এবং জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতি কমানো।[৭৩] এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো- কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে যদি শুধুমাত্র টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে বাকি বিষয়গুলোও সয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। কারণ ভূমি ও প্রাকৃতিক বস্তুগত উপাদানের অবক্ষয়রোধ, মরুকরণ মোকাবিলা এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো টেকসই বন ব্যবস্থাপনার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক (লাভ-লোকসান) দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা সম্ভব। লিওপোল্ড তাঁর প্রবন্ধে ভূমির উপর অস্তিত্বশীল সকল অমানব সত্তার গুরুত্ব ও ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য বনভূমি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন যা প্রকারান্তরে টেকসই বন ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে আর টেকসই বন ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন হলো যে কোনো দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের অপরিহার্য একটি শর্ত। যদিও লিওপোল্ড তাঁর প্রবন্ধের কোথাও সরাসরি 'টেকসই উন্নয়ন' ধারণার কথা বলেননি বা এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও এ প্রবন্ধটি লেখননি, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এবং 'অখণ্ডতার নীতি' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের দিক নির্দেশনা রয়েছে।

জমির আয়তন হিসেবে বাংলাদেশ ছোট এবং ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। তবুও এখানকার বাস্তুতন্ত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বৈচিত্র্য রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ২০°২৫ মি. ও ২৬°৩৮ মি. উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১ মি. ও ৯২°৪০ মি. পূর্ব দ্রাঘিমার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪৪ লাখ (১৪.৪ মিলিয়ন) হেক্টর। এখানকার ভূমির বৈচিত্র্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্লাবনভূমি ৮০ শতাংশ, সোপান ভূমি আট শতাংশ এবং পাহাড়ি এলাকা ১২ শতাংশ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ মিটার বা ৩৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত।[৭৪] বাংলাদেশের স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্র কতিপয় গুচ্ছের সমন্বয়ে গঠিত। এ গুচ্ছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থলভাগ, ভূ-ভাগের পানিসম্ভার, বিভিন্ন শ্রেণীর বনভূমি এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। এই বাস্তুতন্ত্রসমূহের গঠনে রয়েছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো বড় তিন নদী। আরও রয়েছে এগুলোর ৭০০ এর বেশি উপনদী, শাখা নদী ও প্লাবনভূমি। প্রায় ছয় হাজার ৩০০ স্থায়ী বা মৌসুমী বিল (এগুলোয় কম পানি ধারণ ও প্লাবন সংঘটিত হয়), ৪৭টি বড় হাওড় (দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এগুলোর অবস্থান এবং এগুলো গভীরভাবে প্লাবন ভূমির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে), বাঁওড়, বিপুল আয়তনের মৌসুমি জলাভূমি এবং পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়। বাংলাদেশের অবস্থান প্রাচ্য অঞ্চলের ইন্দো-হিমায়ল এবং ইন্দো-চায়না উপ-অঞ্চলের মাঝামাঝিতে। এ কারণে বাংলাদেশ দুটি উপ-অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী ভূমি এলাকা, স্থলসেতু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জীববৈজ্ঞানিক করিডোর হিসেবে কাজ করে।[৭৫]

বাংলাদেশ জীব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ। এদেশে প্রায় ৭৫০ প্রজাতির পশু এবং ১০ হাজার প্রজাতির গাছপালা রয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে। বর্তমান এক হিসাবে উঠে এসেছে বাংলাদেশে ১৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৭১১ প্রজাতির পাখি, ১৭৩ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৬৫৩ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ১৮৫ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৩২৩ প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। বাংলাদেশ এর প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে প্রাণিকূলের আবাসের ধরন সংলগ্ন একটি মহাদেশীয় দেশ হওয়ায় এর কোন স্থানীয় প্রজাতি নেই।[৭৬] অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত সাদৃশ্য থাকার কারণে জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। মানুষের উপযোগবাদী মনোভাব ও অপরিপক্ক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্যের অনেক প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে। এসব প্রজাতি সংরক্ষণে এখনই পদক্ষেপ না নিলে অচিরেই বাংলাদেশ মারাত্মক পরিবেশগত সংকটের সম্মুখীন হবে।

২০০০ সালে প্রণীত আইইউসিএন-এর লাল তালিকা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৩টি প্রজাতিকে বিলুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে আরও অন্যান্য প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এই তালিকা পূর্ণমূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশের ওপর আইইউসিএনের লাল তালিকা (২০১৫) অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট প্রজাতির সংখ্যা ১,৬১৯। এ লাল তালিকায় বিলুপ্ত প্রজাতির মধ্যে ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ প্রজাতির পাখি, ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতির উভচর, বিভিন্ন খোলসযুক্ত প্রাণি ও কীটপতঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭৭]

আইইউসিএনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "অবশিষ্ট ১,৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৯০টি বা ৬০ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৮০২ প্রজাতি বা ৫০ শতাংশ কম উদ্বেগপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। আরও ২৭৮ বা ১৭ শতাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রে 'তথ্য ঘাটতি' রয়েছে। এর অর্থ মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত তথ্য অথবা সমর্থনকারী নথি না থাকায় এসব প্রজাতিকে 'বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত' করা যায়নি। ২৮ প্রজাতি অথবা শুধু ০২ শতাংশ 'মূল্যায়ন হয়নি' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে (আইইউসিএন, ২০১৫)"।[৭৮] বিপন্ন প্রজাতি বিষয়ক আইইউসিএন-এর লাল তালিকায় যেসব প্রজাতিকে ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদসংকুল বা মারাত্মকভাবে বিপদসংকুল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেসব প্রজাতিকেই বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, যেসব বন্য প্রজাতি মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্তির উচ্চ, অতিউচ্চ ও চরম মাত্রায় উচ্চ ঝুঁকিতে আছে, সেগুলোকেই বিপন্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা বিপন্ন প্রজাতির অনুপাতের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা অনেকটা নির্ভর করে এ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশ ও শ্রেণির পরিবর্তনের উপর।

সারণি ১: ২০০০ ও ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির তুলনা

শ্রেণি	২০০০ সালে রেড লিস্টে প্রজাতি		২০১৫ সালে রেড লিস্টে প্রজাতি	
	প্রজাতি সংখ্যা	বিপন্ন	প্রজাতির সংখ্যা	বিপন্ন
উভচর	২২	৮ (৩৬%)	৪৯	১০ (২০%)
সরীসৃপ	১২৭	৬৩ (৫০%)	১৬৭	৩৮ (২৩%)
পাখি	৬২৮	৪৭ (৭%)	৫৬৬	৩৯ (৭%)
স্তন্যপায়ী	১১৩	৪৩ (৩৮%)	১৩৮	৩৬ (২৬%)
খোলসযুক্ত প্রাণি	-	১৪১	১২ (৮.৭%)	-
প্রজাপতি	-	৩০৫	৫৭ (১৯%)	-

সূত্র: আইইউসিএন, ২০১৫

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২২, পৃষ্ঠা- ১৭৬

তৃতীয় অধ্যায়ে লিওপোল্ড বর্ণিত বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা থেকে জানা যায়, জীবগোষ্ঠী, মাটি, পানি ও বাতাসের মত অজৈব ও জৈব উপাদানসমূহের সমন্বিত অবস্থানকে বাস্তুতন্ত্র বলা হয়। এ জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে জীবগোষ্ঠীর জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই বনব্যবস্থাপনা অর্জনের জন্য বিশেষ করে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুতারোপ করা প্রয়োজন। কারণ উপরোক্ত সারণিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রজাতির ২০০০ সাল ও ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানের তুলনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৫ সালে এসে স্তন্যপায়ী প্রাণি, পাখি, সরীসৃপ প্রাণি, উভচর প্রাণি, বিভিন্ন খোলসযুক্ত প্রাণি ও কীটপতঙ্গকে বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে আইইউসিএনের লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০০০ সালে বিলুপ্ত প্রজাতির সংখ্যা যেখানে ছিল ১৩টি, সেখানে ২০১৫ সালে এসে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আইইউসিএন কর্তৃক ২০২৩ সালে উদ্ভিদ প্রজাতির উপর পরিচালিত জরিপ থেকে জানা যায়, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে সাত প্রজাতির উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা

দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে)। ক্রমান্বয়ে এভাবে যদি বিভিন্ন স্থলজ প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তাহলে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্যহীন অবস্থা দেখা দেবে।

লিওপোল্ড একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে জীব পিরামিডের সাথে তুলনা করেন, যে পিরামিড নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত। সবচেয়ে নিচের স্তরে রয়েছে ভূমি বা মাটি এবং পর্যায়ক্রমে ভূমির উপরের স্তরগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও উদ্ভিদসহ অন্যান্য অমানব সত্তাসমূহ। এ সত্তাসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খাদ্য-শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে যে শক্তিপ্রবাহ তৈরি হয় তা বাস্তুতন্ত্রের নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সঞ্চালিত হয়ে বিভিন্ন অমানব সত্তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রজাতির তালিকার পরিধি যেভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে বাংলাদেশের পক্ষে টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যদিও আইইউসিএন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে তেমন অন্যদিকে জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার কাজও অব্যাহত রেখেছে, তারপরও বাংলাদেশের জনগণ যতদিন পর্যন্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে পরিবেশ ও অমানব সত্তার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত যথার্থ অর্থে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব না।

প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএন, বাংলাদেশে এর কার্যক্রমের ৫০ বছর এবং একই সাথে বৈশ্বিক কার্যক্রমের ৭০ বছর পূর্তি হয়েছে।[৭৯] এ দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠনটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবেশব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণি রক্ষায় অবদান রেখে চলেছে। আইইউসিএন-এর সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংস্থা (প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক) রয়েছে যারা এ দেশের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মানুষকে সচেতন করে থাকে। আইইউসিএনের উদ্দেশ্য হলো, প্রতিটি দেশের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধানে অগ্রসর হোক। কারণ, প্রতিটি দেশের নিজস্ব নিয়ম এবং অগ্রাধিকার যেমন রয়েছে তেমন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সমস্যাও রয়েছে। সংগঠনটির বৈশ্বিক কার্যালয়ের মোট তহবিলের অর্ধেক অর্থ সদস্যদেশগুলোকে প্রকৃতি সুরক্ষার কাজে যোগান দিয়ে থাকে। ৯০টি দেশে এক হাজারের বেশি সদস্য এবং ৮০টি জাতীয় কমিটি রয়েছে।[৮০] এ সংগঠনের কিছু নীতিমালা ও নৈতিক ভিত্তি রয়েছে যা স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক সব পর্যায়ে অনুসরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সংগঠনের সদস্যদের নিজ এলাকায়, নিজ দেশে, আঞ্চলিকভাবে ও বৈশ্বিকভাবে একসাথে কাজ করতে হবে। কোথাও প্রকৃতি ধ্বংসের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট অবস্থান থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প কখনোই টেকসই হবে না। এজন্য প্রকৃতি ও জীব-বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে-এ বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আইইউসিএন যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।'[৮১] 'বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২'-এ আরেক দফা বন্যপ্রাণি, বন ও জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি বিষয়ে পাঁচটি বড় আন্তর্জাতিক আইনে অনুস্বাক্ষর করেছে। এগুলো হলো- বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণি ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিরোধ-বিষয়ক কনভেনশন (CITES) ১৯৭৩, পরিজায়ী প্রজাতির বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন ১৯৭৯, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন ১৯৯২, রামসার কনজারভেশন ১৯৭১ এবং বিশ্বঐতিহ্য কনভেনশন ১৯৭২।[৮২] ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ বাস্তবায়নের জন্য বেশিকিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং পদক্ষেপ গৃহীত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) এ এজেন্ডাকে আবারো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং সেই মোতাবেক অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে, যাতে করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উভয় ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ পরিকল্পনায় উন্নয়নের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আর এ-সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮৩]

স্থলজ বাস্তুসংস্থানের সত্তাসমূহ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপরও থেমে নেই যথেচ্ছ বন উজাড়, ভূমির অবক্ষয়, শিকারি প্রজাতি এবং অবৈধ শিকার ও বন্যপ্রাণি পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য। আর এ সকল কারণে আশঙ্কাজনক হারে বিলুপ্ত হচ্ছে স্থলজ অমানব সত্তাসমূহ। এ অবস্থায় স্থলজ জীব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ স্থানগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। স্থলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের দুটি স্থানকে 'রামসর সাইট' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।[৮৪] এগুলো হলো টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম। সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পুরো সুন্দরবন এলাকা ১৯৯৭ সালে বিশ্বঐতিহ্য এলাকা (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।[৮৫] দুটি আলাদা আইনের অধীনে বাংলাদেশ সংরক্ষিত এলাকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন-১৯৭৪' এবং 'বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আইন-২০১২'। প্রথম আইনের অধীনে তিন ধরনের সংরক্ষিত অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো-জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম ও বন্যপ্রাণির অবাধ বিচরণক্ষেত্র বা গেম রির্জারভার। দ্বিতীয় আইনের অধীনে সংরক্ষিত অঞ্চলগুলোকে বলা হয় জাতীয় উদ্যান, অভয়াশ্রম, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কমিউনিটি কনজারভেশন, সাফারি পার্ক ও কুঞ্জবন।[৮৬]

উপরোক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, টেকসই উন্নয়ন হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক উন্নয়নের টেকসই ফলাফলকে শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয় বরং ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত করা। তবে একথা অনস্বীকার্য যে,

বর্তমানে গৃহীত যে-কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হলে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিবেশগত বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহে ২০৩০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধি, সততা ও সুবিচারের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী একটি টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' নামে নতুন এজেন্ডা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলেও এ সকল অংশীজনের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনার বিশ্লেষণ থেকে মনে হয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন অর্জন ও বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নৈতিকতার অবক্ষয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১৫ নম্বর অভীষ্টটি (যা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধুমাত্র নৈতিকতার অভাবের কারণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ অভিষ্টটির বাস্তবায়ন করা শুধু কষ্টসাধ্য না দুরুহ ব্যাপারও বটে। কারণ বাংলাদেশের স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের অমানব সত্তাসমূহের (বনভূমি ব্যতীত) বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ সকল অমানব সত্তার অস্তিত্ব একইসাথে সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য টেকসই বন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশের জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন কোনো দেশের জন্য যত উন্নয়ন প্রকল্পই গ্রহণ করা হোক না কেনো তা কখনোই টেকসই হবে না। এজন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে (নবায়ন-অযোগ্য) মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে (সবল টেকসই উন্নয়নও একই সুপারিশ করে) এবং নবায়নযোগ্য ও শিল্পজাত পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের সকল মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে নিয়মিত সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও বাস্তবায়নে যদি অর্থনৈতিক ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গকে কম গুরুত্ব দিয়ে নৈতিক চেতনা ও সংরক্ষণবাদী মনোভাব বিস্তৃতির মাধ্যমে (লিওপোল্ড অনুসারে) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তাহলে অচিরেই বাংলাদেশকে সুখী, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

তথ্যপঞ্জি

১. ড. মাহবুবা নাসরীন, ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন এবং দেবাশীষ কুমার কুন্ডু, *পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২২১।

২. John Small & Michael Witherick, *A Modern Dictionary of Geography*, ARNOLD, London, 1995, P. 66.

৩. Development is a comprehensive econimic, social, cultural and Political Process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population

and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting therefrom. দেখুন, United Nations, *Declaration on the right to development*, 1986, Preamle Paragraph-21.

৪. W.B. Gallie, "Essentially Contested Concepts", *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol.56, 1955-56, Oxford University Press, P. 167-198.

৫. Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal and John A. Boyd, *An Introduction to Sustainable Development*, Earthscan, London, 2008, P. 42.

৬. *প্রাগুক্ত*, P. 9.

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. দেখুন, World Commission on Environment and Development, WCED, 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, P. 43. এই সংজ্ঞা Brundtland Report-এর সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত।

৯. দেখুন, International Union for Conservation of Nature/World Conservation Union, IUCN, 1980, World Conservation Strategy, IUCN, Gland এবং IUCN, 1991, Caring for the Earth, IUCN, Gland.

১০. Improving the quality of life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems. দেখুন, "Michael Jacobs, Sustainable Development: A Contested Concept," In Andrew Dobson (ed.), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford University Press, 2002, P. 23.

১১. "On the need to ensure a better quality of life for all, now, and into the future, in a just and equitable manner, while living within the limits of supporting ecosystems." দেখুন, Julian Agyeman, Robert D. Bullard and Bob Evans (ed.), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, EARTHSCAN Publications Ltd., London, 2003, P. 2.

১২. M. Jacobs, *The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future*, Pluto Press, London, 1992. দেখুন, Julian Agyeman et al. (eds), *প্রাগুক্ত*, P. 5.

১৩. *প্রাগুক্ত*, PP. 5-6.

১৪. Robin Attfield, *Environmental Ethics*, Polity Press, UK, 2003, P. 132.

১৫. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, জুন ২০২০, পৃ. ৩৪।

১৬. *প্রাগুক্ত*।

১৭. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ* (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ৭-৮।

১৮. কালীপ্রসন্ন দাস, *পরিবেশদর্শন মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পরিপোষক উন্নয়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৭৮।

১৯. *প্রাগুক্ত*।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

২১. Julian Agyeman et al. (eds), *প্রাগুক্ত*, p. 2.

২২. Kristia Shrader-Frechatte, *Environmental Justice: Creating Equality, Reclaiming Democracy*, Oxford University Press, London, 2002, PP. 23-24.
২৩. John Nolt, *Environmental ethics for the long term: An introduction*, Routledge, New York, 2015, P. 84.
২৪. কালীপ্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।
২৫. John Nolt, *প্রাগুক্ত*, P. 85.
২৬. *প্রাগুক্ত*।
২৭. ইমানুয়েল কান্ট, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, সাইয়েদ আবদুল হাই অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২,পৃ. ২৫।
২৮. যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (EPA) জনগণ এবং পরিবেশকে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং গবেষণা পরিচালনা করে এবং পরিবেশগত প্রবিধান তৈরি ও প্রয়োগ করে। ১৯৭০ সালের ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের নেতৃত্বে মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
২৯. John Nolt, *প্রাগুক্ত*।
৩০. *প্রাগুক্ত*।
৩১. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *কান্টের দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১০৭।
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।
৩৩. *প্রাগুক্ত*।
৩৪. John Nolt, *প্রাগুক্ত*, P.86.
৩৫. মাকিলাডোরা হলো মেক্সিকোর উৎপাদন কারখানা যা ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ডিক্রির অধীনে দেশের বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়ন সচিবালয় দ্বারা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত এবং বিদেশী সংস্থাগুলির মালিকানাধীন। মাকিলাডোরা মেক্সিকো ও আমেরিকান সীমান্তে অবস্থিত হলেও এটি আমেরিকার মূল কোম্পানির প্রশাসনিক সুবিধা দ্বারা পরিচালিত হয়।
৩৬. John Nolt, *প্রাগুক্ত*।
৩৭. বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৭ নভেম্বর, ২০২২।
৩৮. *প্রাগুক্ত*।
৩৯. *প্রাগুক্ত*।
৪০. *প্রথম আলো পত্রিকা*, ১২ নভেম্বর, ২০১৩।
৪১. *প্রাগুক্ত*।
৪২. *প্রাগুক্ত*।
৪৩. R. Attfield, *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century*, Polity Press, Cambridge, 2003, P. 119. দেখুন, রাশিদা আখতার খানম, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০৪।
৪৪. T. Feinberg, "The Rights of Animals and Unborn Generations", in T.A. Mappes and J.S. Zembaty, ed., *Social Ethics: Morality and Social Policy,* McGraw-Hill, New Yorks, 1987, P. 492. দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
৪৫. Jasim Uddin, "Responsibility to Future Generations and the Argument from TemPoral Distance", The Dhaka University Studies, December 2006, P. 26.
৪৬. Joseph R. Des Jardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy,* Wadsworth Publishing Co. Belmont, USA, 2001, P. 72.
৪৭. *প্রাগুক্ত*, P. 76.
৪৮. যেমন, ১৯৭২ সালের ১৬ নভেম্বর General Conference of United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, "Convention for the Protection of the World Culture and National Heritage" গ্রহণ করে। ১৯৯০ সাল থেকে United Nations General

Assembly বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশ্ব আবহাওয়া রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালের ৫ জুন Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity" গৃহীত হয়। একই সালের ১৪ জুন United Nations Conference on Environment and Development কর্তৃক Rio Declaration on Environment and Development গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালের ২৫ জুন World Conference on Human Rights কর্তৃক Vienna Declaration and Program of Actions গৃহীত হয়।

৪৯. দেখুন, Records of the General Conference, Volume-1, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 1998, PP. 70.

৫০. Article 1-The Present generations have the responsibility of ensuring that the needs and interests of present and future generations are fully safegaurded.
Article 4-The Present generations have the responsibility to bequeath to future generations and Earth which will not one day be Irreversibly damaged by human activity. Each generation inheriting the Earth temporarily should take care to use natural resources reasonably and ensure that life is not prejudiced by harmful modifications of the ecosystem and that scientific and technological progress in all fields does not harm life on Earth.
Article 5.1- In order to ensure that future generations benefit from the richness of the Earth's ecosystems, the Present generations should strive for sustainable development and preserve living conditions, Particularly the quality and integrity of the environment. 3. The Present generations should preserve for future generations natural resources necessary for sustaining human life and for its development.
Article 6- The human genome, in full respect of the dignity of the human person and human rights, must be protected and biodiversity safeguarded. Scientific and technological Progress should not in any way impair or compromise the Preservation of the human and other species. দেখুন, Records of the General Conference, Volume-1, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 1998, PP. 70-71.

৫১. W. Rees, "Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out", *Environment and Urbanization,* Vol. 4(2), 1992, PP. 121-130, and W. Rees, "Revisiting carrying capacity: Area-based indicators of sustainability", *Population and Environment*, Vol. 17. (3), 1996, PP. 195-215. দেখুন, Julian Agyeman et. al. (eds), *প্রাগুক্ত*, P. 109.

৫২. M. Wackernagel, et al. 'National natural capital accounting with the ecological footprint concept'; *Ecological Economics*, Vol. 29, PP. 375-390, 1999. দেখুন, Julian Agyeman et. al. (eds), *প্রাগুক্ত*, P. 110-111.

৫৩. *প্রাগুক্ত*, P. 111.

৫৪. *প্রাগুক্ত*।

৫৫. *প্রাগুক্ত*।

৫৬. *প্রাগুক্ত*, PP. 111-112.

৫৭. Duncan Mclaren, "Environmental Space, Equity and the Ecological Debt", in Julian Agyeman et al. (eds), *প্রাগুক্ত*, P. 20.

৫৮. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২০, পৃ. ২২।

৫৯. *প্রাগুক্ত*।

৬০. *প্রাগুক্ত*।
৬১. *প্রাগুক্ত*।
৬২. *প্রথম আলো পত্রিকা*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২,পৃ. ১৬।
৬৩. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।
৬৪. *প্রাগুক্ত*।
৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।
৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।
৬৭. *প্রাগুক্ত*।
৬৮. *প্রাগুক্ত*।
৬৯. *প্রাগুক্ত*।
৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।
৭১. *প্রথম আলো পত্রিকা*, ২০ মার্চ ২০১৭।
৭২. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ১৬৭।
৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯।
৭৪. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।
৭৫. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।
৭৬. *প্রাগুক্ত*।
৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।
৭৮. *প্রাগুক্ত*।
৭৯. *প্রথম আলো পত্রিকা*, ২৩ মার্চ ২০২৩।
৮০. *প্রাগুক্ত*।
৮১. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।
৮২. *প্রাগুক্ত*।
৮৩. *প্রাগুক্ত*।
৮৪. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।
৮৫. *প্রাগুক্ত*।
৮৬. *প্রাগুক্ত*।

পঞ্চম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশে বনভূমির চালচিত্র

যে-কোনো দেশের উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশে অবস্থিত বনভূমিসমূহ এবং এসব বনভূমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা অমানব সত্তাসমূহকেও বিবেচনা করা হয়। বনভূমি ও অমানব সত্তাসমূহ হলো একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি একটি দেশকে বসবাসের উপযুক্ত রাখে। এ প্রক্রিয়া যদি দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী হয় অর্থাৎ এর সুফল যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহলে তাকে টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা হিসেবে অভিহিত করা যায়। বর্তমানে জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো টেকসই উন্নয়ন অর্জনে টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপরও অধিক গুরুত্বারোপ করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১৫ নম্বর অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি দেশের বনভূমি এবং বনভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি দেশের ভৌগলিক পরিবেশের সবগুলো উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বনভূমি। কারণ বনভূমি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদই নয়, বরং যে কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে বনভূমি হলো জীবন ও জীবিকার উৎস, অমানব প্রাণির নিরাপদ আশ্রয়স্থল, ভূমি রক্ষাকারী এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ রক্ষাকারী। সামগ্রিক অর্থে বনভূমিকে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক লোভ-লালসা এবং অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বনভূমির উপর ; ফলে ধ্বংস হচ্ছে বনভূমি। পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করা। এজন্য মানুষ ধীরে ধীরে বনভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষের দিকে দর্শনে বনভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনার সূত্রপাত করেন লিওপোল্ড তাঁর "ভূমি নীতিবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেন, ভূমি এবং ভূমির উপর জন্মানো প্রাণি ও উদ্ভিদের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে এখনও কোনো নীতিমালা তৈরি হয়নি। ওডিসিয়াসের দাসীদের মতো (বিস্তারিত আলোচনা দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে) ভূমিকে এখনও সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভূমির সাথে মানুষের সম্পর্ক আজও কেবল অর্থনৈতিক- যেখানে অধিকার আছে, কিন্তু দায়িত্বের কোনো বালাই নেই।[১] লিওপোল্ড সর্বপ্রথম নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বনভূমিকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্তমান অধ্যায়ে লিওপোল্ডের উক্ত প্রবন্ধের সমগ্রতাবাদী মতবাদের অখণ্ডতার নীতির আলোকে বাংলাদেশের বনভূমি, বনভূমির শ্রেণিবিভাগ, বর্তমান অবস্থা, বনভূমি বিনাশের কারণ ও প্রভাব, টেকসই উন্নয়নে বনভূমির গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও বনভূমি একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জন করতে হলে এ দেশে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য; এই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে বনভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বনভূমি শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

মোকাবিলা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কারণে দেশের বনভূমি আজ সংকটাপন্ন। যদিও বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনীয় মানের তুলনায় অনেক কম, তারপরও যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যেতে পারে। কারণ টেকসই উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ ও সুযোগকে সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জন করতে হলে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় উপাদানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনার জন্য বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ এবং বিলুপ্তপ্রায় বনভূমির পুনরুদ্ধার ও জীব-বৈচিত্র্যের বিলুপ্তিসাধন রোধ করা প্রয়োজন।

৫.১ বনভূমি

"যে ভূমি ০.৫ হেক্টরের বেশি বিস্তৃত এবং যেখানে ৫ মিটারের বেশি উচ্চতার গাছ রয়েছে এবং ছাউনির ঘনত্ব ১০ শতাংশের বেশি, অথবা যে গাছসমূহ এই উচ্চতা ও ঘনত্ব অর্জন করতে সক্ষম, তাকে বনভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এটি মূলত কৃষি বা নগরায়িত ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করে না।"[২]

বনভূমির এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কোনো সাধারণ ভূমিকে বনভূমি হিসেবে বিবেচিত হতে হলে সেখানে অবশ্যই গাছের উপস্থিতি থাকতে হবে এবং গাছগুলোকে কমপক্ষে ৫ মিটার উচ্চতায় পৌঁছানোর সক্ষমতা থাকতে হবে। যে বনাঞ্চলের গাছগুলো এখনও ছোট অর্থাৎ ৫ মিটার উচ্চতায় পৌঁছায়নি বা ছাউনির ঘনত্ব ১০ শতাংশের কম কিন্তু ভবিষ্যতে এ সকল শর্ত পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাকেও বনভূমির অর্ন্তভুক্ত করা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো বনভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও যদি তা পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে বনভূমি বলা যাবে। জাতীয় উদ্যান, প্রকৃতি সংরক্ষণ এলাকা এবং পরিবেশগত, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষিত এলাকাও বনভূমির অংশ। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের যে-কোনো ধরনের ভূমিতে অবস্থিত বনও বনভূমির অন্তর্ভুক্ত। আবার যেসব এলাকা আইনি সংজ্ঞানুযায়ী বনভূমি নয়, কিন্তু বনভূমির সংজ্ঞার শর্ত পূরণ করে সেগুলোও বনভূমি হিসেবে স্বীকৃত হবে।

৫.২ বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২৬০০০০০ হেক্টর বনভূমি রয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭%।[৩] এ বনভূমিসমূহ বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে নয়, বরং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর খুলনা, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত। এ সকল জেলার বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে বনভূমিগুলো গড়ে উঠেছে বলে এ বনভূমিসমূহের বৈশিষ্ট্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে দেশে একটি নতুন বননীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ নীতি গ্রহণকল্পে ১৯৭২ সালে নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়। 'সকলের জন্য বন'-এই শ্লোগানকে সামনে

রেখে সংরক্ষিত বনের বাইরেও বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য পতিত ও প্রান্তিক জমিতে এবং গ্রামাঞ্চলের বনেবাদাড়ে বৃক্ষরোপণের উপর যেমন গুরুত্বারোপ করা হয় তেমন জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৪] ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে বনভূমির প্রশাসনিক কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন থেকেই সামাজিক বনায়নের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয় এবং যেসব জেলায় বন ছিল না অথবা কম ছিল সেসব জেলাকে সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়। রংপুর, বগুড়া ও যশোরে দুটি নতুন সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃক্ষহীন অশ্রেণীকৃত সরকারি বনে গাছ লাগানোর জন্য খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কাপ্তাই ও রাঙামাটিতে বন বিভাগ গড়ে তোলা হয়।[৫]

৫.৩ বনভূমির শ্রেণীবিভাগ

বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনভূমিকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।[৬] যেমন: ১। ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন (Tropical wet evergreen forest), ২। ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন (Tropical semi-evergreen forest), ৩। ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বন (Tropical moist deciduous forest), ৪। জোয়ারধৌত বন (Tidal forest), ৫। কৃত্রিম বন (Plantation)।

৫.৪ ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন

সাধারণত এই ধরনের বনে চিরসবুজ গাছগাছালির প্রাধান্য সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্র্য থাকে। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলায় এ ধরনের বনভূমি অবস্থিত। কিছুটা আধাচিরসবুজ ও পত্রমোচী বৃক্ষ থাকলেও বনের চিরসবুজ চেহারার কখনোই পরিবর্তন হয় না। এ বনভূমির বৃক্ষসমূহ ৪৫-৬২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ জাতীয় বনে ৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদসহ সাধারণ চিরহরিৎ প্রজাতির বৃক্ষ (যেগুলো সর্বোচ্চ ছাউনি সৃষ্টি করে), আধাচিরহরিৎ বৃক্ষ এবং দ্বিতীয় স্তরের ছাউনি সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ রয়েছে।[৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনকে চিরসবুজ বন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এ বনকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন, ১. সংরক্ষিত বন, ২. রক্ষিত বন এবং ৩. অশ্রেণিভুক্ত বন।[৮] পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১০ শতাংশ। এর মধ্যে সংরক্ষিত বন ৭৯৬, ১৬০ একর বা ১,২৪৪ বর্গমাইল যা পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৪ শতাংশের মতো। রক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩৪,৬৮৮ একর বা ৫৪.২০ বর্গমাইল যা পার্বত্য চট্টগ্রামের ১ শতাংশের মত বাকি ২,৪৬৩,০০০ একর বা ৩,৮৪৮ বর্গমাইল যা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭৫ শতাংশ অশ্রেণিভুক্ত বন।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনে জারুল, গামার, গর্জন, চাপালিশ, টুন, কড়ই, সিভিট, চাম্পা, শিমুল, চান্দুল প্রভৃতি প্রজাতির মূল্যবান বৃক্ষ ছিল এক সময়। এসব গাছের দৈর্ঘ্য ছিল অনেক লম্বা, যার অধিকাংশই ডেসিডিউয়াস এবং সেমি-ডেসিডিউয়াস। বৃহৎ গাছের মাঝে ছোট ছোট গাছপালা ও লতাপাতার স্তর হলো চিরসবুজ বনের বৈশিষ্ট্য। এসব গাছের মধ্যে কোনো কোনো গাছের পাতা শীত মৌসুমে ঝড়ে পড়ে আবার কোনোটার পাতা ঝড়ে গ্রীষ্ম মৌসুমে। এজন্য পাহাড়ি বন কখনোই তার সবুজ প্রকৃতি হারায় না। তবে পাহাড়ি বনে অবস্থিত উক্ত প্রজাতির অনেক গাছই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পাহাড়ের এ চিরসবুজ বনে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ছাড়াও বাঁশ, ঘাস এবং শন রয়েছে যা অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১০]

শুধুমাত্র এসব প্রজাতির বৃক্ষ এবং পাহাড়ই পার্বত্য চট্টগ্রামের বনের মূল সম্পদ নয়; এখানকার জীব-বৈচিত্র্যও এ বনের আলাদা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এক সময় বাইসন, সাম্বর, বাকিং ডিয়ার, লেপার্ড, বেঙ্গল টাইগার, প্যান্থার এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণি পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র দেখা যেতো। তবে বর্তমানে এসব বন্যপ্রাণির অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা থাকলেও খুব কম দু'একটি দেখা যায়। বাঘও বিলুপ্ত হয়ে গেছে এ বন থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এ পাহাড়ী বনে বিশাল আকৃতির বন্য হাতি বসবাস করে এবং ইম্পেরিয়াল পিজন, গ্রীণ পিজন, হোয়াইট-উইংড, উড-ডাক, ময়না, ভিমরাজ প্রভৃতি আকর্ষণীয় প্রজাতির পাখি রয়েছে।[১১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক চতুর্থাংশ সংরক্ষিত বন।[১২] এ সময়ে পাহাড়ী বনে স্থানীয় মানুষের অধিকার সংকুচিত হলেও প্রকৃতির বিনাশ তখনো ততটা হয়নি। প্রকৃতি বিনাশের বড় ঘটনা ঘটতে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যখন বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয় তখন ৬০০ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। চাকমা সার্কেল প্রধান দেবাশীস রায় বলেন, "পাহাড়ি মানুষের ওপর মনুষ্য-সৃষ্ট সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল কাপ্তাই ড্যাম। এতে লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। ৫৪ হাজার একর সেরা চাষের জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ৭০ বর্গকিলোমিটারের সংরক্ষিত বনও নষ্ট হয়।"[১৩] অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৯৫৩ সালে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় পাহাড়ের চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিল চালু হয়। এ মিলের প্রধান কাঁচামাল ছিল পাহাড়ী বনের বাঁশ। পরবর্তীতে এ কারখানার কাঁচামাল যোগান দেয়ার জন্য পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় তৈরি করা হয় নরম কাঠের (পাল্পউড) বনবাগান। প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার একর জমিতে পাল্পউড চাষ হয়, এর মধ্যে ১৭ হাজার একরের সংরক্ষিত বনও ছিল।[১৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ সম্পর্কে পরিবেশবিদ ফিলিপ গাইন বলেন, "এই পাল্পউড বা নরম কাঠের চাষ একধরনের মনোকালচার। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশগত এবং সামাজিক উদ্বেগের বিষয় হলো এই মনোকালচার।"[১৫] অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বলা হয় পৃথিবীর কয়েকটি বহু বৈচিত্র্যের বড় এলাকার (মেগা ডাইভারসিটি হটস্পট) একটি। এ বৈচিত্র্য তার বৃক্ষে, প্রাণিতে, নদীতে, এমনকি মানুষে।[১৬]

সাম্প্রতিক সময়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ পাহাড়িদের মধ্যে উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। সংরক্ষিত বন সম্প্রসারণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষেরা এতোদিন যে জায়গা-জমি ও স্থানীয় সম্পদ নিজেদের বলে জেনে এসেছে সেগুলো সরকারিকরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বন সম্প্রসারণের এ প্রক্রিয়া এবং কাগজ ও মণ্ড শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য পাল্প প্লান্টেশন প্রাকৃতিক বন এবং বনবাসীর ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার রক্ষা কমিটির হিসাব অনুযায়ী, "বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে তিন পাহাড়ি জেলার ৮৩টি মৌজার ২১৭,৭৯০.৩ একর ভূমি সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ১৪০,৩৪১.৩১ একর চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।"[১৭] এভাবে সংরক্ষিত বন সম্প্রসারণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূমি এবং সর্বোপরি জীব-বৈচিত্র্যও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইংরেজ প্রশাসক হিসেবে ১৮৯০ সালে দায়িত্ব পেয়েছিলেন আর এইচ স্নেইড হাচিনসন। তাঁর লেখা *অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি পাহাড়ের 'রাজসিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের' বর্ণনা তুলে ধরেছেন। হাচিনসন বলেন, "পুরো জেলা যেন ছবির মতো। পাড়া আর উপত্যকার এক মেলবন্ধন এখানে। এ পাহাড় মোড়া বিপুল সবুজে। সেখানে চলে আলো আর ছায়ার খেলা। ... পাহাড়ের নদীগুলো ছুটছে সাগরপানে। বুকে ঝলমলে পানি নিয়ে এসব নদী ছুটে চলেছে, যেন ঝলমল করছে তরল সোনা। এ ছবি ভোলা যায় না সহজে।"[১৮] চট্টগ্রামের পাহাড়ী বন সম্পর্কে হাচিনসনের এ মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলের পাহাড়ি বনভূমি ছিল সবুজ সম্পদের উৎকৃষ্ট লীলাভূমি। কিন্তু এ অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্ত হওয়ার পর থেকেই বনের ওপর থেকে স্থানীয় মানুষের অধিকার খর্ব হতে থাকে। ১৮৭৫ সালে প্রথম মাইনি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষিত হয়। এরপর থেকে একে সীতাপাহাড়, মাতামুহুরী, কাসালং, সাঙ্গু ও বাইংখং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। পাহাড়ে অন্তত ২৪ শতাংশ বনকে সংরক্ষিত বনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯]

সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামের পাহাড়ে বন বিনাশের একটি চিত্র উঠে এসেছে। 'ভ্যালুয়েশন অব ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ফ্রম বিলেজ কমন ফরেস্টস ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস' শীর্ষক এক গবেষণায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি সায়েন্স বিভাগের অধীনে এই গবেষণা পরিচালনা করেছেন মংহ্লা ম্যান্ট। তিনি তাঁর গবেষণায় ২০০২ সালে থেকে ২০২৩ সালের বন বিনাশের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায়, এ সময়ের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলার ৬ হাজার ৯৭০ হেক্টর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে গেছে। এর মধ্যে রাঙামাটিতে ১০ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ এবং বান্দরবানে ১২ শতাংশ বন ধ্বংস হয়েছে।[২০]

চলতি বছরের অর্থাৎ ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'বন ও খাদ্য'। এ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি স্তম্ভ হলো বন। এই বন লাখ লাখ পরিবারের আবাসস্থল। বননির্ভর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও গ্রামীণ মানুষের ফলসহ নানা খাদ্য, বীজ, মাংসের মৌলিক উৎস। তবে বন শুধু খাদ্যের সংস্থান করেই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না, এটি জ্বালানিরও উৎস। বন জীব-বৈচিত্র্যের বড় এক আধার। মাটির পুষ্টি, কৃষির উৎকর্ষ আর জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণে বনের ভূমিকা অনবদ্য।[২১]

জাতিসংঘের মতে, বনের পানির আধার থেকে বিশ্বের মোট ৮৫ শতাংশের বেশি নগরবাসীর পানির চাহিদা মেটে। যে কোনো কঠিন সময়ে বন বিশ্বের অন্তত ২০ শতাংশ মানুষকে খাবার সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এই বন-বাস্তুতন্ত্র এখন এক জটিল অবস্থার মধ্যে পড়েছে বলেই মনে করে জাতিসংঘ। প্রতি বছর এক কোটি হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়। জাতিসংঘ মনে করে এই গ্রহ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বর্তমানে বন সুরক্ষা করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২২]

জাতিসংঘের উক্ত তথ্যানুসারে বলা যায়, বন বা বনভূমির সাথে পানির একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ অধিকাংশ পাহাড়ী বনভূমি থেকে ঝরনা এবং নদীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। এ সকল ঝরনা ও

নদীর পানি প্রবাহ সংশ্লিষ্ট ঐ বনভূমির উপর নির্ভরশীল। বনভূমির সাথে ঝরনা ও নদীর পানি প্রবাহের পারস্পরিক এ নির্ভশীলতার সম্পর্ককে নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা যাক-

১৯৭০-এর দশকে সারা বছর রাঙামাটি থেকে লঞ্চে করে বাঘাইছড়ি সদর পর্যন্ত যাওয়া যেত। এখন বছরের অর্ধেক সময় সদর পর্যন্ত তো দূরের কথা, নদীর অর্ধেক পথই যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, কাসালং নদের প্রবাহ অনেকটাই কমে গেছে। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা নদের প্রবাহে বনের প্রভাবকে দায়ী করেন। বন থাকলে থাকে ঝরনা বা ঝিরি, সেখানে পানির প্রবাহ থাকে। বন হলো পানির প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার। কিন্তু কাসালং সংরক্ষিত বন হওয়ার পরেও এর বড় অংশ এখন বিরাামভূমি। পাহাড়ি এ বনের সবচেয়ে বড় উপাদান বাঁশ, বিভিন্ন প্রজাতির গাছ সবই প্রায় বিলুপ্তির পথে। এতে শুধু বন বা নদীর মতো প্রাকৃতিক সম্পদই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না; পানির কষ্ট, পেশা হারানোর মতো সমস্যায়ও পড়ছেন বনবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা।[২৩]

উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পানি বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘বনের গাছগুলো ছাতার মতো দাঁড়িয়ে মাটিতে সঞ্চিত পানিকে আগলে রাখে। সেই ছাতা উঠে গেলে পানির সঞ্চয় কম হয়। পাহাড়ে এই জটিল ও সুক্ষ্ম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়েছে বড় আকারে।’[২৪] সুতরাং পাহাড়ে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করার কারণে যেমন ঝিরি এবং ঝরনাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে তেমন এখান থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীগুলোতে পানির প্রবাহও কমে যাচ্ছে।

৫.৫ ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন বিনাশের কারণ

৫.৫.১ পাহাড় ও টিলা অপসারণ

পাহাড়ি বনভূমি দেশের মোট বনভূমির অর্ধাংশের অধিক জুড়ে বিস্তৃত। পাহাড়ি বনভূমিসমূহ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পাহাড় দখল ও ধ্বংস করে জনবসতি গড়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দিন দিন পাহাড়ি বনভূমি ধ্বংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, দেশের পাহাড়গুলো বর্তমানে খুব খারাপ সময় পার করছে। কারণ রাতের অন্ধকারে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে বড় বড় পাহাড়গুলো। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৬ (খ) ধারা অনুযায়ী “কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারি বা আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কাটা বা মোচন করতে পারবে না। তবে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে পাহাড় বা টিলা কাটা যেতে পারে।”[২৫] কিন্তু এ আইন অমান্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে অবস্থিত বিভিন্ন পাহাড় ও টিলা কেটে ফেলা হচ্ছে। যেমন, লোহাগাড়া উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নের দুর্গম এলাকা বায়ার পাড়ার প্রায় ৫০ ফুট উঁচু একটি পাহাড় কেটে ফেলা হয়েছে।[২৬] অন্যদিকে সিলেটে যেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন টিলা কাটা হচ্ছে তেমন খাস বা বন বিভাগের মালিকানাধীন টিলাও কাটা হচ্ছে। এমনকি টিলা কাটায় পিছিয়ে নেই সরকারি সংস্থাও। সিলেটে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, “সিলেট বিভাগের চার জেলায় বর্তমানে ১ হাজার ৮৭৫টি টিলা আছে। এসব টিলার আয়তন ৪ হাজার ৮১১ একর। এর বাইরে আড়াই দশকে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ টিলা কেটে ফেলা হয়েছে।”[২৭]

সিলেট সদরের নালিয়া বাগমারা এলাকার এই টিলা দীর্ঘদিন ধরে কাটা হচ্ছে। টিলা কেটে বসতবাড়ি তৈরি করে সেখানে ঝুঁকি নিয়ে থাকছেন বাসিন্দারা। ছবি প্রথম আলো, ১১ মার্চ, ২০২৪, পৃ-১।

উপরোক্ত ছবির টিলাটি সিলেট সদর উপজেলার নালিয়া বাগমারা এলাকায় অবস্থিত। টিলাটির বেশ খানিকটা অংশ কেটে প্রায় সমতল করে ফেলা হয়েছে এবং একটি আধা পাকা ঘরও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সিলেট নগরের আখালিয়া মোহাম্মদীয়া নালিয়া ও খাদিমনগরের বিভিন্ন এলাকার অন্তত ১১টি টিলা কেটে বসতি নির্মাণ করা হয়েছে।

সাধারণত রেললাইনের গতিপথে কোনো পাহাড় পড়লে তা নির্ধারিত পরিমাণে কাটার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমতি দিয়ে থাকে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ঘুমধুম রেললাইনকে কেন্দ্র করে মূলত পাহাড় কাটার উৎসব শুরু হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যে যেভাবে পারছে পাহাড়ি জমি সমতল করে মাটি বিক্রির পাশাপাশি স্থাপনাও নির্মাণ করছে। কক্সবাজার থেকে খুরুশকুল ইউনিয়নের আদর্শ গ্রামে অবস্থিত ৬০ ফুট উঁচু ও ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের পাহাড় এবং পাহাড়টিতে অবস্থিত গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও পিত্রমখালী, ইসলামপুর, উখিয়া, চকরিয়া, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, লোহাগাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে পাহাড়া কাটা চলছে। খুরশকুল আদর্শ গ্রাম থেকে কিছুদূরে নতুন ঘোনার পাড়াতে অবস্থিত প্রায় ১৭০ ফুট উঁচু এবং লম্বায় প্রায় ৫০০ গজ দীর্ঘ পাহাড় কেটে সমতল করে ফেলা হয়েছে।[২৮]

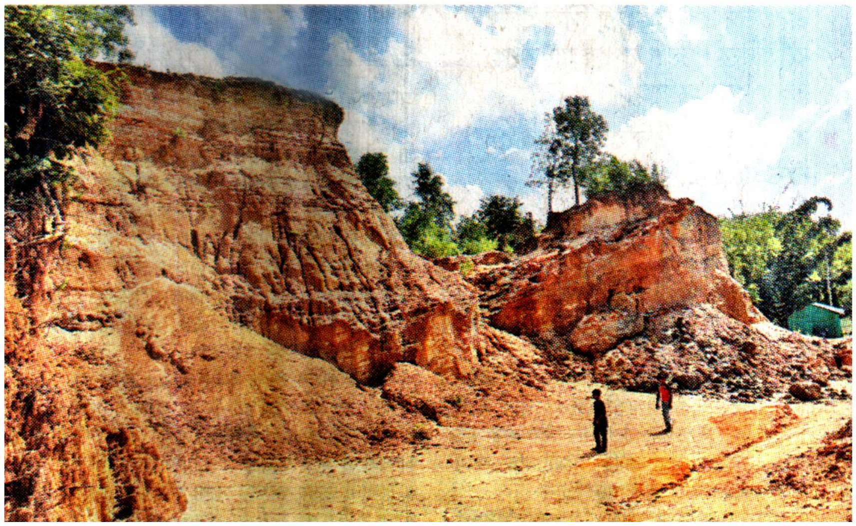

কক্সবাজারের খুরুশকুল নতুন ঘোনা এলাকায় কেটে ফেলা হয়েছে বিশাল এই পাহাড়।
ছবি : প্রথম আলো, ০২ নভেম্বর, ২০২০, পৃ-৫

দেশের বিভিন্ন স্থানে যতগুলো পাহাড় ও টিলা আছে তা প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত আর এ সকল সম্পদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। যে সকল অসাধু ব্যক্তি পাহাড় ও টিলা কাটার সাথে জড়িত থাকেন, তাদের শাস্তি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর জরিমানা ধার্য করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসব পরিবেশ বিধ্বংসী কাজের (পাহাড় বা টিলা কাটা) সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ জড়িত থাকেন। জরিমানা পরিশোধ করার পর তাঁরা মনে করেন, তাঁরা পাহাড় ও টিলা কাটার বৈধতা পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখতে দেখা যায়। জরিমানার অর্থ হয়তো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে কিন্তু এসব প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুদ্ধার কখনোই সম্ভব না। কিছু অসাধু ব্যক্তির অর্থনৈতিক লোভ-লালসা এবং পরিবেশগত অসচেতনতার কারণেই পাহাড় ও টিলাগুলোকে সংরক্ষণ করা দিন দিন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উপরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেটের পাহাড় ও টিলা কাটার যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা মূলত গবেষণা চলাকালীন সময়ের (২০২০-২০২৫) তথ্য। এ সময়ের পূর্বে যে পাহাড় ও টিলা কাটার ঘটনা ঘটেনি এমনটা নয়, বরং বর্তমান গবেষণার কলেবর যেনো অহেতুক বৃদ্ধি না পায় এজন্য এ সময়ের মধ্যকার তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যে বা যারা এই পাহাড় ও টিলা কাটার সাথে সম্পৃক্ত তারা হয় এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য বোঝে না অথবা বোঝার চেষ্টাটুকুও করে না। কারণ পাহাড় ও টিলা কাটার অর্থ কোনো অপ্রয়োজনীয় উঁচু স্থানের মাটি কেটে শুধু সমান করে ফেলা নয়, বরং এখানে পাহাড়ি ভূমি ধ্বংসের পাশাপাশি ঐ ভূমির উপর অস্তিত্বশীল বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ও অমানব প্রাণিকেও ধ্বংস করা। কারণ বাস্তুসংস্থানের আলোচনায় দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমি এবং ভূমির উপর বেড়ে ওঠা যাবতীয় জীবীয় ও অজীবীয় সত্তাসমূহ নিয়ে ঐ এলাকার বাস্তুসংস্থান গড়ে ওঠে (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে)। অর্থাৎ একটি পাহাড় অথবা টিলা কাটার অর্থ হলো একটি বাস্তুসংস্থান ধ্বংস করা। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল পাহাড় ও টিলা ধ্বংস করা হয়েছে তার সঠিক

পরিসংখ্যান বর্তমান গবেষণায় তুলে ধরা সম্ভব না। তবে নির্বিচারে পাহাড় ও টিলা কাটার ফলাফল বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর যেমন খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করছে তেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনেও বাধা সৃষ্টি করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাহাড় ও টিলা কেটে ফেলার ফলে সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন বনজ, ফলদ ও ভেষজ গাছ ধ্বংস হচ্ছে, হুমকির মুখে পড়ছে সেখানকার জীব-বৈচিত্র্য। অথচ এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, এ ঘটনাগুলোতে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ অধিদপ্তর আগে থেকে তেমন কোনো জোরালো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে শুধুমাত্র অভিযান চালিয়ে, জরিমানা করে এবং পরিবেশ আদালতে মামলা করে পরিবেশ অধিদপ্তর তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে।

৫.৫.২ অবৈধ ইটভাটা স্থাপন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে ইটভাটা স্থাপনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সমতল ভূমির পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে ইটভাটা স্থাপনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যক্তির মধ্যে পার্বত্য এলাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে অবৈধ ইটভাটার সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি (এ ইটভাটাগুলোর কোনো পরিবেশ ছাড়পত্র নেই)। দেশে বর্তমানে মোট ইটভাটা চালু আছে ৭,০৮৬টি, এ ভাটাগুলোর জন্য বছরে মাটি লাগে ১৩ কোটি মেট্রিক টন।[২৯] সাধারণত কৃষিজমি বা বনভূমির ওপরের উর্বর অংশের মাটি কেটে ইট তৈরি করা হয়, এতে যেমন ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে তেমন ধ্বংস হচ্ছে জীব-বৈচিত্র্য। যে কোনো স্থানে ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমত ক্ষতিগ্রস্ত হয় বনভূমি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল কেটে ইটভাটা স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে পাহাড়ের মাটি কেটে ড্রাম চিমনি ও সাধারণ মানের চুল্লিতে বনের কাঠ পুড়িয়ে ইট তৈরি করা হয়। ইটভাটা স্থাপনের ফলে শুধু যে ভূমি, পাহাড় ও বনভূমির ধ্বংস হয় তা নয়, এর থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ চর্ম, ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের মতো নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ অনুযায়ী, "কোনো পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে, ঢালে বা তৎসংলগ্ন আধা কিলোমিটারের মধ্যে সমতলে ইটভাটা স্থাপন অবৈধ। এ ছাড়া আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং বনাঞ্চলের দুই কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন করা যাবে না।"[৩০]

উক্ত আইন অমান্য করে পুরো পার্বত্য এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে **১১৯টি** অবৈধ ইটভাটা। বান্দরবানের ৪৪টি ইটভাটার ৩৬টি ফাইতংয়ে, রাঙামাটিতে ২৯টি এবং খাগড়াছড়িতে আরও ৪৬টি ইটভাটা গড়ে উঠেছে। বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নটি পাহাড় ও বন-জঙ্গলে ঘেরা। পাহাড় ও বনের আধা কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন অবৈধ হলেও ইউনিয়নটির তিন বর্গকিলোমিটারের মধ্যে দেখা যায়, ৩৬টি চুল্লি থেকে ধোঁয়া উঠছে সবসময়। ইটভাটার ধোঁয়া, উত্তাপ এবং ধুলার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ পার্শ্ববর্তী দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাহাড় ও বনের বাস্তুতন্ত্র।

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় বনের পাশে গড়ে ওঠা ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে ইট।
ছবি: প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল, ২০২২, পৃ-৩

বান্দরবানের লামার ফাইতং ইউনিয়নে গড়ে ওঠা একটি অবৈধ ইটভাটা।
ছবি: প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫, পৃ-৩

যে-কোনো ইটভাটা স্থাপন ও পরিচালনায় পরিবেশ ছাড়পত্র, জেলা প্রশাসন এবং বন বিভাগের অনুমতি লাগে। কিন্তু এসব ভাটার কোনোটাই নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক অলক পালের তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ আলীম উল্লাহ খান পরিচালিত 'চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ইটের ভাটা থেকে নিঃসৃত গ্রিণহাউস গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় : একটি ভূপরিবেশগত সমীক্ষা' শীর্ষক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, ৪০ লাখ ইট তৈরিতে একেকটি চুল্লি থেকে প্রায় ৩৯৪ টন কার্বন, ১ হাজার ৪৪৪ টন কার্বন ডাই-

অক্সাইড, ৬ দশমিক ৩ টন মিথেন ও ১২০ টন নাইট্রিক অক্সাইড নিঃসৃত হয়। এ সকল দূষিত পদার্থ শুধু বাতাস নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটি, পানি ও বনের ক্ষতি করে থাকে।[৩১]

৫.৫.৩ জুমচাষ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বিনাশ ও মাটি ক্ষয়ের অবধারিত কারণ হিসেবে জুম চাষকে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামেই কেবল জুমচাষ হয়। এক সময় মধুপুরের শালবন এলাকায়ও জুম চাষ হতো। সরকার বৃটিশ আমল থেকে জুমচাষ বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করলেও প্রাচীন এ চাষ ব্যবস্থা এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধান ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি।[৩২] সাধারণত পাহাড়ের ঢালুতে জুমচাষ করা হয়। বছরের শুরুতেই অর্থাৎ জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জুমচাষীরা তাদের পছন্দমতো জমি বেছে নেয়। এ জমিতে অবস্থিত বড় গাছগুলো ছাড়া বাকি গাছ এবং ঝোপঝাড় সব কেটে ফেলা হয়। কেটে ফেলা গাছ ও ঝোপঝাড় রোদের তাপে শুকাতে থাকে। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে শুকনো গাছগাছড়া পোড়ার সময় মাটির উপরিতলের কিছু অংশও পুড়ে যায় এবং ছাইভস্ম মাটির উপরে পড়ে থাকে। এরপর বৃষ্টি শুরু হলে বিভিন্ন ধরনের শস্যের বীজ বপন করা হয়। প্রাচীন এ চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন কম হলেও এটি একটি টেকসই চাষ পদ্ধতি। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পরপর দুই বা তিন বছর জুমচাষ করা হয়। তারপর দশ বছর বা তারও অধিক সময়ের জন্য সে জায়গা ফেলে রাখা হয়, যেনো সেখানে আবার গাছপালা জন্মাতে পারে। এ সময়কে 'ফালো' বা পরিত্যাক্ত সময় বলা হয়।[৩৩]

ক্রান্তীয় দেশের রেইন ফরেষ্টে হাজার বছর ধরে এ পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। জুমচাষের মাধ্যমে বন ও পরিবেশ উভয়ই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। তবে 'ফালো' বা পরিত্যক্ত সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক গবেষক দাবী করেন যে, জুমচাষের জমি দশ বছর পরিত্যক্ত রাখা যথেষ্ট নয়। পেরুর আমাজান এলাকায় গবেষণা করে জিওফ্রি স্কট বলেন, পরিত্যক্তের সময় যদি ১৫ বছর বা তারও অধিক হয় তাহলে জুমচাষ টেকসই হতে পারে।[৩৪] কিন্তু আমরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায়, এখানে জুমচাষের পরিত্যক্ত সময়ের পরিধি কমতে কমতে এখন দুই তিন বছরে নেমে এসেছে। পরিত্যক্ত সময়ের পরিধি আশংকাজনকভাবে কমে যাওয়ার জন্য স্থানীয়রা দায়ী করেন সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীকে জুমচাষের পরিবর্তে স্থায়ী চাষ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা হয়। বর্তমানে শিল্পবন ও পাল্পউড প্লানটেশনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পাহাড়ি অঞ্চলে জুমচাষ প্রায় বন্ধের দিকে।

১৯৭৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের একটি মূল আলোচনা ছিল 'জুমচাষের সমস্যা'। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় তৈরি এ প্রকল্পে ২০০০ সালের দিকে জুমচাষের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের এক হিসাবে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বছরে ৪২ লক্ষ টন মাটি (টপ সয়েল) হারাচ্ছে। এর ফলে উর্বর মাটি কেবল হারিয়েই যাচ্ছে না, তা নদী ও কাপ্তাই লেক ভরাট করে ফেলছে।[৩৫] ফরেস্টাল ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অনেক ভল্যুমের গবেষণাপত্রে জুমচাষের কঠোর সমালোচনা করে জুমচাষকে যথাশীঘ্র খুব সীমিত করে আনার সুপারিশ করা হয়।[৩৬] কিন্তু জুমচাষ নিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক গবেষণা হয়েছে এবং অধিকাংশ গবেষণার ফলাফলে প্রাচীন এ

চাষ পদ্ধতির কল্যাণকর দিকসমূহ উঠে এসেছে। জুমচাষের ক্ষেত্রে শস্য নয়, জমি পাল্টায় জুমচাষিরা। যার ফলে সংশ্লিষ্ট জমিতে রোগবালাই, ক্ষতিকর কীট ও আগাছা বাসা বাঁধতে পারে না। জুমচাষের কারণে মাটি ক্ষয় হয়, এমন ধারণাও বিশেষজ্ঞরা প্রত্যাখান করেন। লাতিন আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী (বিশেষ করে ব্রাজিলে) **১৯৭৪** থেকে **১৯৮৩** সালের মধ্যে জুমচাষের উপর গবেষণা করে বলেন, "চাষের সময় মাটিতে পুষ্টির পরিমাণ খুব একটা কমেনি, তবে ফসফরাসের পরিমাণ কমেছে যার ফলে ফসল উৎপাদন কম হয়ে থাকতে পারে।"[৩৭]

জুমচাষিরা যখন নির্দিষ্ট জুমক্ষেত পরিত্যক্ত হিসেবে রেখে দেন তখন সেখানে খুব দ্রুত স্থানীয় প্রজাতির গাছপালা বেড়ে ওঠে। কিন্তু মাটিতে ফসফরাস ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় দেশি প্রজাতির গাছের পরিবর্তে সরকার যে সকল বিদেশী প্রজাতির গাছ লাগিয়ে থাকে তার জন্য একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার বন, পরিবেশ এবং জীব-বৈচিত্র্য অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে তেমন জুমচাষিরাও জুমচাষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেগুন, রাবার এবং বিভিন্ন আগ্রাসী প্রজাতির গাছ দিয়ে কৃত্রিম বন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল বিদেশি প্রজাতির এসব গাছ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম বন কখনোই জুমচাষের বিকল্প হতে পারে না। মাটির ক্ষতি না করে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের পাহাড়ের ঢালে জুমচাষের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। আমাদের দেশের পাহাড়গুলোতে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে জুমচাষের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা অব্যাহত আছে বলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বিনাশের জন্য এটিও একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৫.৫.৪ বন ডুবিয়ে হ্রদ তৈরি

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া এবং সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত প্রায় আড়াই হাজার একর বনভূমি ডুবিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে। এটি বড়হাতিয়া বন নামে পরিচিত। এই বনের একটি অংশ সংরক্ষিত, আর একটি রক্ষিত। সাধারণত সংরক্ষিত বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে আর রক্ষিত বনে অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করা যায়। বড়হাতিয়া বনের যে জায়গায় হ্রদ তৈরি করা হয়েছে, তা সংরক্ষিত ও রক্ষিত দুই অংশের মধ্যে পড়েছে। হ্রদটি তৈরি করা হয়েছে বনের সোনাকানিয়া নামের একটি ছড়ায় বাঁধ দিয়ে। বাঁধের দৈর্ঘ্য ২০০ ফুটের মতো। প্রস্থ ২০ ফুট ও উচ্চতা ১০০ ফুট।[৩৮] বন বিভাগের মতে, হ্রদ তৈরির কারণে গামারি, সেগুন, চিকরাশি, অর্জুনসহ বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় প্রায় পাঁচ লাখ গাছ মারা গেছে। ডুবে যাওয়া জায়গার মধ্যে বন্য হাতির চলাচলের পথ ছিল। খ্যাঁকশিয়াল, শজারু, বন্য শূকর, বনমোরগ, ময়ূর, গুইসাপ, অজগরসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণি এবং নানা প্রজাতির প্রাণি বাস করতো সেখানে।[৩৯]

বনের জায়গা দখল করে এভাবে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হ্রদ। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি হাতির চলাচলে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ও সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকার হ্রদের একাংশ। ছবি: প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ-১

হ্রদে যেতে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া এলাকায়।
ছবি: প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ-১

বন বিভাগ ও উপজেলা কৃষি কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মাটির বাঁধটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ঐ বছরের মার্চেই কাজ শেষ হয়। মূলত মাছ চাষের উদ্দেশেই ছড়ায় বাঁধ দিয়ে হ্রদ তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের থেকে জানা যায়, বাঁধ দেয়ার ফলে ছড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এতে লোহাগাড়া ও সাতকানিয়ার ৪ হাজার ২৫৫ একর জমির চাষাবাদ ব্যহত হচ্ছে।[৪০] এ বিষয়টি নিয়ে কৃষকেরা শুরু থেকেই সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানালেও প্রশাসন থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কৃষকদের অভিযোগ, বাঁধ নির্মাণ ও হ্রদ তৈরিতে জড়িত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত।

বনের জায়গা দখল করে ছড়ায় বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হ্রদ। সেচসুবিধা না পাওয়ায় এসব জমিতে চাষাবাদ কমে গেছে। লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া এলাকায়। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ-২

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা সদর থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক হয়ে সাত কিলোমিটার দক্ষিণে চুনতি বাজার। সেখান থেকে ছয় কিলোমিটার পাকা সড়ক, তিন কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক এবং এক কিলোমিটার সমতল ও পাহাড়ি পথে হেঁটে যাওয়ার পর কৃত্রিম হ্রদটির দেখা পাওয়া যায়। হ্রদটির নাম রাখা হয়েছিল 'ন্যাচারাল লেক'। শীত মৌসুমে পানি কমে যাওয়ায় হ্রদের ভেতর মরা গাছের ডালপালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং আশপাশের বেশ কিছু পাহাড় কাটার চিহ্নও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের থেকে জানা যায়, হ্রদটিতে শুষ্ক মৌসুমে পানির গভীরতা থাকে ৪৫ ফুটের মতো। তবে বর্ষায় গভীরতা বেড়ে ৬০ ফুট পর্যন্ত দাঁড়ায়। মূলত বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা এবং বড় একটি পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করার জন্যই এ কৃত্রিম হ্রদটি তৈরি করা হয়েছিলো।

চট্টগ্রামে বন ডুবিয়ে হ্রদ তৈরিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেওয়া সেই বাঁধ কাটা হচ্ছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশে বাঁধ কাটছেন শ্রমিকেরা। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার সোনাকানিয়া সীমান্তবর্তী এলাকায়। ছবিঃ প্রথম আলো, ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ১

দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা '*প্রথম আলো*'তে যখন 'বন ডুবিয়ে প্রভাবশালীদের হ্রদ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় তখন বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাঁধ কেটে দিলে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়। তবে পানি নামতেই স্পষ্ট ওঠে বনের ক্ষতিসমূহ। কৃত্রিম হ্রদে ডুবে থাকা সব গাছপালা মরে গেছে। সবুজ ঘন বন আর নেই। দীর্ঘদিন পানি জমে থাকায় একের পর এক পাহাড়ও ধসে পড়েছে।

কৃত্রিম হ্রদের বাঁধ কেটে দেওয়ার পর পানি নেমে যাওয়ায় বনের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট।হ্রদের দুই পাশে ডালপালাসহ মরা গাছ ও কাটা পাহাড়ের অংশ। লোহাগাড়ার জঙ্গল বড়হাতিয়া ও সাতকানিয়ার সোনাকানিয়া সীমান্তবর্তী এলাকায়।
ছবি: প্রথম আলো, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ধ্বংস হয়ে যাওয়া এ বন পুনরুদ্ধারের জন্য যত দ্রুত সম্ভব বনায়নের পরামর্শ দিয়েছেন বন-গবেষকরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক মো. কামাল হোসেন বলেন, বাঁধ কেটে দেওয়ায় পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরেছে, এটা খুবই আশার কথা। তিনি এখানে কদম, জারুল, বিলুপ্তপ্রায় ও বিপন্নপ্রায় বৈলাম, গর্জন, চাপালিশসহ স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী গাছের চারা রোপণের সুপারিশ করেন। এছাড়াও তিনি মনে করেন, সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে বাঁশের চারা রোপণ করা প্রয়োজন; বাঁশ যেমন মাটি ধরে রাখবে, তেমন হাতির খাবারেরও যোগান দেবে। এসব পদক্ষেপ নেওয়া হলে অবক্ষয়প্রাপ্ত বন আবার ফিরে আসবে এবং একই সাথে হাতি ও বন্য প্রাণি, জীবজন্তুর আবাস গড়ে উঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মো. কামাল হোসেন।[৪১]

চট্টগ্রামের উপরোক্ত ঘটনাটি (বন ডুবিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি) বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও অমানব সত্তাসমূহ বিলুপ্তির মূলে ব্যক্তি বিশেষের অসচেতনতা ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে উপযোগবাদী মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করা হয় ব্যক্তি উদ্যোগে। এক্ষেত্রে কিছু অসাধু ব্যক্তি প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হওয়ার পর প্রমাণিত হয় যে এ ধরনের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। একইভাবে চট্টগ্রামের ছড়ার বাঁধ অপসারণ করার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, এভাবে বন ডুবিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করাটা

ছিল মারাত্মক ভুল। বর্তমানে বন বিভাগের উদ্যোগে বনের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে এখন বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ বন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনের (২০২২-২৩) তথ্য থেকে জানা যায়, দেশে এখন প্রায় ৩৩ লাখ ১১ হাজার একর সংরক্ষিত ও ১১ লাখ ৭৩ হাজার একর রক্ষিত বন রয়েছে, যার মধ্যে বড়হাতিয়া বনটিও পড়েছে।[৪২] জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮-এ পাহাড়ে অবস্থিত বনভূমির সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ[৪৩] বলা হয়েছে, পাহাড় প্রতিবেশ (Hill Ecosystem) ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং Anthropogenic shocks- এর প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পাহাড় প্রতিবেশ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন সৃষ্টি করে দীর্ঘ মেয়াদে পানির প্রবাহ বজায় রাখে এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যাগুলো হলো পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস, ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, মাটি ও পানিদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রিক ব্যবস্থা সংরক্ষণে ১২টি নীতি অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়।[৪৪]

৫.৬ ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন

সাধারণত এ ধরনের বন চিরহরিৎ হলেও পত্রমোচী (deciduous) বৃক্ষেরও প্রাধান্য থাকে। সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুরের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে এ বনভূমি গঠিত হয়েছে। চিরসবুজ বনের তুলনায় এ জাতীয় বনের গাছতলায় অনেক উদ্ভিদ জন্মে। এখানে প্রায় আট শতাধিক প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। এ বনের উঁচু আচ্ছাদন সৃষ্টিকারী বৃক্ষসমূহ ২৫-২৭ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বনের উপত্যকা ও আর্দ্র ঢালে চাপালিশ, তেলশুর, নারকেলি প্রজাতিগুলোই বেশি জন্মে। গুটগুটিয়া, তুন, পীতরাজ, নাগেশ্বর, উড়িআম, নালিজাম, গোদাজাম, পীতজাম, ঢাকিজাম ইত্যাদি মধ্যমাঞ্চলে ছাউনি করে থাকে। ডেফল ও কেচুয়ান নিম্নস্তরের আচ্ছাদক। অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ ও শুষ্ক ঢালে এবং খাঁজে বিভিন্ন প্রজাতির গর্জন, বনশিমুল, শিমুল, শিলকরই, চুন্দুল, গুজা, বাটনা, কামদেব, বুরা গামারি, বহেড়া ও মুস উপরের ছাউনি সৃষ্টি করে। গাব, উদাল ও শিভাদি মধ্যম উচ্চতার ছাউনি সৃষ্টি করে এবং আদালিয়া, বড়মালা, গোদা, অশোক, জলপাই ও দারুম নিচু ছাউনি সৃষ্টি করে।[৪৫]

ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বনের উত্তরাংশে অবস্থিত উদ্ভিদের সাথে পূর্ব-হিমালয় এবং দক্ষিণাংশের সাথে আরাকানের উদ্ভিদের সাদৃশ্য রয়েছে। এই বনগুলোর মোট আয়তন প্রায় ৬,৪০,০০০ হেক্টর যেখান থেকে বাণিজ্যিক কাঠের ৪০% যোগান পাওয়া যায়। পূর্বে প্রবর্তিত সেগুনের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে রাবার চাষের কারণে এ বনভূমির বৈশিষ্ট্য দিন দিন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এ বনে জুমচাষও করা হয়ে থাকে।[৪৬]

৫.৭ ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বন

শাল (Shorea robusta) গাছের প্রাধান্য থাকায় সাধারণভাবে এই বন শালবন নামে পরিচিত। বর্তমানে ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলে বিস্তৃত এ বনভূমির দুটি সুস্পষ্ট বলয় রয়েছে (প্রায় ১০৭,০০০ হেক্টর)। বৃহৎ অংশটি ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭-২০ কিলোমিটার চওড়া যা মধুপুরগড় নামে পরিচিত। ক্ষুদ্রতর অংশটি শেরপুর জেলায় ভারতের গারো পাহাড়ের

পাদদেশে অবস্থিত যা ৬০ কিলোমিটার লম্বা ও ১.৫-১০ কিলোমিটার চওড়া। তাছাড়া রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁ জেলায় শালবনের কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল (প্রায় ১৪,০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে) এবং কুমিল্লা জেলার শালবন বিহার, ময়নামতি ও রাজেশপুরে কিছু অবশিষ্ট (২০০ হেক্টর) ছড়িয়ে রয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে কুমিল্লা থেকে ভারতের দার্জিলিং পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন শালবন ছিল। বর্তমানে এ বনের অধিকাংশই দখল হয়ে গেছে। অবশিষ্ট বনে যে সকল গাছ আছে তার মজুদ ও গুণমান নিম্নস্তরের।[৪৭]

ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বনে প্রায় ৯০% শাল গাছ রয়েছে এবং অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে পলাশ, হালুদ, জারুল বা সিধা, বাজনা, হাড়গজা, আজুলি, ভেলা, করই, মেনদা, কুসুম, উদাল, ডেফাজাম, বহেড়া, কুরচি, হরীতকী, পিতরাজ, শেওড়া, সোনালু, আসার, আমলকি ও অধগাছ। অসংখ্য গাছতলা প্রজাতি এবং লতা প্রজাতির গাছ রয়েছে এ জাতীয় বনে। এ বনের অবিচ্ছিন্ন ছাউনি ১০-২০ মিটার উঁচু এবং অধিকাংশই পত্রমোচী প্রজাতির।[৪৮]

ঝরাপাতার শালবন দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মানুষের কাছে ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত। ঐতিহ্যবাহী এ বনের অনেকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার মাটি অনেকটা হলুদ বা লাল রঙের। শালগাছ অত্যন্ত শক্ত কাঠ উৎপাদনকারী একটি প্রজাতি। এ গাছগুলো উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে যায়। গাছগুলো খুব ধীর গতিতে বাড়লেও এর ঝরাপাতা, ডালপালা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ বিভিন্ন কাজে লাগায়। ঝরাপাতাগুলো মাটিতে পঁচে গলে সারে রুপান্তরিত হয় এবং মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতি বছর বন বিভাগের উদ্যোগে শালগাছের ঝরাপাতাগুলোতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্ষা মৌসুমে ঝরাপাতার ছাইভস্মগুলো মাটিতে মিশে গিয়ে মূল বৃক্ষসমূহের পুষ্টি সাধনের পাশাপাশি অন্যান্য প্রজাতির নতুন চারা বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। শালবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো একটি বড় গাছ কাটার পরপরই গাছের মোথা থেকে অনেকগুলো চারা বা কপিস বের হয় যা পরবর্তীতে শালবন পুনরুৎপাদন করতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান শাল গাছ ছাড়াও এ বনে আরো অনেক মূল্যবান বৃক্ষ রয়েছে। এদের মধ্যে কড়ই, জোগিনিচক্র, চম্বল, কাইকা, সিধা, আমলকি, সাজনা, কালস্, সোনালু, আজুলি এবং গাওগিলা অন্যতম। এছাড়াও শালবনের মাটিতে সনগ্রাস ও তাও প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায় যা অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে মূল্যবান। এ বনের প্রধান গাছ শাল শক্ত হওয়ায় এর বহুবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন, গ্রামাঞ্চলে ঘরের খুঁটি ও চাল তৈরিতে এবং শহরের অনেক ধরনের নির্মাণকাজে শালকাঠের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। ইটের ভাটায় শালগাছ এবং এর মোথার ব্যবহার করা হয়ে থাকে যদিও বর্তমানে এর সরবরাহ অনেক কমে গেছে।[৪৯]

৫.৮ ক্রান্তীয় আর্দ্র-পত্রমোচী বন বিনাশের কারণ

শালবন বিলুপ্ত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। ১৯৫৯ সালের ইস্ট পাকিস্তান স্টেট একুইজিসন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট অর্থাৎ শালবনের মালিকানা পরিবর্তন শালগাছ কাটার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। উপমহাদেশের বিভক্তি এবং বন বিভাগের অধীনে বনের দায়িত্ব হস্তান্তর করার কারণে এলোমেলোভাবে অসংখ্য বৃক্ষ নিধন হয়েছে। প্রাকৃতিক শালবন ও এ বনের বৃক্ষসমূহ নির্বিচারে ধ্বংস করে ফেলার কারণে বন্যপ্রাণিকুলের অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। এক সময় লেপার্ড (বাঘ), ভল্লুক, হরিণ এবং আরো অনেক

বন্যপ্রাণি যা মধুপুরে সর্বত্র দেখা যেত কিন্তু এ সকল অমানব সত্তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই এখন মধুপুরের শালবনে। বানর, হনুমান এখনো কিছু সংখ্যায় দেখা গেলেও রাবার বাগান ও তৈরি করা সীমিত প্রজাতির বাগানের কারণে অতীতের অনেক পাখি যেমন, ময়ূর এবং অজগর সাপ এখন আর দেখা যায় না। তথাকথিত বনায়নের ফলে শাল ও অন্যান্য প্রায় শত রকমের স্থানীয় প্রজাতির গাছ এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে শালবনের মাটিতে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন রকমের ছোটখাট ঘাস, গাছ, চিকিৎসার প্রয়োজনে লাগে এমন গাছগাছালিও খুব কম দেখা যায়। শালবনের মাটি ও মাটির মধ্যে বসবাসকারি উপকারী অনেক পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গেরও বিলুপ্তি ঘটেছে।[৫০]

৫.৮.১ সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের নামে বাণিজ্যিক বনায়ন এবং বিদেশী ঋণের সহায়তায় যেসব ক্ষতিকর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেসব কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে মধুপুর শালবনসহ অন্যান্য শালবনগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মধুপুরে দুই ধরনের সামাজিক বনায়ন হয়েছে : উডলট (জ্বালানি কাঠ উৎপাদনের জন্য) এবং এগ্রোফরেস্ট্রি (কৃষি বনায়ন)।[৫১] সামাজিক বনায়নের প্রথম আবর্তে অর্থাৎ ১৯৮৯ সাল থেকে শালবনের অধিকাংশ জায়গার শাল কপিস পরিষ্কার করে বিদেশী প্রজাতির গাছ আকাশিয়া ও ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয়। উডলট ও এগ্রোফরেস্ট্রিতে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণের ধরণ এবং বন বিভাগের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রভৃতি সবকিছু বিতর্কিত হতে দেখা যায়।[৫২] বিভিন্ন সমন্বয়হীনতার কারণে মধুপুরে গৃহীত এ প্রকল্পটি (সামাজিক বনায়ন) সফলতা অর্জন করেনি। প্রকল্প দলিল অনুসারে, "কেবল বৃক্ষহীন/ক্ষয়িত বনভূমিতেই উডলট হবার কথা যেখান থেকে প্রাকৃতিক বন অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।"[৫৩] কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়, কারণ বন বিভাগ শাল কপিস কেটেই উডলট প্লট তৈরি করেছিল। এভাবে বিদেশী প্রজাতির গাছ দিয়ে কৃত্রিম বনবাগান সৃষ্টি করে মধুপুরের শালবনের বাহ্যিক নিসর্গ এবং এর পরিবেশ নাটকীয়ভাবে পাল্টিয়ে দেয়া হয়েছে।

৫.৮.২ রাবার চাষ

সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণের আরও প্রায় তিন বছর আগে থেকেই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মধুপুরে বনবিনাশের প্রক্রিয়া শুরু হয় অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের রাবার চাষের সময় থেকে। রাবার চাষ মধুপুরের উত্তর পশ্চিমাংশের চেহারাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। মধুপুরে প্রায় আট হাজার একর বনভূমিতে রাবার চাষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের প্রতিবাদ ও লেখালেখির কারণে রাবার চাষের সম্প্রসারণ বন্ধ করা গিয়েছিল।[৫৪] বিশাল বিশাল শাল গাছ ও বহু প্রজাতির দেশিয় গাছ কেটে হাজার হাজার একর জমিতে রাবার গাছ লাগানোর ফলে যেমন ধ্বংস হয়েছে বিরল প্রজাতির প্রাণিসমূহের আবাসস্থল তেমন চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে এসব অমানব সত্তাসমূহ। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ডের মত বিবেচনা করা যায়-

লিওপোল্ড তাঁর 'ভূমি নীতিবিদ্যা' প্রবন্ধে বলেন, অর্থনৈতিকভাবে সচেতন বনবিদরা কিছু গাছের প্রজাতিকে পৃথিবী থেকে বাদ দিতে চান কারণ, এগুলো খুব ধীরে বৃদ্ধি পায় অথবা কাঠ হিসেবে বিক্রয় মূল্য খুব কম থাকে। যেমন, সাদা সিতার টামারাক, সাইপ্রাস, বিচ এবং হেমলক প্রভৃতি গাছসমূহ। লিওপোল্ড বলেন, ইউরোপের বন ব্যবস্থাপনা পরিবেশগতভাবে উন্নত হলেও অ-বাণিজ্যিক বৃক্ষ প্রজাতিগুলোকেও স্থানীয়

বন সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং সংরক্ষণের সুপারিশও করা হয়। কিছু গাছ যেমন বিচ, মাটির উর্বরতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। বন এবং এর অন্তর্গত যে কোনো প্রজাতির গাছ, ভূমি, উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের আন্তঃনির্ভরশীলতাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ লিওপোল্ডের মতে, কোনো প্রজাতির গাছের অর্থনৈতিক মূল্য থাকুক বা না থাকুক সে প্রজাতিকে কোনো বনাঞ্চল থেকে অপসারণ করা উচিত না।

লিওপোল্ডের উক্ত মত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, যেখানে উন্নত দেশসমূহে দেশীয় প্রজাতির গাছসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় সেখানে আমাদের দেশে সরকারি উদ্যোগেই দেশীয় প্রজাতির গাছ মূলোৎপাটনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি, পানি, অমানব সত্তাসমূহ এবং সর্বোপরি মানুষের জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। পরিবেশবিদদের মতে, "বিদেশী প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের ফলে মধুপুর আজ এক নষ্ট নিসর্গ।"[৫৫] কারণ বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা যায়, বিদেশী প্রজাতির গাছ দেশের বন্য প্রাণি ও জীব-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এগুলো কখনোই প্রাকৃতিক শালবনের বিকল্প হতে পারে না। রাবারসহ অন্যান্য বিদেশী প্রজাতির মনোকালচারের তুলনায় প্রাকৃতিকভাবে শাল ও অন্যান্য স্থানীয় প্রজাতির বন সৃষ্টি অনেক সহজ ও বেশিমাত্রায় লাভজনক। স্থানীয় ও বন বিশেষজ্ঞদের মতে, মধুপুরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিদেশী প্রজাতির উডলটের মাধ্যমে বন সৃষ্টির যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে তা ইতিমধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেসব দেশ প্রথম দিকে "প্রাণবৈচিত্র্য চুক্তি" স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এ চুক্তি সই করে বাংলাদেশ প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অঙ্গীকার করলেও সামাজিক বনায়নের নামে, বিশেষ করে উডলট-এর ফলে, মধুপুর ও অন্যান্য জায়গায় যা ঘটছে তা প্রাণবৈচিত্র্য চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[৫৬]

মধুপুরের শালবনে শাল গাছ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রজাতির গাছের পরিবর্তে সামাজিক বনায়নে প্রধানত বিদেশী প্রজাতির গাছ ইউক্যালিপটাস ক্যামালডুনেসিস, আকাশিয়া ম্যানজিয়াম এবং এরিকুলেফরসিস নির্বাচন করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের যুক্তি ছিল, কম সময়ের মধ্যে অধিক লাভ নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত বর্ধনশীল এসব প্রজাতি নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু এ গাছগুলো দ্রুত বর্ধনশীল হলেও স্থানীয় আবহাওয়ার জন্য উপযোগী না হওয়ায় ইতিমধ্যে এগুলো বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৫৭] সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ ১৫মে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বন-১ অধিশাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনি গাছের চারা সৃজন ও রোপন এবং বিক্রি সরকার নিষিদ্ধ করেছে।[৫৮]

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বন-১ অধিশাখার উপসচিব তুষার কুমার পাল বলেন, নানা গবেষণায় দেখা গেছে, এসব গাছের পানি শোষণের ক্ষমতা বেশি ও মাটিকে রুক্ষ করে তোলে। তাই দেশের জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় আগ্রাসী প্রজাতির গাছের চারা রোপণের পরিবর্তে দেশি প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করে বনায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[৫৯] বাংলাদেশের বনভূমির জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি খুশির সংবাদ। বাংলাদেশ সরকার এবং বন বিভাগের কাছে প্রত্যাশা থাকবে, মধুপুর শালবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে,

তা বাড়ানোর জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা যেন আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৫.৯ জোয়ারধৌত বন

খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের এই উপকূলীয় বনগুলো (একত্রে প্রায় ৫২০,০০০ হেক্টর) বাংলাদেশের সর্বাধিক উৎপাদনশীল বনভূমি। এ বনভূমিগুলো প্রতিবার সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এ বনের গাছগুলো সাধারণত চিরসবুজ ধরনের হয়ে থাকে এবং এদের বায়ুমূল আছে। এদের বংশবিস্তার জরায়ুজ ধরনের। সুন্দরি, পশুর, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দুল, আমুর ও ডাকুর দলবদ্ধভাবে জন্মে এসব বনে। এসব প্রজাতির গাছগুলোর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে উপকূলীয় পানির ঘোলাটে ভাব ও লবণাক্ততা। সুন্দরবন ছাড়াও গাঙ্গেয় বদ্বীপের অনেকগুলো চর ম্যানগ্রোভের গভীর বনে ঢাকা থাকলেও সেগুলোতে সুন্দরি গাছ নেই। নদীর পলি জমে গড়ে ওঠা তীর ও ফাটলেই এসব প্রজাতি দ্রুত বেড়ে ওঠে।[৬০]

কিছু বন কিছু নির্দিষ্ট বাস্তুসংস্থানের মধ্যে সীমিত থাকে। এসব বনের মধ্যে রয়েছে ১. বেলাভূমি বা তটীয় বন যা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল ও পটুয়াখালি অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল বরাবর বিস্তৃত। ২. স্বাদুপানির নিম্নভূমির বন যা সিলেট, সুনামগঞ্জের হাওর ও পার্বত্য বনাঞ্চলের নিচু এলাকায় অবস্থিত। এসব বিশেষ ধরনের বন ছাড়াও পাহাড়ি ছোট নদী বা ছড়ার কিনারে স্বকীয় গাছগাছালিসহ আরও স্থানীয় কিছু বন রয়েছে। প্রতি বছর প্রাকৃতিক বনভূমির ক্রমাগত হ্রাসের কারণেও কিছু বিশেষ ধরনের বন সৃষ্টি হয়, যাকে তৃণভোজী অগোছালো জঙ্গল বলা যায় (প্রায় ৭৫০,০০০ হেক্টর)।[৬১]

উল্লেখিত উপকূলীয় বন ছাড়াও সুন্দরবন বা উপকূলীয় প্যারাবন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন যা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের গোটা উপকূল জুড়েই ছোট ছোট লবণ পানির বন অবস্থিত। তবে বিশালতায়, উৎপাদনশীলতায় এবং স্থানীয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দরবন বলতে পৃথিবীর এক জায়গায় অবস্থিত সর্ববৃহৎ প্যারাবনকে বোঝায়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্যারাবন যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থিত। বাংলাদেশ অংশে সুন্দরবনের প্রায় ৬২ শতাংশ অবস্থিত এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বাংলাদেশের সুন্দরবন পড়েছে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলাজুড়ে। বাংলাদেশে সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটারের সম্পূর্ণ অংশই সংরক্ষিত বন। এর মধ্যে ৪,১৪৩ বর্গকিলোমিটার ভূমি যার ৪,০৬৯ বর্গকিলোমিটার বৃক্ষ আচ্ছাদিত।[৬২] ১৮৭৩ সালে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সুন্দরবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এর সীমানা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়। "উপকূলের বিশাল এলাকা জুড়ে সুন্দরবন, হুগলি থেকে মেঘনা, ১৬৬ মাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি; উত্তর দক্ষিণে এর বিস্তৃতি সর্বাধিক ৮১ মাইল"।[৬৩]

শত শত বছর ধরে মানুষ সুন্দরবন থেকে অফুরন্ত সম্পদ আহরণ করলেও মথুরা জলের এই বনভূমিটি এখনো টিকে আছে। এই বৈশিষ্ট্যটিই সুন্দরবনকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য প্যারাবন থেকে আলাদা রূপ দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষসহ সরকারও এ বন এবং বনের ভূমি ব্যবহার করে নানা

ধরনের সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আয় করছে। অসংখ্য নদী-নালা, খাল এবং জলাবদ্ধ অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা সুন্দরবনের চারিদিকে মাকড়শার জালের মতো এমন প্রাকৃতিক বন্ধন সৃষ্টি করে রেখেছে যে এর ভেতরকার দৃশ্য যেমন মনোরম তেমন ভীতিকর। এ বনের সর্বত্র সুন্দরী গাছ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে। এসব গাছ যেমন উঁচু-লম্বা তেমন মূল্যবান। স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য এ বন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবন এলাকার বিশাল এক জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বনের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবনের বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সুন্দরবন যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাই নয়, বরং উপকূলীয় ভূমিক্ষয় এবং ঝড়ঝাপ্টা থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ ও তাদের সম্পদকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে এ বন প্রাকৃতিক ঢালের ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুন্দরবন বৃক্ষসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, প্রাণি সম্পদ, প্রাণিবৈচিত্র্য এবং জীব-বৈচিত্র্যে ভরপুর নজীরবিহীন একটা জায়গা। "সুন্দরবন এ অঞ্চলের বহু প্রাণি, পাখি, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণির সর্বশেষ আবাসস্থল।"[৬৪] কিছু প্রাণি (অন্তত চারটি), যেমন, জাভান রাইনোসেরস (Rhineceros Sondaicus), বুনো মহিষ (Babalus bubalis), সোয়াম্প ডিয়ার (Cervus duvaceli) এবং হগ ডিয়ার (Axis Porcinus) বিলীন হয়ে গেছে।[৬৫] সুবিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Panther tigris tigris) সুন্দরবনের সমার্থক। কিন্তু সুন্দরবনের প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতিই আজ অস্তিত্ব সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে। আইন অমান্য করে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, বাঘ ও হরিণ শিকার এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের কারণে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সুন্দরবন আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ বনকে বাঁচাবার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন প্রকল্প, পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করলেও সেসবের প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়। অথচ ১৮৭৫-৭৬ সালে এ বনের অধিকাংশকে "সংরক্ষিত" বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৬৬]

বছরের পর বছর ধরে সুন্দরবন টিকে রয়েছে লবণ পানি ও মিঠাপানির এক জটিল পরিবেশে। গঙ্গা নদী এবং দেশের অভ্যন্তরের অসংখ্য নদ-নদীর পলিমিশ্রিত মিঠাপানি সুন্দরবনের গাছপালার পুষ্টি বৃদ্ধি করে। সুন্দরবন তিনটি ইকোলজিক্যাল অঞ্চলে বিভক্ত : (ক) ওলিগোহ্যালাইন-এখানে প্রতি লিটার পানিতে লবনাক্ততার মাত্রা ৫০০ থেকে ৫,০০০ মাইক্রোগ্রাম, (খ) মেসোহ্যালাইন-লবণাক্ততার মাত্রা প্রতি লিটারে ৫,০০০ থেকে ১৫,০০০ মাইক্রোগ্রাম এবং (গ) পলিহ্যালাইন-লবণাক্ততার মাত্রা প্রতি লিটারে ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ মাইক্রোগ্রাম।[৬৭]

৫.১০ জোয়ারধৌত বন বিনাশের কারণ

৫.১০.১ শিল্পকারখানা স্থাপন

জীব-বৈচিত্র্যের অসামান্য সম্ভার সুন্দরবনের পরিবেশগত ও বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯৭ সালে একে 'বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো।[৬৮] পরিবেশ অধিদপ্তর সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য ১৯৯৯ সালে বনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা ইসিএ হিসেবে ঘোষণা করে। একই সঙ্গে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শ্বাসমূলীয় এই বনের ইসিএর মধ্যকার মাটি, পানি ও বায়ুর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়, এমন কার্যক্রম নিষিদ্ধ

করা হয়। কিন্তু ইসিএর মধ্যে কোন কোন এলাকা পড়েছে, তা নিয়ে সংশোধিত ও চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ প্রায় ১৯ বছর পর। সে গেজেট অনুযায়ী সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার ১০ উপজেলার ৬৫টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার ২৯৮ মৌজা ইসিএর অন্তর্ভুক্ত।[৬৯] কিন্তু দীর্ঘ এ ১৯ বছরের ব্যবধানে সুন্দরবনের ইসিএ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং গড়ে ওঠার পর্যায়ে রয়েছে। অধিকাংশ শিল্পকারখানার মালিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। এমনকি সরকারও সেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে।

সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা একটি রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা। সম্প্রতি মোংলা ইপিজেড। ছবি: প্রথম আলো, ১ মে, ২০২৫

২০২২ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন থেকে করা "ইমপ্যাক্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অন দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অ্যান্ড ইকোসিস্টেম অব দ্য সুন্দরবন অ্যান্ড সারাউন্ডিং এরিয়াজ" শীর্ষক এক গবেষণায় সুন্দরবনের চারপাশে গড়ে ওঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে আসা বর্জ্য ও গ্যাস আর বিদ্যুৎকেন্দ্রের উত্তপ্ত পানি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করছে বলে বলা হয়।[৭০]

উক্ত গবেষণায় নেতৃত্ব দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী। তিনি বলেন, "আমার স্টাডিতে দেখেছি সুন্দরবনের চারপাশের গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা-সংলগ্ন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারার সংখ্যা কমে এসেছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, রামপাল ও মোংলার সুন্দরবন এলাকায় প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা ২ থেকে ৩টি। অন্যদিকে যেসব এলাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই, সেখানে চারার সংখ্যা প্রতি বর্গমিটারে ১০ থেকে ১৪টি।"[৭১]

তিনি আরও বলেন, সাধারণত প্রতিটি বীজে ভ্রূণ থাকে। কিন্তু দূষণের কারণে অধিকাংশ বীজের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দূষণ জোয়ারের টানে বনের ভেতর চলে

আসে। ফলে বনের মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে হয়তো একসময় উদ্ভিদের বৈচিত্র্য কমে আসবে। সুন্দরবনের বন্য প্রাণি, পাখিসহ সামগ্রিক জীব-বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৭২] ইতিমধ্যে সুন্দরবনের কোথাও কোথাও এ ধরনের ক্ষতি দৃশ্যমান হচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌযান চলাচল ও ইসিএর মধ্যে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা- এই তিন কারণে সুন্দরবনের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ আজ হুমকীর সম্মুখীন। সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষায় যদি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায় থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে হয়তো একদিন সুন্দরবন বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হতে পারে।

ইউনেসকোর সতর্কতা ও সুপারিশ উপেক্ষা করে শুধু যে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে তা নয়। প্রকৃতি সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএনের সুপারিশ পাশ কাটিয়ে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের তিনটি রক্ষিত বনের লক্ষাধিক গাছ, ২৬টি পাহাড় কেটে ও হাতি চলাচলের ১৪টি ক্রসিং পয়েন্টের ওপর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দোহাজারি-কক্সবাজার রেললাইন। অথচ এশিয়ান হাতি ও বেঙ্গল টাইগার- এ দুটি বন্য প্রাণিকে বাংলাদেশের প্রাণ প্রকৃতির 'প্রতিনিধিত্বকারী প্রাণি' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চট্টগ্রামের মিরসরাই উপকূলের ১৫ হাজার একর ম্যানগ্রোভ বন কেটে তৈরি করা হয়েছে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এছাড়াও দেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীতে ১০ হাজার একর রক্ষিত বন ও ইসিএ ঘোষিত সোনাদিয়া অধিগ্রহণ করা হয়েছে পর্যটনের নামে।[৭৩] সুতরাং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রাণ-প্রকৃতি (বনভূমি ও অমানব প্রাণিসমূহ) শিল্পকারখানার চেয়ে গুরুত্বহীন হয়ে উঠছে।

৫.১০.২ পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড

বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। এ বনকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অক্সিজেন ভাণ্ডার ও ঢাল হিসেবে অভিহিত করা যায়। কারণ এটি শুধু নির্মল অক্সিজেনই সরবরাহ করে না, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষকে প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শকাতর বনটিতে মাঝে মাঝেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সাধারণত বনে দুইভাবে আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে। ১. ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিত এবং ২. প্রাকৃতিক তথা দাবানল। গত ২৩ বছরে সুন্দরবনে ২৭ বার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।[৭৪]

পোড়া বনজুড়ে ক্ষতচিহ্ন, উড়ছে ধোঁয়া। সুন্দরবনের ধানসাগর বন টহল ফাঁড়ির তেইশের ছিলা এলাকা। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৪ মার্চ, ২০২৫, পৃ-১৪

সুন্দরবনে আগুন লাগার ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেগুলো 'মানবসৃষ্ট ও পরিকল্পিত'। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবাদীদের মাধ্যমে জানা যায়, কিছু অসাধু মাছ ব্যবসায়ী শুকনা মৌসুমে ইচ্ছাকৃতভাবে গহীন বনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বর্ষা মৌসুমে এসব স্থান প্লাবিত হলে তারা সহজেই লাখ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ ২৩ মার্চ ২০২৫-এ সুন্দরবনে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ভোলা নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ভেতরে বিল এলাকা তৈরি হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এই বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরার সুবিধার্থেই একশ্রেণির অসাধু লোক বনে আগুন দিয়েছে।[৭৫] মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য এভাবে সুন্দরবনের বনজসম্পদ নির্বিচারে ধ্বংস করার ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা প্রতিহত করার জন্য দোষীদের যেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে তেমন বন বিভাগের সক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.১০.৩ অবৈধ রিসোর্ট স্থাপন

সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় অসংখ্য রিসোর্ট গড়ে উঠছে যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে বনের পরিবেশের উপর। কারণ বনের গাছ কেটে, খাল ভরাট করে নির্মাণ করা হচ্ছে এসব রিসোর্ট। খুলনা ও সাতক্ষীরায় ১৪টি রিসোর্ট (অবকাশকেন্দ্র) গড়ে তোলা হয়েছে এবং আরও ৮টির নির্মাণকাজ চলছে। রিসোর্টগুলোতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য বিকট শব্দে জেনারেটর চলছে, বাজছে সাউণ্ড সিস্টেম বা শব্দযন্ত্র। অধিকাংশ রিসোর্টে স্থাপন করা হয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি)। অথচ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে বলা হয়েছে, সুন্দরবন এলাকায় সেখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষতি করে কোনো স্থাপনা নির্মাণ কিংবা কোনো কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৭৬] কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এসব রিসোর্ট নির্মাণ করাতে বনের পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমন পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের পানি, শব্দ ও মাটিদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বন্যপ্রাণিরাও অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সাবেক প্রধান বনরক্ষক এবং আইইউসিএন-এর এদেশীয় সাবেক পরিচালক ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ বলেন, "সুন্দরবন এমনিতেই নানা কারণে বিপদে আছে। এর চারপাশে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠাসহ নানা ধরনের বিপদ বাড়ছে। এখন এভাবে যদি অবৈধভাবে রিসোর্ট তৈরি চলতে থাকে, তাহলে সুন্দরবনের অবস্থা আমাদের গাজীপুরের ভাওয়াল বনের মতো হবে। এসব রিসোর্ট আরও নির্মাণের আগে তা বন্ধ করতে হবে।"[৭৭]

নদীতীরে বালু ভরাট করে উঠছে রিসোর্ট। বানানো হচ্ছে কংক্রিটের রাস্তা। গত ১ মে সুন্দরবন-সংলগ্ন পশ্চিম ঢাংমারী গ্রামে।
ছবি: প্রথম আলো, ০৩ জুন, ২০২৪, পৃ-১

সরেজমিনে দেখা যায়, গাছপালার মধ্যে এসব রিসোর্ট বানানোর জন্য বেশ কিছু বড় গাছ কাটা হয়েছে। প্রাকৃতিক জলাভূমিও নষ্ট করা হয়েছে। রিসোর্টে পৌঁছানোর জন্য কংক্রিট দিয়ে হাঁটার পথ তৈরি করা হয়েছে, শৌচাগার, এমনকি ঘরেও কংক্রিটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অথচ এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'কমিউনিটি-বেজড ইকো কটেজ'। কমিউনিটি বেজড বলা হলেও এসব রিসোর্ট স্থাপনের সাথে স্থানীয়দের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় না। আবার অনেক রিসোর্ট তৈরিতে মানা হয়নি ইকো কটেজ বা রিসোর্ট নির্মাণের নীতিমালা। সুন্দরবনের মতো এমন একটা সংবেদনশীল স্থানে এভাবে রিসোর্ট নির্মাণ অব্যাহত থাকলে তা ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কারণ এ বনকে ইসিএ এলাকা বলা হলেও একে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫.১০.৪ অবৈধ বালু উত্তোলন

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংরক্ষিত ও রক্ষিত বন থেকে নির্বিচারে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট বন এলাকার অমানব প্রাণিসমূহের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। নির্বিচারে বালু উত্তোলনে নদী, খাল ও বিলের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে বনের সীমানায় ঢুকে যাচ্ছে। ফলে বন, বন্য প্রাণি, জীব-বৈচিত্র্যসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের খুটাখালি বাজার হয়ে ডানে তিন কিলোমিটার পথ পেরোলেই মধুশিয়া গর্জন বন। এ বনের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খুটাখালি খালের স্বচ্ছ জলের ধারা। দূর থেকে গর্জনগাছের সারি মুগ্ধতা ছড়ালেও কাছে গেলে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। গাছের গোড়া থেকে সরে গেছে মাটি, যেকোনো সময় ধসে পড়বে এসব গাছ। অর্থাৎ মধুশিয়া গর্জন বন এখন হুমকির মুখে। খুটাখালি খালের উত্তরে বন বিভাগের রক্ষিত বন এবং দক্ষিণে সংরক্ষিত বন। প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ ২০২৫ সালের মে মাসে খালের একটি অংশ নতুন করে ইজারা দিয়েছে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন। বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০২৩-এর ধারা ৪-এর (খ) বিধিতে বলা হয়েছে, বনের সর্বনিম্ন এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ।[৭৮]

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালি খালের উত্তরে বন বিভাগের রক্ষিত বন ও দক্ষিণে সংরক্ষিত বন।
বালু উত্তোলনের কারণে এই বন উজাড় হচ্ছে। ছবি: প্রথম আলো, ২০ মে, ২০২৫ পৃ-১৬

মধুশিয়া বন উজাড় হওয়া প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের অধ্যাপক কামাল হোসেন বলেন, বালু উত্তোলনের কারণে ২০২০ সালের দিকে মধুশিয়া বন উজাড় হওয়া দেখেছি। এখানে শক্তিশালী সিন্ডিকেট জড়িত। ইজারা হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট (সনদ)। এটা দিয়ে তাঁরা আশপাশের বন ও পাহাড় থেকে বালু উত্তোলন করে। স্বাদু পানির বালুর দাম বেশি হওয়ায় এখানকার বালুখেকোরা অনেক বেপরোয়া। তিনি আরও বলেন, বন টিকে থাকে মাটির ওপর। মাটি সরে যাওয়ায় মধুশিয়া বনে গাছপালা হবে না। সামান্য রাজস্বের জন্য এত বড় ক্ষতি মেনে নেয়া যায় না। এ অঞ্চলে বেশ কিছু হাতি আছে, যেগুলো বান্দরবনের লামা থেকে আসে। বেপরোয়া বালু উত্তোলনের কারণে এসব প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৭৯]

দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বন, আবাসিক এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার এক কিলোমিটার সীমানার মধ্যে বালু তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ আইন সম্পর্কে বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবগত হওয়া সত্ত্বেও, রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদী, বিল ও খালে যখন বালু উত্তোলনের জন্য ইজারা দেয়া হয় তখন বিষয়টিকে গভীর উদ্বেগজনক বলা যায়। কারণ এ দুটি বিভাগের উপর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ও সংরক্ষণের দায়িত্বভার ন্যাস্ত রয়েছে। এরূপ উদসীনতার জন্য তাদের নৈতিকতার অবক্ষয়কেই দায়ী করা যায়।

৫.১০.৫ প্যারাবন কেটে বা পুড়িয়ে চিংড়িঘের তৈরি

বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত ছোট্ট একটি দ্বীপ সোনাদিয়া। দ্বীপটি কক্সবাজার শহর থেকে **১১** কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। লাল কাঁকড়া, কাছিম ও বিরল পাখির আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত সোনাদিয়া দ্বীপটি। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০০৬ সালে এ দ্বীপটিকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণা করেছে।[৮০] অথচ এ দ্বীপে অবস্থিত প্যারাবন কেটে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তৈরি করা হচ্ছে চিংড়িঘের।

সাগরদ্বীপ মহেশখালীর প্রতিবেশ সংকটাপন্ন প্যারাবন ধ্বংস করে চলছে চিংড়িঘেরের বাঁধ নির্মাণ। প্যারাবনের কুতুবজোম এলাকায়। ছবি: প্রথম আলো, ০৫ জুলাই, ২০২৪, পৃ-২০

সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ ২০২৫ সালের মে মাসে প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আবারও নতুন করে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে প্যারাবন পুড়িয়ে সোনাদিয়া দ্বীপ দখলের মহোৎসব শুরু হয়েছে। এ প্রতিবেশ সংকটাপন্ন দ্বীপের প্যারাবন ধ্বংসের ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন পরিবেশকর্মীরা। কারণ এভাবে প্যারাবন ধ্বংস করায় দ্বীপে বসবাসকারী অর্ধেকের বেশি প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ধ্বংস হচ্ছে জীব-বৈচিত্র্য এবং উজাড় হচ্ছে পাখির আবাসস্থল।

রাতে জ্বলছে মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপের প্যারাবন।
ছবি: প্রথম আলো, ১৫ মে, ২০২৫, পৃ-১৬

বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের বিষয়টি জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এ নীতিতে বলা হয়েছে, আমাদের দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বায়ু শোধনাগার, কার্বন সিকোয়েস্টার (sequester-শোষক/ধারক), জীব-বৈচিত্র্যের বিশাল বাস্তুসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[৮১] মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা বিবেচনা করে বন সংরক্ষণে ১৬টি নীতি অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।[৮২]

বন এবং বন্য প্রাণি সংরক্ষণে উল্লেখিত জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে যে সকল নীতি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জোয়ারধৌত বন ও বনের অমানব প্রাণিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার সবগুলোই এ নীতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ সকল নীতি অনুসরণে তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অথচ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ আজ অস্তিত্ব সংকটের ঝুঁকিতে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ বন এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন, রিসোর্ট নির্মাণ, পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড, হাজার হাজার একর প্যারাবন কেটে চিংড়িঘের নির্মাণ, অবৈধ বালু উত্তোলন এবং এ বিষয়সমূহ সম্পর্কে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসীনতা নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের বিষয়। এসব কারণেই নির্বিচারে উজাড় হচ্ছে বনভূমিসমূহ, ধ্বংস হচ্ছে অমানব সত্তাসমূহের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, নদী-খাল-বিলের গতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ভূমিধ্বসের মতো ঘটনাও ঘটতে দেখা যাচ্ছে অহরহ। সুতরাং পাহাড়ি এলাকা, সমতল ভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলে এখনো

যতটুকু পরিমাণ বনভূমি অবশিষ্ট আছে তা টিকিয়ে রাখতে পরিবেশ নীতি ২০১৮-এর যথাযথ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে অবস্থিত উল্লেখিত চার প্রকারের বনভূমির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সমতল ভূমি, নিম্ন ভূমি, পাহাড়ি অঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বাস্তুসংস্থানের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই এ সকল বনভূমি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। অঞ্চলভেদে বাস্তুসংস্থানের ভিন্নতা থাকার কারণে উক্ত বনভূমিসমূহের উদ্ভিদের মধ্যে যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তেমন এসব উদ্ভিদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা যে কোনো বনভূমিই একটি দেশের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু উক্ত বনভূমিসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, এ বনভূমিগুলো অনেকটা নাজুক অবস্থায় টিকে রয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, জনসাধারণ ও সরকারের সচেতনতার অভাব, সর্বোপরি অর্থনৈতিক ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বনভূমিগুলোর অবস্থা শোচনীয়। এসব কারণে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ যদি এভাবে দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে তাহলে তা বর্তমানে অস্তিত্বশীল মানুষের জন্য যেমন অশনি সংকেত নির্দেশ করে তেমন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এসব প্রাকৃতিক বনের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিবছর সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এমন একটি উদ্যোগ হলো আবাদি বন বা কৃত্রিম বন।

৫.১১ কৃত্রিম বন

কোনো ফাঁকা জায়গা বা নতুন জায়গাকে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বনে পরিণত করাকে বলা হয় কৃত্রিম বন। বাংলাদেশে কৃত্রিম বনের উদাহরণ হলো- খালি পাহাড়ে রাবার গাছ রোপণের মাধ্যমে, খালি জায়গাতে শুধু বাঁশ লাগানোর মাধ্যমে, একক বা বিভিন্ন মিশ্র প্রজাতির গাছ রোপণের মাধ্যমে বনায়ন এবং উপকূলভাগে নতুন জায়গাতে গরানজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করে ম্যানগ্রোভ বনায়ন।[৮৩] বৃহৎ কোনো কৃত্রিম বন দীর্ঘবছর ধরে যদি অবস্থান করে তাহলে তা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং পরবর্তীতে এ বন প্রাকৃতিক বনের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। কৃত্রিম বন সৃষ্টির সময় যদি প্রাকৃতিক বনের সব ধরনের ছোট বড় গাছ এমনকি আগাছাও রোপণ করা হয় তবে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখিও বনে আগমন করানো যায়। কারণ একবার বন সৃষ্টি হলে পার্শ্ববর্তী প্রাকৃতিক বন থেকে পশুপাখিও আসতে থাকে। যখন কৃত্রিম বনে নতুনভাবে গাছ রোপন না করেও গাছের বীজ বা ফল থেকে নতুন করে গাছ উৎপন্ন হতে থাকে তখন বোঝা যায় যে, কৃত্রিম বনটি স্বাধীন ও প্রাকৃতিক হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বনে বিদেশী প্রজাতি ব্যবহার করলে প্রাকৃতিক বন সৃষ্টি করা কঠিন হয় বা আদৌ সম্ভব নাও হতে পারে।[৮৪] লিওপোল্ড তার ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধে বনায়নে ক্ষেত্রে দেশি প্রজাতির বৃক্ষের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে)।

বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও শালবন এলাকাতে কৃত্রিম বন তৈরি করেছে। কৃত্রিম বন তৈরির ক্ষেত্রে সাধারণত বিদেশী বা আগ্রাসী প্রজাতির গাছ যেমন, ইউক্যালিপটাস, আকাশিয়া, রাবার, সেগুন ও পাইন গাছের উপর

গুরুত্বারোপ করা হয়। সাধারণত জ্বালানি কাঠ উৎপাদন এবং মণ্ড ও পেপার মিলের কাঁচামাল তৈরির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বন তৈরি করা হয়। এজন্য অনেক সময় এ বনকে বাণিজ্যিক বা শিল্পবন বলেও অভিহিত করা হয়।[৮৫]

বাংলাদেশের যেসব এলাকাতে প্রাকৃতিক বন মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়েছে এবং যেখানে প্রাকৃতিক বন ফিরিয়ে আনার আর কোনো সম্ভাববনা নেই সেখানে কৃত্রিম বন তৈরি করার কথা থাকলেও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কারণ অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক বন উজাড় করেই কৃত্রিম বন তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃত্রিম বনের পরিধি এখনো বেশি বড় না হলেও ক্রমাগতভাবে তা বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু যে অঞ্চলেই কৃত্রিম বনের পরিধি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, তার পার্শ্ববর্তী প্রাকৃতিক বন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে যদি কৃত্রিম বনের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে তা প্রাকৃতিক বনের জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে।[৮৬]

৫.১২ বনভূমি রক্ষায় বন বিভাগের ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। এ অনুচ্ছেদটি "পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" সম্পর্কিত। এ অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দায়িত্ব শুধুমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত করা হয়নি, গোটা রাষ্ট্র এবং সরকারের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকেই এ জন্য দায়বদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো-রাষ্ট্র, সরকার এবং সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কি জনগণের আমানত এই পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্যের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন? বন বিভাগের কাজ হলো দেশের প্রাকৃতিক বনভূমির গাছপালা ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা। কিন্তু বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আগ্রাসন থেকে বন বিভাগ দেশের প্রাকৃতিক বনগুলোকে রক্ষা তো করতে পারছেই না, উল্টো নিজেরাই এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করছে, যা বনের জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। যেমন, উদাহরণ হিসেবে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনে বন বিভাগ কর্তৃক সাফারি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনার কথা বলা যেতে পারে।[৮৭]

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুসারে, সংরক্ষিত বনে স্থাপনা নির্মাণ তো দূরে থাক, বিনা অনুমতিতে মানুষের বনে প্রবেশ পর্যন্ত নিষেধ। সেই বনে বন বিভাগ পাহাড় ও গাছ কেটে ৫ হাজার ৬৩১ একর জায়গাজুড়ে সাফারি পার্ক নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বনের মধ্যে রেস্টহাউস, পাকা সড়ক, হেলিপ্যাড, কাচের তৈরি লিফট ও সিঁড়ি বা স্কাইওয়াক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সাফারি পার্কে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বন্য প্রাণি আমদানি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বনমন্ত্রীর এলাকায় সংরক্ষিত বন কেটে সাফারি পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্তকে 'আত্মঘাতী' প্রকল্প বলে অভিহিত করছেন পরিবেশবিদরা।পরিবেশবাদী ও বিশেষজ্ঞরা বিদেশী বন্য প্রাণি আমদানি ও বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করে মানুষের উপস্থিতি বাড়ানো সংরক্ষিত বনের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন।[৮৮]

রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টারের (আরডিআরসি) এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৪ মাসে দেশজুড়ে উন্নয়নের নামে প্রায় ১১ লাখ ৪৬ হাজার ৪৬৫টি গাছ কেটেছে সরকারের ২৫টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনেই গাছ কাটা হয়েছে ৭ লাখ ৬ হাজার ৩২১টি। এ সময় সবচেয়ে বেশি গাছ কাটা হয়েছে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় সংরক্ষিত বনে, এখানে প্রায় পাঁচ লাখ গাছে উন্নয়নের কোপ পড়েছে। এই এক বছরে সবচেয়ে বেশি গাছ কেটেছে বন বিভাগ-৪ লাখ ১৭ হাজার ৭৭০টি।[৮৯] অর্থাৎ যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেশের পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা, তাঁরা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দখল-দূষণের হাত থেকে সেই পরিবেশ রক্ষার কাজ তো করছেই না, উল্টো নিজেরাই পরিবেশ ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। তাঁরা সংরক্ষিত বনকে পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করছেন, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে প্রকৃতিবিরোধী নানা ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করছেন, গাছ কাটছেন, পাহাড় ধ্বংস করছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে নির্বিচারে বন উজাড়ের যতগুলো কারণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন। লিওপোল্ডের মতে, 'মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন যত কম সহিংস হবে, ভূমি-পিরামিডের সফল পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা তত বেশি হবে'-এ সাধারণ সিদ্ধান্তটিকে ইতিহাস ও বাস্তুশাস্ত্র উভয়ই সমর্থন করে। তবে লিওপোল্ড মনে করেন সহিংসতার মাত্রা নির্ভর করে জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর, কারণ জনবহুল এলাকায় সহিংস রূপান্তর বেশি হয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন; উত্তর আমেরিকা যদি তার জনসংখ্যার ঘনত্ব সীমিত রাখতে পারে, তাহলে তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা ইউরোপের তুলনায় বেশি হবে।[৯০] লিওপোল্ডের মতানুসারে, এ বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক বলা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালীন বন উজাড়ের ইতিহাস এবং বিভিন্ন বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমানহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের অতিরিক্ত চাহিদার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বনভূমিসমূহের উপর। লিওপোল্ড বলেন, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত আমাদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী; কারণ ধরে নেয়া হয় যে, জনসংখ্যার ঘনত্বের সামান্য বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, সুতরাং সীমাহীন বৃদ্ধিও সীমাহীন সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসবে। লিওপোল্ডের মতে, বাস্তুশাস্ত্র বা পরিবেশবিদ্যার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে সমৃদ্ধির সাথে জনসংখ্যার ঘনত্বের এমন কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায় না যা অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যকর থাকে। কারণ জনসংখ্যার ঘনত্ব থেকে প্রাপ্ত সব সুবিধাই ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।[৯১]

৫.১৩ লিওপোল্ডের সংরক্ষণবাদী মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা

লিওপোল্ড তাঁর "ভূমি নীতিবিদ্যা" প্রবন্ধে একটি ভূমি নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন যা পরিবেশগত বিবেকের অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করবে। কারণ তাঁর মতে, এ ধরনের বিবেক আবার ভূমি স্বাস্থ্যের প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্বের দৃঢ় প্রত্যয়কেও প্রতিফলিত করে। ভূমির স্বাস্থ্য বলতে লিওপোল্ড ভূমির "আত্ম-নবীকরণের"[৯২] (Self-renewal) ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। এই ক্ষমতাকে বোঝার এবং রক্ষা করার প্রচেষ্টাকেই লিওপোল্ড সংরক্ষণ বলে অভিহিত করেন। লিওপোল্ড বলেন, সাধারণত সংরক্ষণবাদীরা তাদের মতবিরোধের জন্যই পরিচিত। আপাতদৃষ্টিতে তাদের মতামত কেবল বিভ্রান্তি তৈরি করে বলে মনে হয়; কিন্তু সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্রেই একই ধরনের বিভাজন পরিলক্ষিত

হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি দলের (ধরা যায়, গ্রুপ-ক ও গ্রুপ-খ) বিপরীত মতামত বা অবস্থান দেখা যায়। যেমন, ভূমির ক্ষেত্রে একদল (ক) ভূমিকে বিবেচনা করে কেবল মাটি হিসেবে, যার কাজ শুধুই পণ্য উৎপাদন করা; আরেকটি দল (খ) ভূমিকে দেখে একটি জীবজগৎ হিসেবে, যার কার্যকারিতা আরও বিস্তৃত ও জটিল।[৯৩]

লিওপোল্ড বলেন, তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বন ব্যবস্থাপনায় গ্রুপ-ক বাঁধাকপির মতো গাছ চাষেও সন্তুষ্ট; যেখানে সেলুলোজই (উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ) হচ্ছে বনজ পণ্যের মূল উপাদান। এই দলটি সহিংস ব্যবস্থাপনায় কোনো বাধা প্রদান করে না; কারণ তারা কৃষিবিদ্যাকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করে। অন্যদিকে গ্রুপ-খ মনে করে বন ব্যবস্থাপনা মৌলিকভাবে কৃষিবিদ্যার থেকে আলাদা, কারণ এখানে প্রাকৃতিক প্রজাতিকে কাজে লাগানো হয় এবং লক্ষ্য থাকে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরির পরিবর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে গ্রুপ-খ নীতিগতভাবে প্রাকৃতিক প্রজননকে পছন্দ করে। তারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয়, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়েও চিন্তিত। যেমন, চেস্টনাট বা হোয়াইট পাইনের মতো প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া তাদের ভাবায়। তারা গাছপালার বাইরেও চিন্তা করে বন্য প্রাণি, বিনোদন, জলাভূমি এবং অরণ্য সংরক্ষণের মতো গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। লিওপোল্ডের মতে, এই গ্রুপের (খ) মানুষেরা পরিবেশগত বিবেকের আলোড়ন অনুভব করে।[৯৪]

লিওপোল্ড বলেন, বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একইরকম বিভাজন দেখা যায়। গ্রুপ ক-এর কাছে প্রধান বিষয় হচ্ছে শিকার ও মাংস। শিকারে কতগুলো প্রাণি ধরা পড়েছে, সেটার উপরেই তাদের সাফল্য নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে গ্রুপ-খ সমগ্র জীব-বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা করে। যেমন, আমাদের কি আর বিদেশি প্রজাতির ওপর আরও নির্ভর করা উচিত? মাঠে বিলুপ্ত প্রায় প্রেইরি গ্রাউস-এর মতো প্রজাতি, যেগুলো শিকারের যোগ্যই নয়- তাদের কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়? ট্রাম্পেটার রাজহাঁস এবং হুপিং সারসের মতো দুর্লভ ও বিপন্ন প্রাণিগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে ব্যবস্থাপনা কী ভূমিকা নিতে পারে? বুনো ফুলের ক্ষেত্রেও কি একই নীতিমালা প্রয়োগ করা যায়? লিওপোল্ড বলেন, আমার কাছে একটা বিশ্বাস পরিষ্কার যে বন ব্যবস্থাপনার মতো বন্যপ্রাণি সংরক্ষণেও ক-খ বিভাজন দেখা যায়।[৯৫] লিওপোল্ডের উল্লেখিত মত থেকে বোঝা যায় যে, গ্রুপ-খ এর সমর্থনকারীরাই হলেন সংরক্ষণবাদী। সংরক্ষণবাদীরা হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির বৃক্ষ, দুর্লভ ও বিপন্ন অমানব প্রাণিসমূহ পুনরুদ্ধারেরই শুধু চেষ্টা করে না বরং জলাভূমি ও বনভূমি সংরক্ষণেরও সুপারিশ করে। তারা ভূমিকে মাটি হিসেবে নয়, সমগ্র জীবজগৎ হিসেবে বিবেচনা করে যার উপর উক্ত অমানব সত্তাসমূহ অস্তিত্বশীল হয়। এজন্য বৃহৎ ও সামগ্রিক অর্থে তারা ভূমিকে সংরক্ষণ করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্য পূরণে তারা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নীতিগতভাবে পরিবেশগত বিবেক দ্বারা তাড়িত হন। ভূমি নীতিবিদ্যা প্রবন্ধে লিওপোল্ডকেও একজন সংরক্ষণবাদী হিসেবে পাওয়া যায় (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ে)।

লিওপোল্ড বন, অমানব প্রাণি এবং সার্বিকভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন দুটি দলের (গ্রুপ-ক এবং গ্রুপ-খ) কথা বলেন, সেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রুপ-খ-এর তুলনায় গ্রুপ-ক-এর সদস্য সংখ্যা বেশি। তারপরও গ্রুপ-খ-এর সমর্থনকারী সদস্যবৃন্দ বা সংরক্ষণকারী বা সংস্থাসমূহ (সরকারী এবং বেসরকারী উভয়ই) পরিবেশগত বিবেকবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে উক্ত অমানব

সত্তাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা গ্রুপ-ক-এর সহিংস আচরণ দ্বারা আক্রান্ত হন। কারণ গ্রুপ-ক-এর সদস্যবৃন্দ অর্থনৈতিক ও উপাযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে অমানব সত্তাসমূহকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো গ্রুপ-ক-এর সদস্যদের মধ্যে পরিবেশগত বিবেকের আলোড়ন জাগ্রত করা। আর এ উদ্দেশ্য পূরণে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

লিওপোল্ড বলেন, যত দিন যাচ্ছে ততোই আধুনিক মানুষ প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ও অসংখ্য যান্ত্রিক উপকরণ মানুষকে প্রকৃতির থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।[৯৬] বর্তমানে মানুষের সাথে ভূমির কোনো গভীর ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক নেই; ভূমি বলতে তারা বোঝে দুটি শহরের মাঝখানে ফসল ফলানোর জন্য কেবলমাত্র একটা ফাঁকা জায়গা। কোনো এক ব্যক্তিকে যদি এক দিনের জন্য একটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সেই জায়গাটাকে সে হয় গলফ খেলার মাঠ বা দৃশ্যমান পর্যটন এলাকা হিসেবে দেখতে প্রত্যাশা করবে। যদি কৃষিকাজের পরিবর্তে 'হাইড্রোপনিক'[৯৭] পদ্ধতিতে ফসল উৎপন্ন করা যেত, তাহলে সেটিই তাকে বেশি সন্তুষ্ট করতো। এমনকি কাঠ, চামড়া, পশম এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সামগ্রীর কৃত্রিম বিকল্পই তার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সংক্ষেপে বললে, ভূমি যেন তার কাছে অতীত একটা পুরনো অধ্যায়, যেটি সে পিছনে ফেলে এসেছে।[৯৮]

লিওপোল্ডের মতে, পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমিকে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমত প্রয়োজন পরিবেশবিজ্ঞান বা বাস্তুবিদ্যাগত জ্ঞান উপলব্ধি করা, যা কেবলমাত্র 'শিক্ষা' দ্বারা অর্জিত হয় না, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উচ্চতর শিক্ষা অনেক সময় সচেতনভাবে পরিবেশগত ধারণাগুলোকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কিত এই উপলব্ধি যে বাস্তুবিদ্যাগত নামধারণকারী কোনো কোর্স থেকেই উদ্ভূত হতে হবে এমন নয়; এর উৎস ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ইতিহাস কিংবা অর্থনীতিও হতে পারে। বিষয়ের নাম যাই হোক না কেন, বাস্তুবিদ্যাগত বা পরিবেশবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা খুবই বিরল।[৯৯] লিওপোল্ডের এ মতটি বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা এবং পরিবেশ ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষায়িত বিভাগ ও কোর্সসমূহ চালু রয়েছে। এ সকল বিভাগ ও কোর্সের পাশাপাশি লিওপোল্ড- উল্লেখিত বিষয়গুলোতেও নীতিগত দিক থেকে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের বৈশিষ্ট্য, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জি

১. Aldo Leopold, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There,* Oxford University Press, London, 1949, p. 203.

২. "Land Spaning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover more than 10 percent, or trees able to reach these thresholds

in situ. It does not include land that is predominantly under agricultural or urban land use." দেখুন, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Global Forest Resources Assessment 2020, Terms and Definitions,* Rome, 2018, p. 10.

৩. TK Dey, Introduction to the Wildlife of Bangladesh and Management Techniques, Nature Conservation Society, Dhaka, 2018, p. 1148. দেখুন, এস.এম. ইকরামুল ইসলাম রাসেল, "লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের বনভূমি সংরক্ষণ," *জীবন দর্শন*, ভলিউম. ১০, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৮১।

৪. সৈয়দ সালামত আলী, *বাংলাপিডিয়া,* খণ্ড ০৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ২৫২।

৫. *প্রাগুক্ত*।

৬. মোস্তফা কামাল পাশা, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ০৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৫২।

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. ফিলিপ গাইন, *বাংলাদেশের বিপন্ন বন*, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩।

৯. *প্রাগুক্ত*।

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩-৫।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

১৩. দেবাশীষ রায়, *সাসটেইনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস।* দেখুন, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ, ২০২৫, পৃ. ৫।

১৪. *প্রাগুক্ত*।

১৫. *প্রাগুক্ত*।

১৬. *প্রাগুক্ত*।

১৭. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

১৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ, ২০২৫, পৃ.৫।

১৯. *প্রাগুক্ত*।

২০. *প্রাগুক্ত*।

২১. *প্রাগুক্ত*।

২২. *প্রাগুক্ত*।

২৩. *প্রাগুক্ত*।

২৪. *প্রাগুক্ত*।

২৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জুলাই, ২০২৩, পৃ.৩।

২৬. *প্রাগুক্ত*।

২৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ মার্চ, ২০২৪, পৃ.১।

২৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ০২ নভেম্বর, ২০২০, পৃ.৫।

২৯. *প্রাগুক্ত*, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ১-২।

৩০. *প্রাগুক্ত*, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫, পৃ. ৩।

৩১. *প্রাগুক্ত*।

৩২. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৩৪. *প্রাগুক্ত*।

৩৫. পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ এবং এডিবি, চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, মেইন রিপোর্ট ১৯৭৮, পৃ. ৪৭।

৩৬. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

৩৭. *প্রাগুক্ত*।

৩৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ১।

৩৯. *প্রাগুক্ত*।

৪০. *প্রাগুক্ত*।

৪১. *প্রাগুক্ত*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ৩।

৪২. *প্রাগুক্ত*, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪,পৃ. ১।

৪৩. *জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮*, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১৪।

৪৪. ১. পাহাড় প্রতিবেশের উপর বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পাহাড় প্রতিবেশ সংরক্ষণ কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

২. অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ ব্যতিরেকে পাহাড়, টিলা কাটা বা অপসারণ করা যাবে না।

৩. স্থানীয় জাতের ফসল চাষের মাধ্যমে জৈব কৃষি ব্যবস্থার (Organic farming) প্রবর্তন এবং কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. টেকসই পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিতকরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় পর্যটক সমাগম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে।

৫. পাহাড়ি এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য লাগসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়াটশেড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

৬. পাহাড়ি এলাকার ছড়া, ঝরনা ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষের পরিবর্তে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যথাসম্ভব তিন স্তরের কৃষি বনায়ন চালু করতে হবে।

৮. জুমচাষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং তদনুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; স্থানীয় গোত্রীয় নেতা ও জনগোষ্ঠীকে জুমচাষ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমচাষ নিষিদ্ধ করতে হবে।

১০. ভূমিধ্বস ও ভূমিক্ষয় রোধে পাহাড়ি বনের অবক্ষয় রোধ, বন সংরক্ষণ এবং নতুন বন সৃজন ও পাহাড় সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

১১. ন্যাড়া বা উন্মুক্ত পাহাড়ি এলাকা বনায়নের আওতায় আনতে হবে। স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদে বনায়ন জোরদার করতে হবে।

১২. পাহাড় প্রতিবেশ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনাঞ্চল, দীর্ঘমেয়াদে প্রবাহ বজায় রাখা এবং ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বনের উপর চাপ কমাবার জন্য বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ফলদ, বনজ, ভেষজ ও শাক-সবজির চাষাবাদসহ খাঁচায় মৎস্যচাষে উৎসাহিত এবং জ্বালানি দক্ষ চুলা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দেখুন, *প্রাগুক্ত*।

৪৫. মোস্তফা কামাল পাশা, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

৪৭. *প্রাগুক্ত*।

৪৮. *প্রাগুক্ত*।

৪৯. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২।

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।

৫৬. *প্রাগুক্ত*।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

৫৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ মে ২০২৫, পৃ. ৪।

৫৯. *প্রাগুক্ত*।

৬০. মোস্তফা কামাল পাশা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

৬২. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

৬৩. *প্রাগুক্ত*।

৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৬৫. *প্রাগুক্ত*।

৬৬. *প্রাগুক্ত*।

৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

৬৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১লা মে ২০২৫, পৃ.১।

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৭০. *প্রাগুক্ত*।

৭১. *প্রাগুক্ত*।

৭২. *প্রাগুক্ত*।

৭৩. *প্রাগুক্ত*।

৭৪. *প্রাগুক্ত*, ২৪ মার্চ, ২০২৫, পৃ. ১৪।

৭৫. *প্রাগুক্ত*।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, ৩রা জুন, ২০২৫, পৃ. ১।

৭৭. *প্রাগুক্ত*।

৭৮. *প্রাগুক্ত*, ২০ মে ২০২৫, পৃ. ১৬।

৭৯. *প্রাগুক্ত*।

৮০. *প্রাগুক্ত*, ৫ জুলাই, ২০২৪, পৃ. ২০।

৮১. *জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

৮২. ১. দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

২. সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. বনভূমি সংকোচন ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ নিরোধ করতে হবে এবং ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৪. বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৫.বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৬.দেশের জলাভূমি ও পরিযায়ী (migratory) পাখির আবাস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

৭.পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো প্রজাতির প্রাণি-উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।

৮.দেশের বন্যপ্রাণি, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদার করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।

৯.কাঠের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাতে মূল্য সংযোজিত (Value added) পণ্য, অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদন ও কাঠের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

১০.বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

১১.প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) এবং সংরক্ষিত এলাকা (পিএ)- সমূহে সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২.বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩.বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন ও বাফার জোন নির্ধারণ করে কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে শুধুমাত্র বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম সীমাবদ্ধ করতে হবে।

১৪.প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

১৫.বনের বাইরে কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা যেন বন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং বনভূমির পাশে শিল্পকারখানা ও জনসমাগম হয় এমন স্থাপনা নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৬.জীব-বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ বন এলাকা সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন) হতে মুক্ত রাখতে হবে। দেখুন, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ১২-১৩।

৮৩. অরুণ কুমার লাহিড়ী, *পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯৪।

৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫।

৮৫. ফিলিপ গাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৮৬. *প্রাগুক্ত*।

৮৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৬, জুলাই, ২০২৪, পৃ. ৫।

৮৮. *প্রাগুক্ত*।

৮৯. *প্রাগুক্ত*।

৯০. Aldo Leopold, *প্রাগুক্ত*, p. 220.

৯১. *প্রাগুক্ত*।

৯২. "আত্ম-নবীকরণ" বলতে নিজেকে নবায়ন করা বা নিজের ভেতরের শক্তি, উদ্যম বা গুণাবলিকে নতুন করে জাগ্রত করা বা সতেজ করাকে বোঝায়।

৯৩. Aldo Leopold, প্রাগুক্ত, p. 221.

৯৪. *প্রাগুক্ত*।

৯৫. *প্রাগুক্ত*, p. 221-222.

৯৬. *প্রাগুক্ত*, p. 223-224.

৯৭. 'হাউড্রোপনিক' পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পানিতে গাছের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোনো আবাদি জমির প্রয়োজন পড়ে না। দেখুন, *হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ*, সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, জুন, ২০১৮, পৃ. ১-২।

৯৮. Aldo Leopold, প্রাগুক্ত, p. 224.

৯৯. *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

এসডিজি ১৫ অর্জনে বনভূমির গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনে বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ প্রভৃতির জন্য সরাসরি প্রকৃতি ও বনজসম্পদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের যে অফুরন্ত ভান্ডারের প্রয়োজন হয় সেটাও বনের বৃক্ষ থেকেই আসে। এছাড়াও মানুষ বনের নানা উদ্ভিদ প্রজাতির থেকে কাঠ, কাগজ, রাবার, আঠা, তন্তু, রজন, ট্যানিন, ফুল-ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। একইভাবে বনের নানা প্রাণিজ প্রজাতি থেকে মাংস, দুধ, চামড়া, পালক, উল, মধুর যোগান আসে। বনজ সম্পদের সাথে মানুষের জীবন ও জীবিকার যেমন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, তেমন বন রক্ষার উপর সমগ্র অমানব সত্তার সংরক্ষণও পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল যা এসডিজি ১৫ অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বনের বৃক্ষ ও অমানব প্রাণি আমাদের পরম বন্ধু, কারণ উন্নয়ন, অর্থনীতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদের অবদান অপরিসীম।

৬.১ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা ও অর্থনীতিতে বনভূমির অবদান

২০২০ সালের মে মাসে সুপার সাইক্লোন 'আমপান'-এর আঘাতের কারণে উপকূলীয় সম্পদের অনেক ক্ষতি হলেও সুন্দরবনের কারণে প্রাণহানির পরিমাণ অনেক কম ছিল। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ সালের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা এবং ২০১৯ সালের নভেম্বরে বুলবুল প্রভৃতি ঘূর্ণিঝড়সমূহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূল ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে তীব্র আঘাত এনেছিলো তাতে সুন্দরবন প্রাকৃতিক রক্ষা বর্মণ হিসেবে কাজ করেছিলো। ফলে বনজ সম্পদ, প্রাণি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যেমন কম ছিল তেমন প্রাণহানির পরিমাণও ছিল আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম। সুন্দরবন প্রতিদিন লক্ষাধিক টন কার্বন শোষণ করে দেশের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়াও সুন্দরবন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, মিষ্টি পানির কুমির এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির পাখিদের টিকে থাকার অন্যতম স্থান। এ বনের বনজ সম্পদ ও পর্যটন স্পটসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দেশের মোট বনভূমির ২৫% অবস্থিত। এ অঞ্চলের বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ ও বন্যার প্রভাব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আবার আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন চাকমা, মারমা, ম্রো এবং গারো জনগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমিকে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসত বাড়ির আঙিনায় অবস্থিত বনভূমিসমূহ গ্রামীণ জীবনধারার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামবাসীরা তাদের খাদ্য, জ্বালানি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং জীবিকার ক্ষেত্রেও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ (সম্ভাব্য) পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বনজ সম্পদের অবদান তুলে ধরা হলো-[১]

Dhaka University Institutional Repository

অবদানের ক্ষেত্রসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০ (সম্ভাব্য)
১. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (মিলিয়ন টাকা)	২৫৬৬৭৬	২৮৫৫৬৮	৩২৫৭৪১	৩৫৪৮৯৭
২. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি ভাগ	১.৩৭%	১.৩৪%	১.৩৫%	১.৩৩%
৩. চলতি বাজার মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৮.৬৩%	১১.২৬%	১৪.০৭%	৮.৯৫%
৪. স্থির বাজার মূল্যে জিডিপি (মিলিয়ন টাকা)	১৫১১২৮	১৫৯৪৫৩	১৭২৭৪৪	১৮৩৭২৯
৫. স্থির বাজার মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি ভাগ	১.৬৬%	১.৬২%	১.৬২%	১.৬৪%
৬. স্থির বাজার মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৫.৬০%	৫.৫১%	৮.৩৪%	৬.৩৬%

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বনভূমির অবদান অপরিসীম। টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞানুসারে বাংলাদেশে যে পরিমাণ বনভূমি আছে তা এখনো বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে সক্ষম (পরিমাণে কিছুটা কম হলেও)। কিন্তু এ বনজ সম্পদ এবং এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কারণ বনভূমি এবং বনজ সম্পদের নানাবিধ অর্থনৈতিক উপযোগিতা থাকায় বর্তমানে অস্তিত্বশীল মানুষের অসীম চাহিদার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এর উপর। লিওপোল্ড অনুসারে বলা যায়, বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে বনভূমি হ্রাসের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো একে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা। লিওপোল্ড বলেন, ভূমির যথার্থ ব্যবহারকে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা বন্ধ করতে হবে। ভূমি সম্পর্কিত প্রতিটি প্রশ্নকে বিবেচনা করতে হবে নৈতিকতা, সৌন্দর্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কার্যকারিতার সমন্বয়ে।[২] লিওপোল্ড বলেন, অবশ্য এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অর্থনৈতিক বাস্তবতা আমাদের কর্মকাণ্ডের সীমা নির্ধারণ করে, করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু অর্থনীতি নির্ধারকদের যে বিভ্রম আমরা বহন করছি সেটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে, তা হলো- এই বিশ্বাস যে, ভূমি ব্যবহারের সকল সিদ্ধান্ত অর্থনীতি নির্ধারণ করে। কারণ বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও অসংখ্য আচরণ ও মনোভাব ভূমি সম্পর্কিত অধিকাংশ সম্পর্ককে গড়ে তোলে, যা মূলত ভূমি ব্যবহারকারীর রুচি ও প্রবণতার দ্বারা নির্ধারিত হয়, পকেটের অবস্থা দিয়ে নয়। ভূমির প্রতি আমাদের অধিকাংশ দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে সময়, দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও বিশ্বাসের বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে, অর্থের উপর নয়।[৩]

৬.২ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিবেশের অবক্ষয়ের সম্পর্ক

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডকে উন্নয়ন বলা হয়।[৪] নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে একটি দেশ বা জাতিকে উন্নত করে তোলা যায়। একটি দেশের উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়ে সফলতা অর্জন করার জন্য মানুষ যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করে বা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশের

Dhaka University Institutional Repository

উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্রমবর্ধমানহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বন উজাড় করে কৃষিজমির পরিধি সম্প্রসারণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান্ত্রিকসভ্যতা বৃদ্ধিজনক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয়ভাবে পরিবেশকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। রাস্তাঘাট, সেতু, যানবাহন ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থল ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নয়ন; বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে শিল্প ও সেচ ব্যবস্থার এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়।[৫] এ সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ যতো বেশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, ততো বেশি প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তির আংশকা বাড়তে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে- অমানব সত্তাসমূহের কথা চিন্তা করে আমরা কি তাহলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বর্জন করবো? এর উত্তর হলো, না। কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও বেসরকারি) আছে যারা অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অসংখ্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এজন্য উন্নত দেশগুলো ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে (ধরীত্রী সম্মেলন) অংশগ্রহণ করার পর থেকে প্রত্যেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার শুরুতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও তার জন্য যথাযথ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকর করার উপর জোর দিয়ে আসছে। তাদের মতে, এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে তেমন অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তিসাধন এবং পরিবেশের অবক্ষয় সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব না হলেও অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

যতো বেশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, ততো বেশি পরিবেশের অবক্ষয় বাড়তে থাকবে। যা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-

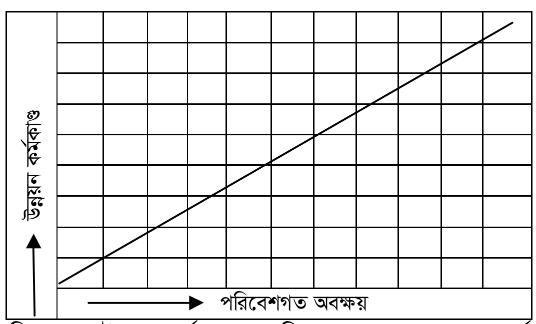

চিত্র ১.১: উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের সম্পর্ক।
অরুণ কুমার লাহিড়ী, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩

সাধারণত পরিবেশের অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করা ব্যয়বহুল ব্যাপার হলেও উন্নত দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পরিবেশের অবক্ষয় রোধে বদ্ধপরিকর। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পরিবেশের অবক্ষয় টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ বাংলাদেশে কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর তেমন কোনো গুরুত্বারোপ করা হয় না। যেমন, সুন্দরবনের পাশে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প (সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবে) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোকে নির্বাচন করার কারণে অমানব প্রাণি, বনভূমি ও ভূমির বিলুপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

সাধনের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পূর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অমানব সত্তাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা তা নিরূপণ বা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬.৩ এসডিজি ১৫ অর্জনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে এসডিজি ১৫ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে জীব-বৈচিত্র্যের যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বিপুল জনগোষ্ঠীর ওপর। বিশেষ করে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে যারা কৃষি, মৎস্য ও বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তাদের ওপর এ প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ শতাংশ এখনো কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছে। সিনথেটিক ঔষধসমূহের প্রায় অর্ধেক আইটেম তৈরির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো বাংলাদেশের বহুমুখী সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু জীব-বৈচিত্র্যের উপর পরিবেশ বিধ্বংসী অর্থনৈতিক রূপান্তরমূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়ার কারণে সেই বাস্তুতন্ত্রও আজ মারাত্মক হুমকিতে রয়েছে। অর্থাৎ জীব-বৈচিত্র্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে মানুষের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তেমন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওষুধ খাতও, যার প্রভাব পড়বে জনস্বাস্থ্যের উপর। বন উজাড়ীকরণ ও বনের অবক্ষয়, ভূমি ও সমুদ্রের অবক্ষয় এবং নদীর পানি দূষণ, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অবিবেচনা- প্রসূতভাবে বিভিন্ন জলাশয় ভরাট করে ফেলা, অটেকসই উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি এবং পুকুর, নদী ও হ্রদের মৎস্যসম্পদের ব্যবহার এবং অটেকসই উপায়ে চিংড়ি চাষের মতো ঘটনাসমূহ সম্মিলিতভাবে বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করছে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য জীব-বৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এসব সমস্যা দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৬]

স্থলজ জীব-বৈচিত্র্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সকল অংশীজনের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সংরক্ষিত ও সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনায় একটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন করা। পাঁচটি জাতীয় উদ্যান পরিদর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের প্রবেশমূল্যের ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত এলাকাসমূহে সুষ্ঠুভাবে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি দক্ষ কৌশল উদ্ভাবন করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দর্শনার্থীর সংখ্যা যেন কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ধারণক্ষমতার বেশি না হয় এবং সেখানকার বাস্তুতন্ত্র যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[৭]

উক্ত দুটি চ্যালেঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্যের জন্য আরও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে পরিবেশের ওপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ, মানববসতি ও কৃষি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, চাষাবাদ স্থানান্তর, বিভিন্ন জীবের আবাসস্থলের অবক্ষয় ও সেগুলোর ধ্বংসাধন প্রভৃতি বিষয়গুলো বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও বাংলাদেশে এসডিজি ১৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮]

৬.৪ এসডিজি ১৫ অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহ

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বনজ সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণ এবং সবুজ অর্থনীতিতে[৯] উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অবক্ষয়িত বাস্তুতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা ও কাঠ, খাদ্য, পানি, জ্বালানি, পশুখাদ্য, ওষুধ, বন্যপ্রাণির বাসস্থান, জীব-বৈচিত্র্য, জলবায়ু প্রশমন, ইকোট্যুরিজম এবং সবুজ পেশার জন্য টেকসই বনজ সম্পদ উৎপাদন একটি পূর্বশর্ত।[১০] বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ অব্যাহত রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে উজাড় হচ্ছে বনভূমিসমূহ, ধ্বংস হচ্ছে জীব-বৈচিত্র্যসহ বন-বাস্তুতন্ত্র; যার প্রভাব পড়ছে দেশের সমগ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর।

বাংলাদেশে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় আইন, নীতি, কৌশল, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং কনভেনশন রয়েছে। এর মাধ্যমে বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে ইতিমধ্যে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে-

বনের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৫-২০২৫) অধীনে বাংলাদেশ সরকার বন ব্যবস্থাপনা উন্নীতকরণের ওপর জোর দিয়েছে। এসব পরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় মিশ্র প্রজাতির বনায়ন, কৃষি-বনায়ন, সহব্যবস্থাপনা, মা- বৃক্ষ সংরক্ষণ, টিস্যু কালচার ও দক্ষ পেশাদার জনশক্তি তৈরি করা।[১১] বনের ওপর চাপ কমাতে বননির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা এবং দখলকৃত বন পুনরুদ্ধারে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, বন্যপ্রাণি ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বন টহলদলের সক্ষমতা বাড়াতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।[১২]

উপকূল অঞ্চলে নতুনভাবে জেগে ওঠা চরসমূহে উপকূলীয় বনায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২৩ হাজার ৮১৮ হেক্টর এলাকায় বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে একটি সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর নতুনভাবে জেগে ওঠা চর ও পতিত জমিতে বনায়নের লক্ষ্যে একটি প্রেক্ষিত মানচিত্র প্রণয়ন করেছে।[১৩]

২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বন অধিদপ্তর জাতীয় বন ইনভেন্টরি (এনএফআই) পরিচালনা করেছে। এ ইনভেন্টরির উদ্দেশ্য ছিল বনজ ও বৃক্ষ সম্পদের পরিস্থিতি জানা, কার্বন ও বায়োমাসের মজুদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বন ও বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীলতার মাত্রা অনুধাবন করা। সরকার কৃষি, বন ও ভূমির অন্যান্য ব্যবহার থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ অনুমান করার উদ্যোগ নিয়েছে। বন খাত থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জাতীয় আরইডিডি কৌশল (BNRS) প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বৃক্ষ ও বনের আবর্তনমাত্রা পরিবীক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (NFMS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বনভূমির

Dhaka University Institutional Repository

অবর্তনের পরিমাণ মোট ভূমির ১২.৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ফরেস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (BFIS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট বন-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করার জন্য।[১৪]

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ বর্তমানে সামগ্রিকভাবে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গত কয়েক বছরের বেদখল বনভূমি, ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল, পতিত প্রান্তিক জমি এবং রাস্তার পাশের এলাকায় পুনর্বনায়ন করা হয়েছে। সমগ্র দেশে কাঠবাদাম গাছ রোপন, কৃষি বনায়ন ও স্ট্রিপ প্ল্যান্টেশন প্রতিষ্ঠা করা ছিল এই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির অধীনে রোপণ করা বৃক্ষের আয়ুষ্কাল ১০ বছর। এ সময় শেষে গাছ থেকে কাঠ ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করা হয় এবং এর সুফল অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।[১৫]

উক্ত পদক্ষেপসমূহ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবিত নীতি ও ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি কাঠের বিকল্প হিসেবে অন্য জ্বালানি শক্তির টেকসই সরবরাহ, জ্বালানি কাঠের জন্য পতিত জমিতে বনায়ন করা, উন্নত ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন, বন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা মোকাবিলায় অংশীজনের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একটি যোগাযোগ প্রটোকল তৈরি করা। বনবিদ্যার একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি সহযোগিতা বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তির বিকাশ এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে।

বেসরকারি খাতের অনেক কোম্পানি বন ধ্বংস বন্ধ করতে তাদের সাপ্লাই চেইন থেকে অবৈধ কাঠের পণ্য বাদ দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে বনের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার অর্জন করা সম্ভব না। এসডিজি ১৫ অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, উভয় পর্যায় থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। কারণ উভয় পর্যায়ের কিছু অসাধু মানুষ এবং বনভূমিসমূহের সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির চক্রান্ত ও অর্থনৈতিক লোভ-লালসার কারণে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বা বনভূমিকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লিওপোল্ডের ভূমি নীতির প্রবর্তনকে প্রাসঙ্গিক বলা যায়, কারণ ভূমি নীতির বিবর্তন কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় নয়, আবেগ-অনুভূতিরও বিষয়। ভূমি নীতির বিবর্তন বলতে লিওপোল্ড নৈতিকতার পরিধিকে ব্যক্তি থেকে সমগ্র ভূ-সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর করার কথা বলেন। তিনি বলেন, যে কোনো নীতির জন্য একই কার্যপ্রণালি হওয়া উচিত : সঠিক কাজের জন্য সামাজিক অনুমোদন এবং ভুলের জন্য সামাজিক অস্বীকৃতি।[১৬] স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে এক্ষেত্রে তেমন কোনো সাফল্য পরিলক্ষিত হয় না। এ ব্যর্থতার অন্যতম আর একটি কারণ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের অহংবোধ। মানুষ নিজেকে প্রকৃতির বিজয়ী হিসেবে ধরে নিয়ে প্রকৃতি ও অমানব সত্তাসমূহকে শোষণ করতে চায়।

৬.৫ লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতা নীতি'র প্রাসঙ্গিকতা

লিওপোল্ড বলেন, মানব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে, বিজয়ীর ভূমিকা শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী পরিণতি ডেকে নিয়ে আসে। কারণ এই ভূমিকায় নিহিত থাকে এমন এক ঔদ্ধত্য, যেখানে বিজয়ী ধরে নেয়, তিনি সঠিকভাবে জানেন কীভাবে সম্প্রদায়ের ঘড়ির কাঁটা চলে, কে বা কী মূল্যবান আর কে বা কী মূল্যহীন। অথচ, বারবার প্রমাণিত হয়েছে- তিনি আসলে কিছুই জানেন না। আর এ কারণেই তাঁর বিজয় পরিণামে তাঁর নিজের পতন ডেকে এনেছে। লিওপোল্ডের মতে, জীব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। যেমন, আব্রাহাম বিশ্বাস করতেন ভূমির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, তাঁর মুখে দুধ ও মধু প্রবাহিত করা। কিন্তু বর্তমানে এই বিশ্বাসের (ভূমি শুধুমাত্র আমাদের উপযোগ সাধন করে) প্রতি আমাদের দৃঢ়তা আমাদের শিক্ষার ঠিক বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১৭] লিওপোল্ডের মতে, ইতিহাসের পরিবেশগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায় যে, একজন মানুষ আসলে একটি জৈবিক সম্প্রদায়ের সদস্যমাত্র। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাকে এতদিন পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র মানুষের উদ্যোগের ফলাফল বলে জেনে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ভূমি ও মানুষের মধ্যেকার জীব-বৈচিত্র্যপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া। ভূমির বৈশিষ্ট্য যেমন মানব চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে তেমন মানব চরিত্রও ভূমির ইতিহাসে তার ছাপ রেখেছে।[১৮]

লিওপোল্ডের মতে, যখন কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা একপেশে এবং একতরফা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের প্রবণতা ভূমি-সম্প্রদায়ের এমন অনেক উপাদানকে উপেক্ষা করে কিংবা অবশেষে নিশ্চিহ্নও করে ফেলে, যেগুলোর হয়তো বাজার মূল্য নেই, কিন্তু ভূমির সুস্থ কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ভুলভাবে ধরে নেয় যে, জীব-বৈচিত্র্যের সেইসব অংশ যেগুলোর অর্থনৈতিক মূল্য নেই, সেগুলো ছাড়াও অর্থনৈতিক অংশগুলো কাজ করতে পারবে।[১৯] অনেক সময় শুধু কোনো প্রজাতি বা গোষ্ঠী নয়, বরং গোটা জীব সম্প্রদায়কেই অর্থনৈতিকভাবে মূল্যহীন বলে বিবেচনা করা হয়- যেমন, জলাভূমি, টিলা এবং মরুভূমি প্রভৃতি। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে মানুষের সাধারণ নীতি হলো- সরকার যেমন কোনো সংরক্ষিত এলাকা, স্মৃতিসৌধ বা পার্কের সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে তেমনটা জীব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রত্যাশা করা। ফলে অনেক কাজ সরকারের কাঁধে গিয়ে পড়ে, সেগুলো শেষ পর্যন্ত হয় অনেক বড়, জটিল বা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যা সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না।[২০]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জীব সম্প্রদায়ের (জলাভূমি, বনভূমি, পাহাড়-টিলা ও মরুভূমি) সাথে বা চারপাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন মূল্যবান জমি সংযুক্ত থাকে; জীব সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ করার জন্য এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারে পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রক্রিয়া যখন দীর্ঘমেয়াদে চলতে থাকে তখন জীব সম্প্রদায়ের অনেক সত্তাকেই চূড়ান্ত বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়া হয়। লিওপোল্ডের মতে, যদি ঐ সকল জমির মালিকেরা পরিবেশগতভাবে সচেতন হতেন তাহলে তারা এমন এলাকার যুক্তিসঙ্গত অনুপাতের রক্ষক হতে পেরে গর্বিত হতেন এবং একইসাথে তাদের খামার বা সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতো।[২১] তাঁর এ মতটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশের যেসব এলাকায় বনভূমি, সংরক্ষিত বনভূমি, পাহাড় ও টিলা অবস্থিত সেগুলোর সাথে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঐ সকল জমির মালিক নিজেদের জমি সংরক্ষণে আগ্রহী হলেও পার্শ্ববর্তী সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে একেবারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। বরং সুযোগ পেলে নির্দ্বিধায় এ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো অবৈধভাবে নিজের জমির সীমানার সাথে সরকারি প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলে তা দখল বা অধিগ্রহণ করে নেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার কারণে এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে এসব এলাকার প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে চলে যাচ্ছে।

লিওপোল্ডের মতে, আমেরিকান সংরক্ষণবাদের একটি স্পষ্ট প্রবণতা হলো, ব্যক্তিগত জমির মালিকেরা যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হন তা সরকারের উপর অর্পিত হয়। বন ব্যবস্থাপনা, চারণভূমি ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ও জলাধার ব্যবস্থাপনা, পার্ক ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ, মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিযায়ী পাখির ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা, পরিচালনা, ভর্তুকি বা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। সরকারি সংরক্ষণের এই বিকাশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথাযথ, যৌক্তিক এবং অনিবার্য[২২] বলে মনে করলেও দীর্ঘমেয়াদে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় বলে লিওপোল্ড তা সমর্থন করেন না। এ পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিমালিকের পক্ষ থেকে ভূমির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনকেই তিনি একমাত্র সুস্পষ্ট প্রতিকার হিসেবে অভিহিত করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও লিওপোল্ড বর্ণিত উক্ত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এককভাবে সরকারের পক্ষে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব না। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অমানব সত্তাসমূহের প্রতি অর্থনৈতিক বা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে না উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে এসডিজি ১৫ অর্জনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্টটি গৃহীত হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিশেষ করে বনজ সম্পদ, জলাভূমি, ভূসম্পত্তি ও অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণের জন্য। কারণ মানুষের নানা ধ্বংসমূলক কার্যক্রমের ফলে যেভাবে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার প্রভাব পড়ছে এসব সম্পদের উপর। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডগুলো মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদকে টেকসই করার লক্ষ্যে বনভূমি সংরক্ষণ ও পূর্নবাসনের কোনো বিকল্প নেই। বনভূমি পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে বনভূমি আছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও দেশের অর্থনীতি ও সার্বিক কল্যাণে এসব বনভূমির গুরুত্ব অনেক। সঠিক পরিকল্পনা, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বনভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লিওপোল্ড অনুসরণে ভূমি নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদ বা অমানব সত্তাসমূহের প্রতি লিওপোল্ডের মনোভাব ছিল সংরক্ষণবাদী। অমানব সত্তাসমূহের মতো তিনি মানুষকেও জীব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, এ সম্প্রদায়ের সকল সদস্য যেমন নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান তেমন মর্যাদারও অধিকারী। এজন্য এ সকল সদস্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই রক্ষিত হবে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র। সমগ্র জীব সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থনৈতিক বা উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি লিওপোল্ড নৈতিক ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের প্রতি সর্বপ্রথম আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যা বনভূমির ক্ষেত্রেও

Dhaka University Institutional Repository

প্রযোজ্য। সমগ্র জীব সম্প্রদায়ের প্রতি সঠিক আচরণ প্রদর্শনের জন্য তিনি যে 'অখণ্ডতার নীতি' (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রবর্তন করেছেন, তার যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের বনভূমি, বনজ সম্পদ এবং সার্বিকভাবে অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তি রোধ করে সংরক্ষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা সম্ভব যা টেকসই উন্নয়ন অর্জনকেই নির্দেশ করে।

তথ্যপঞ্জি

১. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistical Yearbook Bangladesh 2020, Statistics & Information Division, Dhaka, 2021, p. 114, 411, 416 (Passim). দেখুন, এস.এম. ইকরামুল ইসলাম রাসেল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।

২. Aldo Leopold, প্রাগুক্ত, p. 224.

৩. প্রাগুক্ত, p. 225.

৪. অরুণ কুমার লাহিড়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

৫. *প্রাগুক্ত*।

৬. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৮০।

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. *প্রাগুক্ত*।

৯. 'সবুজ অর্থনীতি' হলো পরিবেশের ক্ষতি না করে টেকসই উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। এটি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে পরিবেশতগত ঝুঁকি এবং ঘাটতি কমিয়ে আনা হয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ এটি পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

১০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ, ২০২২, পৃ. ১।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

১২. *প্রাগুক্ত*।

১৩. *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

১৪. *প্রাগুক্ত*।

১৫. *প্রাগুক্ত*।

১৬. Aldo Leopold, প্রাগুক্ত, p. 225.

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. 204-205।

১৮. *প্রাগুক্ত*।

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. 214।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. 212-214।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. 212।

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ.213।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে অমানব সত্তার গুরুত্ব এবং এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতার নীতি'র' প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছয়টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে পার্থক্য থাকলেও এর কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল অমানবকেন্দ্রিকতাবাদ। টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষ ছাড়াও প্রকৃতির অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্ব স্বীকারের ক্ষেত্রে অমানবকেন্দ্রিকতাবাদ একটি নীতিবিদ্যাগত অবস্থান। এ অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার জন্য অমানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উক্ত অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানুষের পাশাপাশি অমানব সত্তাকেও নৈতিকতার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে। লিওপোল্ডও তাঁর "ভূমি নীতিবিদ্যা" প্রবন্ধে ভূ-সম্প্রদায়ের সমগ্র সত্তাকে নৈতিকতার বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের প্রতি লিওপোল্ডের এই দৃষ্টিভঙ্গি সনাতনী পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার প্যারাডাইম পরিবর্তনকে নির্দেশ করে এর পরিধির সম্প্রসারণের সুপারিশ করে।

টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমান পরিবেশগত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য নীতিবিদ্যাগত অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য টেকসই উন্নয়নের উক্ত অভীষ্ট অর্জনের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে অখণ্ডতার নীতিকে নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্যিক কর্তব্য। কারণ বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাস্তুতন্ত্রের অমানব সত্তার মতো মানুষও একটি জীবীয় উপাদান। তবে বুদ্ধিবৃত্তি থাকার কারণে প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধার যথেচ্ছ ব্যবহার করে মানুষ নিজ প্রজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যায্যভাবে অমানব সত্তাসমূহের ক্ষতি সাধন করছে। মানুষের এরূপ কর্মকাণ্ড বাস্তুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে উক্ত অভীষ্ট অর্জনে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব সুরক্ষায় অমানব সত্তাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত অভীষ্ট অর্জনের জন্য লিওপোল্ডের অমানবকেন্দ্রিক মতবাদ প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য।

যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে অমানব সত্তাসমূহের অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। নগরায়ন, শিল্পোন্নোয়নসহ যে কোনো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডই উন্নয়নের অংশ এবং এসকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তির কারণ। সাধারণত অনুমান করা হয় যে, পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা শুধুমাত্র উন্নত দেশসমূহের সমস্যা। কারণ অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় উন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নোয়ন ও নগরায়নের ধারা অনেক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও শিল্পোন্নোয়ন ও নগরায়নের হার দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন অমানব সত্তাসমূহের বিলুপ্তির জন্য দায়ী তেমন টেকসই উন্নয়ন অর্জনের পথেও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কারণ অমানব সত্তাসমূহের (প্রাকৃতিক সম্পদ) টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণি ও উদ্ভিদজগতের অস্তিত্ব এবং মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। অমানব সত্তাসমূহের টেকসই ব্যবহার বলতে প্রাকৃতিক সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহারকে বোঝায় যা সবল টেকসই উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে অমানব সত্তাসমূহের সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে সুবিবেচনাপ্রসূত চিন্তাভাবনার প্রতিফলন জরুরী। পরিবেশবিদ বা বিশেষজ্ঞরা অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আইন প্রয়োগ করেও খুব যে সফলতা অর্জন করা যায়নি, তা গত তিন দশকে বাংলাদেশ সরকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে গৃহীত নানা নীতিমালা এবং পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। তাছাড়া আইন আদালতের বাইরেও এক জগৎ রয়েছে, তা হলো নৈতিকতার জগৎ।

বাংলাদেশের অমানব সত্তাসমূহকে রক্ষা করতে হলে একটি কার্যকর ও সমন্বিত নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের পরিবেশগত সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি যদি লিওপোল্ড অনুসরণে অমানব সত্তাসমূহের নৈতিক মূল্য স্বীকার করা যায়, তাহলে এ সত্তাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কিছুটা হলেও সহজতর হবে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে লিওপোল্ডের 'অখণ্ডতার নীতি'র সফল বাস্তবায়নে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে; যা বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করবে। এজন্য বর্তমান গবেষণায় নিম্নলিখিত করণীয়সমূহ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হলো-

অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১ সালের ১৪ নং আইন) মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অমানব সত্তাসমূহ বা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর পরিবেশের ভারসাম্য, প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব এবং মানবজাতির উন্নয়ন নির্ভরশীল যা পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি প্রণীত হওয়ার পর পরিবেশের বিষয়ে আইন ও একাধিক বিধিমালা জারি করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন। এ নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সর্বোস্তরের জনগণকে সচেতন করতে হবে, যেনো এ নীতি বাস্তবায়নে সবাই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড (রাস্তা-ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ, শিল্প কলকারখানা স্থাপন, নগরায়ন) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার অমানব সত্তাসমূহের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যত্রতত্র বিশেষ করে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে, পাহাড়ী এলাকায় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থলজ বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলে ইটভাটা স্থাপনের অনুমোদন দেয়া যাবে না। যত দিন যাচ্ছে অবৈধ ইটভাটা সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসছে। এসব অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ইটভাটা স্থাপনের পরিবর্তে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং গাছ ও বনভূমি ধ্বংসের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে যেনো আয়ের উৎসের জন্য অমানব সত্তাসমূহের উপর নির্ভরশীল না হতে হয়, এজন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান গবেষণায় অমানব সত্তাসমূহ বিলুপ্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততার চিত্র উঠে এসেছে। এজন্য জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পরিবেশগত বিবেকবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধর্মীয় নেতা ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সে সকল তথ্য ধর্মীয় নেতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বনভূমিকে সংরক্ষণ করার জন্য বনের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেও এসব বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। এজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে (পরিবেশ সম্পর্কিত) দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে, আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে আইনি ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ প্রদান করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সকল দপ্তর এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ এবং অফিসে কর্মরত সদস্যদের পরিবেশগত বিবেকবোধ জাগ্রত করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে সভা, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্ব বনভূমির উপর নির্ভরশীল। এজন্য যেসব এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বনভূমি অবস্থিত সেসব এলাকার অমানব সত্তাসমূহ সংরক্ষণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওগুলোর উপর দায়িত্ব দিতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং আইনি অভিভাবক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

কৃত্রিম বনের পরিধি সম্প্রসারণ না করার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাকৃতিক বন ও উপকূলীয় বনভূমিসমূহে গাছের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ সকল অঞ্চলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত করার পাশাপাশি বনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর মনুষ্য কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করতে হবে অথবা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে ঋণ প্রদানের পূর্বে তদন্ত করে দেখতে হবে যে, তাদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্বারা অমানব সত্তাসমূহের ক্ষতি সাধিত হবে কিনা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। এ অতিরিক্ত জনসংখ্যা শুধুমাত্র দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অন্যতম প্রধান কারণ নয় বরং অমানব সত্তাসমূহ বিলুপ্তির জন্যও দায়ী। পরিবেশ বিপর্যয় ও

Dhaka University Institutional Repository

অমানব সত্তার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গণমাধ্যম এবং মাঠকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালু করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ স্তরের কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ে (সমাজ, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যা) পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কোর্সসমূহে পরিবেশ সংক্রান্ত যেসব আলোচনা রয়েছে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশগত বিবেকবোধ তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কোর্সসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের "ভূমি নীতিবিদ্যা" প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়াও পরিবেশগত যে কোনো সমস্যা সমাধানে গৃহীত সমন্বিত নীতিমালার মধ্যে অখণ্ডতার নীতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান গবেষণায় অমানব সত্তা বলতে সেই সকল জীবীয় ও অজীবীয় প্রাকৃতিক সত্তাকে বোঝানো হয়েছে যাদের অস্তিত্ব, কার্যকারিতা ও স্বার্থ মানুষের মূল্যায়ন নিরপেক্ষভাবে মূল্যবান। এসকল সত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- প্রাণি, উদ্ভিদ, অণুজীব, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বনভূমি, মাটি, পানি, বায়ু, এমনকি জলবায়ু ব্যবস্থাও। অমানব সত্তাসমূহকে আধুনিক পরিবেশ নীতিবিদ্যায় শুধুমাত্র সম্পদ হিসেবে নয়, বরং অধিকারসম্পন্ন ও অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ অনেকাংশে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল একটি দেশ। এজন্য উক্ত সত্তাসমূহ এ দেশের জীব-বৈচিত্র্য ও মানুষের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জন করার ক্ষেত্রে অমানব সত্তাসমূহের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি বিশ্ব একাডেমিক ও নীতি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। এ ধারণাটি প্রথম দিকে মানবকেন্দ্রিক ছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কল্যাণ অব্যাহত রাখার জন্য প্রাকৃতিক সত্তাসমূহকে রক্ষা করা। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ নামে একটি নতুন ধারার জন্ম হয়- যেখানে বলা হয়, প্রাকৃতিক জগৎ শুধুমাত্র মানুষের সেবার জন্যই অস্তিত্বশীল নয় কারণ মানুষ কেবলমাত্র প্রকৃতির একটি অংশ। লিওপোল্ড তাঁর "ভূমি নীতিবিদ্যা" প্রবন্ধে বলেন, যে কাজ জীবসম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করে সে কাজ নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। লিওপোল্ডের এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন মেটানোর সাথে নয়, বরং সমগ্র পরিবেশগত ভারসাম্য সংরক্ষণের সাথে যুক্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অমানব সত্তার প্রতি নৈতিক ও আইনি দায়বদ্ধতা পালন প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা হচ্ছে। যেমন, ২০১৭ সালে ভারতের উত্তরখণ্ডের উচ্চ আদালত গঙ্গা ও যমুনা নদীকে "আইনি ব্যক্তিসত্তা" (Legal personhood) হিসেবে ঘোষণা করেছে। নেপালেও অনুরূপ আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতও ২০১৯ সালে দেশের সব নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আদালতের রায়ের মাধ্যমে নদীকে অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এ

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকতায় যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় নদীর মতো অন্যান্য অমানব সত্তার স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকেও নীতিগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ অমানব সত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং জাতীয় অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা ও জলবায়ু অভিযোজনের শর্ত যা টেকসই উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়নের যে ১৭টি অভীষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- সবগুলো অভীষ্টই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ১৫ নম্বর অভীষ্টের উপর নির্ভরশীল। কারণ সঠিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবেনা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অমানব সত্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে যেহেতু পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন ও আদালত কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, সেহেতু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবেশগত বিবেকবোধ জাগ্রত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখানেই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ১৫ নম্বর অভীষ্ট অর্জনে লিওপোল্ডের সংরক্ষণবাদ, অখণ্ডতার নীতি, সমগ্রবাদ এবং সর্বোপরি অমানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. Ayre, Georgina and Callway, Rosalie (ed.), *Governance for Sustainable Development: A Foundation for the Future,* Earthscan, London, First Published, 2005.

২. Agyeman, Julian, Robert, D. Bullard and Bob, Evans (ed.), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, EARTHSCAN Publications Ltd., London, 2003.

৩. Aquinas, St. Thomas, *Summa Contra Gentiles,* English Domican Fathers (translated), Benbigr Brother, Chicago, 1928.

৪. Attfield, Robin, *Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century,* Polity Press, UK, 2003.

৫. ____, "Ethics and the Environment: The Global Perspective", in Brenda Almond (ed.), *Introducing Applied Ethics*, Blackwell, UK, 1995.

৬. ____, *The Ethics of Environment Concern,* 2nd edition, The University Georgia Press, London, 1991.

৭. Bentham, Jeremy, *The Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1974.

৮. Barry, Brian, "Sustainability and Intergenerational Justice," in Andrew Dobson (ed.), *Fairness and Futurity : Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1991.

৯. C. Hargrove, Eugene, *Foundations of Environmental Ethics,* Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.

১০. Cornford, F.M., *The Republic of Plato*, Oxford University Press, London, 1969.

১১. Callicott, J. Baird, "Animal Liberation: A Triangular Affair", in Robert Elliot (ed.), Environmental Ethics, Oxford University Press, 1985.

১২. _____,"Non-Anthropocentric Value Theory and Environmental Ethics", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 21, 1984.

১৩. _____, "The Conceptual Foundations of the Land Ethics", in Callicott, John Baird, *Defense of the Land Ethics*, State University of New York Press, Albany, 1989.

১৪. Carruthers, Peter, *The Animals Issue,* Cambridge University Press, New York, Reprinted, 1994.

১৫. Carson, Rachel, *Silent Spring,* Houghton Mifflin Company, New York, 1962.

১৬. Chadwick, Ruth F. (ed.), *Immanuel Kant Critical Assessment*, Routledge, London, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

১৭. Carpenter, T.G., *Environment, Construction and Sustainable Development,* Vol. 1, Wiley, New York, 2001.

১৮. Desta, Asayehgn, *Environmentally Sustainable Economic Development,* Praeger, Westport CT, 1999.

১৯. Desimone, Livio D., Frank Popoff, *Eco-Efficiency: The Business Link to Sustainable Development,* MIT Press, Cambridge, MA, 2000.

২০. Eliot, Robert, (ed.), *Environmental Ethics*, Oxford University Press, London, 1995.

২১. Feinberg, T., "The Rights of Animals and Unborn Generations", in Mappes, T.A., and Zembaty, J.S., ed., *Social Ethics: Morality and Social Policy,* McGraw-Hill, New Yorks, 1987.

২২. Fedorov, E., *Man and Nature: The Ecological Crisis and Social Progress,* Progress Publishers, Moscow, 1980.

২৩. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Environment and Forests, *Biodiversity National Assessment 2015,* Dhaka, 2015.

২৪. Gain, Philip (ed.), *Bangladesh Environment Facing the 21st Century,* SHED, Dhaka, 2002.

২৫. Gallie, W.B., "Essentially Contested Concepts", *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol.56, 1955-56, Oxford University Press.

২৬. Gensler, Harry J., Spurgin, Earl W. and Swindal, James C.(ed.), *Ethics Contemporary Readings*, Routledge, London, 2004.

২৭. Hayry, Matti, *Liberal Utilitarianism and Applied Ethics*, Routledge, London, 1994.

২৮. Hayward, Tim, *Ecological Thought : An Introduction*, Polity Press, Cambridge, 1995.

২৯. Hulse, Joseph H., *Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past,* International Development Research Centre Ottawa, 2007.

৩০. Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, Bigge, Selby I. A. (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1896.

৩১. International Union on Conservation and Nature (IUCN), Caring for the Earth, 1991.

৩২. International Union on Conservation and Nature (IUCN), World Conservation Strategy, 1980.

৩৩. Improving the quality of life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems. দেখুন, "Michael Jacobs, Sustainable Development: A Contested Concept," In Andrew Dobson (ed.), *Fairness and Futurity:*

Dhaka University Institutional Repository

Essays on Environmental Sustainability and Social Justice, Oxford University Press, 2002.

৩৪. Improving the quality of life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems. দেখুন, "Michael Jacobs, Sustainable Development: A Contested Concept," In Andrew Dobson (ed.), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford University Press, 2002.

৩৫. Islam, Md. Anwarul, Ahmed, Sharif Uddin and Rabbani, AKM Golam, *Environment of Capital Dhaka,* Celebration of 400 Years of Capital Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2010.

৩৬. Islam, Naznin, *Sustainable Development In Bangladesh,* AH Development Publishing House, Dhaka, First, Published, 2012,

৩৭. International Union on Conservation and Nature (IUCN), "The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future", Pluto Press, London, 1991.

৩৮. Jardins, Joseph R. Des, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy,* Wadsworth Thomson Learning, Canada, Third Edition, 2001.

৩৯. Jacobs, M., *The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future*, Pluto Press, London, 1992.

৪০. Jacobs, Michael, "Sustainable Development : A Contested Concept", in Andrew Dobson (ed.), *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

৪১. Kant, I., *Fundamental Principles of the Metaphysic of Ethics,* 10th edition, Tr. by T.k. Abbott, Longmans, London, 1979.

৪২. Leopold, Aldo, *Sand County Almanac*, Oxford University Press, Oxford, 1949.

৪৩. Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, 3rd edition, Mathuen & Co. Ltd., New York, 1955.

৪৪. Leoplod, Aldo, "The Land Ethic" in Donald Scherer and Thomas Atting (ed.), *Ethics and the Environment*, Prentic Hall, New Jersey, 1983.

৪৫. Lynn, White, "The Historical Roots of our Ecological Crisis", in *Science*, 1967.

৪৬. Lo Fu-chen, Peter, Marcotullio, J., *Globalization and the Sustainability of Cities in the Asia Pacific Region,* United Nation Press, New York, 2001.

৪৭. Mill, J.S., *Utilitarianism,* Bobbs Merrill, Indianapolis, 1971

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. McLaren, Duncan, "Environmental Space, Equity and the Ecological Debt", in Agyeman, Julian, et al. (eds.), *Just Sustainability: Development in an Unequal World*, Earthscan, London, 2003.

৪৯. Moore, G.E., "The Conception of Intrinsic Value", in *Philosophical Studies*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1922.

৫০. Nolt, John, *Environmental ethics for the long term: An introduction*, Routledge, New York, 2015.

৫১. Passmore, John, *Man's Responsibility for Nature : Ecological Problems and Western Tradions*, Duckworth, London, 1974 (2nd edition, 1980).

৫২. Pojman P., Louis, *Global Environmental Ethics*, Mayfield Publishing Co., California, 2000.

৫৩. Rogers, Peter P., Jalal, Kazi F. and Boyd, John A., *An Introduction to Sustainable Development*, Earthscan, London, 2008.

৫৪. Rodd, Rosemary, *Biology, Ethics and Animals,* Clearendon Paperbacks, Oxford, New York, 1992.

৫৫. Ryder, Richard D., *Animal Revoluation,* Basil Blackwell Ltd., Oxford, UK, 1989.

৫৬. Regan, Tom. *The Case for Animal Rights,* Routledge, London and New York, First Published, 1984.

৫৭. Records of the General Conference, Volume-1, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 1998.

৫৮. Singer, Peter and Tom Regan (ed.), *Animal Right and Human Obligations*, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1989.

৫৯. ____, *Practical Ethics,* Cambridge University Press, UK, 1993.

৬০. ____, "Animal Liberation : A Triangular Affair", in Scherer, Donald and Atting, Thomas (ed.), Ethics and the Environment, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, 1983.

৬১. ____, *A Companion to Ethics,* Blackwell Publishes Ltd, First Published, 1991.

৬২. ____, (ed.), *Applied Ehtics,* Oxford University Press, Oxford, New York, First Published, 1986.

৬৩. ____, *Animal Liberation*, Harper Collins Publishers, New York, 1975.

৬৪. Small, John & Witherick, Michael, *A Modern Dictionary of Geography*, ARNOLD, London, 1995.

৬৫. Sen, Amartya, *On Ethics and Economics,* Oxford University Press, New Delhi, India, 1987.

৬৬. Scarre, Geoffrey, *Utilitarianism*, Routledge, London, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. Sterba, J.P.,*"Reconcilling Anthropocentric and Non-anthropocentric Environmental Ethics"* in H. LaFollette, ed., Ethics in Practice: An Anthology, Blackwell, Oxford, 1997.

৬৮. Shrader-Frechatte, Kristia, *Environmental Justice: Creating Equality, Reclaiming Democracy*, Oxford University Press, London, 2002, PP. 23-24.

৬৯. Sullivan, Roger J., *An Introduction to kant's Ethics*, Cambridge University Press, New York, 1994.

৭০. Schacht, Richard, *Classical Modern Philosophers Descartes to kant*, Routledge, London, 2003.

৭১. Scruton, Roger, *A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein*, Routledge, London, 2002.

৭২. Sarkar, Sahotra, *Environmental Philosophy,* Wiley-Blackwell, United Kingdom, First Published, 2012.

৭৩. Stumpf, Samuel Enocn, *Socrates to Sartre A History of Philosophy*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1975.

৭৪. Sterba, James, "Reconciling Anthropocentric" and Nonanthropocentric Environmental Ethics", in Lafollette, Hugh, (ed.), *Ethics in Practice: An Anthology*, Blackwell, USA. 1997.

৭৫. *The Ethics of Aristotle*, Translated by Thomson, J.A. K., Penguin Books, London, 1955.

৭৬. Taylor, W Paul, *Principles of Ethics : An Introduction*, Wordsworth Publishing Company, California, 1975.

৭৭. Taylor, W. Paul, "Are Humans Superior to Animal and Plants?" in *Environmental Ethics*. Vol. 6, 1984.

৭৮. UN Environment Programme Report, Caring for the Earth, IUCN, 1991.

৭৯. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 1992, Rio Declaration, 1992.

৮০. United Nations, Declaration on the right to development, 1986.

৮১. Uddin, Jasim, "Responsibility to Future Generations and the Argument from Temporal Distance", in *The Dhaka University Studies*, December 2006.

৮২.Vajpeyi, Dhirendra K., *Deforesation, Environment and Sustainable Development: A Comparative Analysis,* Praeger, Westport CT, 2001.

৮৩.World Commission on Environment and Development (WCED) 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1988.

৮৪. ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল, *পরিবেশ প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের পরিবেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

৮৫. ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (সম্পাদিত), *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ*, প্রাঙমুখ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

৮৬. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. ইমাম, কাজী হাসান, *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* প্যারাগন পাবলির্শাস, ঢাকা, ১৯৯৯।

৮৮. ইব্রাহীম, ড. মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *পরিবেশ সংকট, অর্গানিক কৃষি ও টেকসই উন্নয়ন,* বিজ্ঞান গণশিক্ষাকেন্দ্র (সি.এম.ই.এস). ঢাকা, জুলাই, ২০০৬।

৮৯.এ.ডি., উরসুল, সম্পাদিত, *দর্শন, পরিবেশবিদ্যা ও সভ্যতার সংকট*, অনুবাদ, সুনীল মিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১।

৯০.কান্ট, ইমানুয়েল, *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*, সাইয়েদ আবদুল হাই অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৯১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮*, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৮।

৯২. গাইন, ফিলিপ, সম্পাদিত, *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম,* সেড, ঢাকা, ২০০৪।

৯৩.—, *বাংলাদেশের বিপন্ন বন,* সেড, ২০০৫।

৯৪.—, সম্পাদিত, *অনুসন্ধানী রিপোর্ট: পরিবেশ ও মানবাধিকার,* সেড, ঢাকা, ২০০৮।

৯৫. গুহবাগচি, ডি.এন.এস. এবং ব্যানার্জি, এস.কে., *প্রকৃতি ও পরিবেশ,* কলকাতা বুক হাউজ (বা:) লি:, কলকাতা, ভারত, ২০০০।

৯৬. চক্রবর্তী, বি.এ. বসুরয় এবং রায়, এম., *মানুষ ও পরিবেশ,* পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্যবুক বোর্ড, কলকাতা, ভারত, ২০০০।

৯৭. চক্রবর্তী, তপন, *বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯৮।

৯৮.*টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ* (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৭।

৯৯.*টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২০।

১০০.*টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন* ২০২২, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ২০২৩।

১০১. নাসরীন, ড. মাহবুবা, হোসেন, ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম এবং কুন্ডু, দেবাশীষ কুমার, *পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬।

১০২.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, *পরিবেশ আইন সংকলন,* পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০১৯।

১০৩.পাল, নিশীথ কুমার ও সরকার, আব্দুল মান্নান, *বায়োডাইভারসিটি*, ইউরেকা বুক এজেন্সি, রাজশাহী, ২০০০।

১০৪. মনিরুজ্জামান, ড. এফ.এম, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

১০৫.ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, *সমকালীন নীতিবিদ্যা,* অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৬।

১০৬.রহমান, আবু তাহা হাফিজুর (অনুদিত), *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা,* (মূল) David Hume, *A Treatise of Human Nature*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১।

১০৭.রাব্বি, মোঃ আকিব আল, *বাংলাদেশ পরিবেশ আইন পাঠ (প্রাসঙ্গিক মূল আইন ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনসহ),* সামছ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৮।

১০৮.রাসেল, এস.এম. ইকরামুল ইসলাম, "লিওপোল্ডের ভূমি নীতিবিদ্যা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের বনভূমি সংরক্ষণ", *জীবন দর্শন*, ভলিউম ১০, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. লাহিড়ী, অরুণ কুমার, *পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৯।

১১০. সিঙ্গার, পিটার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, অনুবাদ, প্রদীপ কুমার রায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পূর্নমুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

১১১. হোসেইন, সৈয়দ কমরুদ্দীন, *কান্টের দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।

১১২. হোসেন, কাজী জাকের, *বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ*, ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০০৩।